ভারতে কৃষি সম্পর্ক

(১৭৯৩-১৯৪৭)

অনুবাদিকা ঃ ছায়া দাশগুপ্ত

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

প্রকাশকাল : জুলাই, ১৯৫৮

প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

ভূমিকা

আশ্চর্যের বিষয় কৃষিসমস্যার আলোচনা দীর্ঘকাল এদেশে অবহেলিত ছিল। সুখের কথা, বিগত দুই দশকে এই বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। দেশে বিদেশে গবেষণা এখনো অব্যাহত। পণ্ডিতদের নিরন্তর গবেষণা এই বই লিখতে সহায়ক হয়েছে। যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে গবেষণা হয় নি, সেগুলির উপর আমি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছি। এই বইতে কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে কৃষির আধুনিকীকরণের সঙ্গে যেগুলি যুক্ত। নিজের সম্বন্ধে বলা দরকার ভারতের কৃষক আন্দোলনে (১৯৪৩-১৯৫৭) আমি সর্বক্ষণের কর্মী ছিলাম; আমি গ্রামে কৃষকদের মধ্যে বাস করেছি। গ্রাম দেশের বাস্তব আমি সামান্য বুঝেছি।

কৃষি-কাঠামো, উৎপাদনের অবস্থা, কৃষি ঋণ, দুর্ভিক্ষ এবং কৃষক অসন্তোষ সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থিত করার চেষ্টা আমার উদ্দেশ্য। ঘটনার বিবরণের চাইতে একটি বিশেষ পর্বের প্রধান প্রবণতাগুলির বিশ্লেষণ বইতে গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতের গ্রাম দেশ পরিবর্তনহীন—অনেক পণ্ডিতের এই মত আমার কাছে অগ্রাহ্য। বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার, কৃষকদের মধ্যে স্তর বিন্যাস, কৃষক অসন্তোষ কৃষিজ সামাজিক কাঠামোর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং পরিবর্তনের সূচনা করেছে, যদিও পরিবর্তনের গতি ছিল মন্থর।

ইংরাজীতে এই বই প্রকাশিত হয় তিন বছর আগে। রামমোহন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ছায়া দাশগুপ্ত বইটির অনুবাদ করেছেন। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। পাণ্ডুলিপি একাধিকবার পড়েছি। তবু যদি ভুল থাকে তার দায়িত্ব আমার।

সুনীল সেন

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষিগত কাঠামো

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতীয় কৃষির বদ্ধাবস্থা একটি সুপরিচিত বিষয়। যে প্রশ্নটি তোলা দরকার তা হল, কৃষির বদ্ধাবস্থা ও অবনতির বিষয়কে কৃষিগত কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা যায় কিনা। কৃষিগত কাঠামো বলতে আমরা বুঝি, উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো, যার অন্তর্ভুক্ত হল ভূমিস্বত্ব বন্দোবস্ত, বৃহৎ ভূস্বামী ও ক্ষুদ্র চাষীর মধ্যে জমির মালিকানা স্বত্বের বণ্টন, প্রজা বন্দোবস্ত, কৃষকের ওপর সরকার ও জমির মালিকের চাপানো বোঝা। মনে হয়, কৃষিগত কাঠামোর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ভারতীয় কৃষি সমস্যার সম্যক অনুধাবন দুঃসাধ্য। আমরা এখানে সংক্ষেপে ভূমি-স্বত্বের বন্দোবস্ত পর্যালোচনা করব এবং স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতীয় কৃষির ক্রমাবনতির জন্য সামাজিক সম্পর্কগুলি কিভাবে দায়ী তা খুঁজে দেখার জন্য কৃষিব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির উপর বেশী জোর দেব।

ভূমিস্বত্বের ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী জমিদারদের স্বীকৃতি দেওয়া ও রাজস্ব আদায়ের জন্য তাদের ওপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) আওতায় সরকারকে চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট রাজস্ব দানের ভিত্তিতে জমিদাররা জমির মালিকে পরিণত হয়। রায়তদের কাছ থেকে জমিদাররা খাজনা হিসেবে যা পেত, তার এগারো ভাগের দশভাগ সরকারের রাজস্ব হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল। এগারো ভাগের অবশিষ্ট একভাগ জমিদারের অংশ হিসেবে থাকত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়েছিল বাঙলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজের কয়েকটি জেলায়। আঠারো শতকে সরকার কোনও উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি, ভূমিরাজস্ব সংগ্রহই ছিল সরকারের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে ভূমিরাজস্ব ছিল সরকারের রাজস্বের সবচেয়ে ভাল উৎস। ভূমিরাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে সরকারের পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি প্রধানতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিচার বিবেচনার দ্বারা নির্ধারিত হত।

জমিদাররা তাদের রাজস্ব নিয়মিতভাবে দেবে এবং কৃষির উন্নতি সাধন করবে—এটা আশা করা হয়েছিল। এই আশা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। রাজস্বর বকেয়া পাওনার জন্য বহু জমিদারী বিক্রী হয়ে গেল এবং সেসব আবার নোতুন ক্রেতারা কিনে নিল। জমিদার শুধু খাজনা ভোগী হয়ে দাঁড়াল। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এরা কদাচিৎ তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ করত। যতই দিন যেতে লাগল, জমিদাররা ততই "অপরের শ্রমের ফলের ওপর জীবননির্বাহকারী" রূপে খাজনা ভোগী হয়ে দাঁড়াল। জমিদাররা খাজনা থেকে লাভবান হয়েছিল। "রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে তাদের উদ্বৃত্তের ক্ষুদ্র"[১] অংশ তারা দিত। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকার জমিদাররা অনেক কম হারে রাজস্ব দিত। জমি থেকে তাদের ক্রমবর্ধমান আয় ছিল আয়কর মুক্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় জমিদাররা হল জমির মালিক এবং শ্রমজীবী চাষীরা হল তাদের প্রজা। সরকার মুখ্যত ভূমিরাজস্বর নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য জমিদারদের দেওয়া হয়েছিল প্রজা উচ্ছেদের ক্ষমতা, "সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রী করা, এমন কি আইনের আশ্রয় না নিয়েই তাদের লোকজনকে ধরে নিয়ে আসার ক্ষমতা।"[২] যে সমস্ত প্রজাদের নিজ অধিকার প্রমাণের কোনও দলিলগত সাক্ষ্য ছিলনা তাদের খাজনাভোগী জমিদাররা মাত্রাধিক খাজনার চাপে উৎপীড়ন করত এবং জমি থেকে উৎখাত করত।

যতই নোতুন জমি চাষের আওতায় আসতে লাগল, জমিদাররা ততই খাজনা বাড়িয়ে প্রাপ্য বাড়াতে লাগল। জমির ব্যাপারে শাসকশ্রেণী একটি নোতুন পরীক্ষার প্রচেষ্টায় রত হল যার নাম হল: রায়তওয়ারি প্রথা। এই প্রথা ১৭৯০ এ আলেকজাণ্ডার রীড কর্তৃক বড় মহলে প্রথম চালু হয়। পরবর্তীকালে এই প্রথা বশ্যতাপ্রাপ্ত জেলাগুলিতে প্রসারিত হয়। ১৮০৮ এ সরকার গ্রামওয়ারি বা গ্রামব্যবস্থার স্বপক্ষে ঐ প্রথা বাতিল করেন। ১৮২০ এ মুনরো মাদ্রাজের বৃহত্তর অংশে সংশোধিত রায়তওয়ারি প্রথা প্রয়োগ করেন যা পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতে ভূমিস্বত্ব বন্দোবস্তের একটি প্রধান রূপ হিসেবে পরিগণিত হয়। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় সরকার ও রায়তদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। এতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণা প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং পুরানো গোষ্ঠীগত প্রথাকে বাতিল করা হল। আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৌভাগ্য লাভ করল রায়তরা। এটা

মনে করা হত যে রায়তউয়ারি ব্যবস্থা সরকার ও কৃষকের মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের উচ্ছেদ করেছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে "রায়তরা উচ্চবর্ণের অভিজাত রায়ালু সম্প্রদায় অথবা গ্রামের মোড়লদের" প্রতিনিধিত্ব করে।[৩] সরকার যা করেছিল তা হল স্বতন্ত্রভাবে গ্রামের নেতাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা। জমিদারী বন্দোবস্তের মতোই রায়তউয়ারি বন্দোবস্তেও সরকার এবং রায়তদের মধ্যে বহুসংখ্যক মধ্য স্বত্বাধিকারীর উদ্ভব ঘটেছিল।[৪] বস্তুতপক্ষে রায়তরাই খাজনা গ্রহীতায় পরিণত হয়েছিল এবং তারা বহুক্ষেত্রেই জমি প্রজা বন্দোবস্তে দিত।

গুন্টুর জেলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল "সুনিশ্চিত রাজস্বলাভ।" সরকারকে চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট অর্থদানের বিনিময়ে গুন্টুরের জমিদারদের বড়ো বড়ো ভূখণ্ড রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। জমিদাররা সরকারের রাজস্বের দাবী মেটাতে ব্যর্থ হল এবং বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত ঋণে ডুবে গেল, তাই জমিদারী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। সরকার রায়তউয়ারি ব্যবস্থা প্রথমে চালু করেছিল পালনাদে এবং পরে গুন্টুরে। জমিদারদের ওপর ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখার পরিবর্তে সরকার "রায়তউয়ারি ব্যবস্থায় কৃষিজীবনের প্রত্যেকটি দিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিল।[৫] কিন্তু রায়তউয়ারি বন্দোবস্ত কৃষিগত ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন আনেনি বললেই চলে। যে সময়, রায়তদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছিল, তারা প্রতিনিধিত্ব করত "গ্রামের নেতাদের নীচুতলার শ্রমজীবী চাষীদের নয়।"[৬] এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার যে ব্রিটিশ শ্রমিকরা দক্ষিণ ভারতের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নির্ভর করত ব্রাহ্মণ, সম্মানিত শূদ্র এবং বণিকদের ওপর, এই সম্প্রদায়গুলি গ্রাম্য সমাজে প্রধান নায়কে পরিণত হয়েছিল।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থা বোম্বাই, বম্বার ও আসামে প্রসারিত হল। এই ব্যবস্থায় সম্প্রসারিত রাজস্বর আকাঙ্ক্ষা মেটানো হল। বোম্বাইতে কুড়ি বা তিরিশ বছর অন্তর রাজস্ব নির্ধারণ করা হত। ১৮০৭ এ ১'৮৬ মিলিয়ন পাউণ্ড ও ১৮৪২ এ ২ মিলিয়ন পাউণ্ড ভূমি রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছিল। রমেশ দত্ত প্রতিপন্ন করেছিলেন যে সরকার জমির করকে "সমগ্র অর্থনৈতিক খাজনা"[৭] হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সুতোর দাম বৃদ্ধি পেলে সরকার ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হলেন। ১৮৬৬ এ পরিবর্তিত জরিপ শুরু হলে এটা প্রমাণিত হল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রভাবে সুতোর দাম "অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেল এবং সরকার এক অযৌক্তিক ও উচ্চমূল্যের

রাজস্বর দাবীকে কার্যকরী করল।"[৮] পুণা সার্বজনীক সভা লক্ষ্য করেছিল যে চাষের খরচ যুগিয়ে ও সরকারের দাবী মিটিয়ে 'রায়তের হাতে কোনও উদ্বৃত্ত ফসল থাকত না।'[৯] ১৮৬৬ এ জরিপ শুরু হয়েছিল এবং তা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল। ১৮৭৯ এর মধ্যে এই ব্যবস্থা মাত্র অর্ধেক গ্রামে সম্পূর্ণ হয়েছিল। সংশোধিত জরিপের ফলে জমির খাজনা উল্লেখ-যোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০০ এ ম্যাকডোনেল কমিটি দেখেছিল যে গুজরাটে ভূমিরাজস্ব ছিল মোট উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ।[১০]

উত্তর ভারতে বন্দোবস্ত হয়েছিল জমিদারদের সঙ্গে। ১৮০৭ এ "আত্মসমর্পণকারী" ও 'বিজিত অঞ্চলগুলিতে" চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যখন জমির দাম বাড়ল তখন চিরস্থায়ীভাবে রাজস্ব নির্দিষ্ট করে ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয়—এ বিষয়ে সরকারও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ১৮২২ এ হল্ট ম্যাকেঞ্জি সুনিশ্চিতভাবে বলেছিলেন যে বন্দোবস্ত হওয়ার আগে ভূমি সংক্রান্ত অধিকারের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত। ১৮৩৩ এ বার্ড বন্দোবস্ত শুরু করেন। বন্দো-বস্তের কর্মকর্তাগণ যা করেছিলেন তা হল সাধারণভাবে দীর্ঘদিনের দখলের ভিত্তিতে 'ত্রুটিপূর্ণ ও লুপ্তপ্রায়' অধিকারকে বিশিষ্ট সম্পত্তিতে পরিণত করা। সম্পত্তি সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বন্দোবস্তের কর্মকর্তারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলির বৃহত্তর অংশে জমিদারী বন্দোবস্ত করেছিলেন।[১১] ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবটি শেষ পর্যন্ত ১৮৩৬ এ পরিত্যক্ত হয়—যেহেতু 'জমির দাম বেড়েই চলছিল।' রাজস্ব বৃদ্ধির বিচার বিবেচনা অংশত সরকারের নীতি নির্ধারণ করেছিল। রেল ও সামরিক ব্যয় বেড়ে চলছিল অথচ সরকার আয়করের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়াতে ব্যর্থ হচ্ছিল। সুতরাং সরকার ভূমি রাজস্বর সম্ভাব্য বৃদ্ধির সুযোগ ছেড়ে দিতে আগ্রহী ছিল না।

১৮৫৭ এর বিদ্রোহ সরকারের নীতিতে একটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন এনে দিল। অযোধ্যায় ব্রিটিশ সরকারের ভূমি সংক্রান্ত নীতিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৮৫৬ এ যদিও তালুকদাররা সম্পত্তিচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু এ দেশের একটি বিরাট অংশ জুড়ে তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ রয়ে গেল। সরকারের উদ্দেশ্য হল মালিক-চাষী শ্রেণীর গড়ে ওঠাকে উৎসাহিত করা।[১২] মহাবিদ্রোহের সময় গ্রামের তালুকদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তের একজন শক্তিশালী সমর্থক আউটরাম যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে "আমাদের

পক্ষে বা বিপক্ষে" ব্যবহার করার মতো ক্ষমতা এদের ছিল, গ্রামীণ মালিক-দের এর কোনটাই ছিল না।[১৩] বিদ্রোহের পর ক্যানিং জমির পাইকারী বাজেয়াপ্ত করণের বিখ্যাত ঘোষণা করেন। এরপর তালুকদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হল। জিদ বা গোয়াতুর্মির পরিবর্তে কৌশল অবলম্বন করাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। শাসক সম্প্রদায়ের কাছে সামাজিক খুঁটি হিসাবে ভূমি নির্ভর অভিজাত গোষ্ঠীকে লালন করাই ছিল খুব গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে তালুকদারদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হল, তাদের শাসনগত ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া হল। ১৮৬৬ এর আইনে প্রজাদের অধিকারকে জলাঞ্জলি দেওয়া হল।[১৪] স্বত্ববান রায়তদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে চীফ কমিশনার ১৮৫৯ এর বঙ্গীয় খাজনা আইনের ব্যবস্থাবিধিকে অনুসরণ করতে অসম্মত হলেন। লরেন্স তাঁর বিবরণীতে হতাশ প্রকাশ করে বলেছেন "অযোধ্যায় পুনর্দখলের সময় থেকে চীফ কমিশনারের একটাই লক্ষ্য থেকেছে, তাহল জমির সমস্ত অধস্তন অধিকার ও স্বার্থকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া··· যাতে তালুকদার ও স্বত্বহীন প্রজার মধ্যে কোনও মধ্যবর্তী স্বার্থ না থাকে।"[১৫] বাস্তবিকই প্রজাদের অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৬৮ র অযোধ্যার খাজনা আইনে প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত বারো বছরের নিয়ম থেকেও প্রজাদের বঞ্চিত করা হয়। ১৮৮০ এ দুর্ভিক্ষ কমিশন তাদের রিপোর্টে বলে যে প্রজাকে বন্দোবস্ত দেওয়া একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার ফলে স্বত্বহীন প্রজাদের কৃষির উন্নতি সাধন করার ক্ষেত্রে কোন অধিকার এবং কোন উৎসাহ নেই।[১৬]

পাঞ্জাবে মহালওয়ারি অথবা যৌথ গ্রামীণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। মহাল বা গ্রামগুলিকে সরাসরি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল, যদিও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য একজন নির্ভরযোগ্য ভূস্বামীকে নিযুক্ত করা হত।[১৭] সরকারের লক্ষ্য ছিল কৃষক মালিকানা তৈরী করা। যদিও জায়গীরদারদের অস্তিত্ব থেকে গেল, তা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র মালিকানার একটি দল গড়ে উঠল। পাঞ্জাবে দখলের অব্যবহিত পরেই ভূমিকর বৃদ্ধি পেল। কিন্তু ১৮৭২ এর মধ্যে এটা উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশে দাঁড়াল। ১৮৬৮ এ খাজনা আইন পাশ করা হল। এই আইনে প্রজাদের অধিকারের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হল। রমেশ দত্ত লিখেছেন যে সরকার প্রজাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে বুদ্ধিমানের মতোই ভূস্বামী শ্রেণীর দাবীকেও স্বীকৃতি দিয়েছে।[১৮]

কাঠামোগত পরিবর্তন

জমিদারী, মহালওয়ারি রায়তওয়ারি—এই ছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিস্বত্বের বন্দোবস্তের বিভিন্ন রূপ। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলির দ্বারা এদেশের কৃষিগত কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি খুব কমই নির্দেশিত হয়। ও ম্যালি একটি চমকপ্রদ অনুচ্ছেদে বলেছেন যে 'জমি ও গ্রামসমূহ জমির দালাল, আইন ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের দখলে চলে গেছে, প্রকৃতপক্ষে সারা দেশে খাজনা ভোগীদের বাহিনী বেড়ে চলছিল। জমির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যাচ্ছিল অকৃষকদের হাতে—যাদের অন্তর্ভুক্ত জমিদার, মহাজন ব্যবসায়ী এবং জমিনির্ভর ভদ্রলোক। জমি হয়ে দাঁড়াল পণ্য। এবং সারা দেশে জমির বাজার দ্রুত গড়ে উঠল। ব্রিটিশ রাজত্বে জমির মালিকানা অপ্রতিহতভাবে হাত বদল হচ্ছিল যার ফলে গ্রামের ভাবমূর্তি পাল্টে গেল। অধ্যাপক স্টোক্‌স্‌ উত্তর প্রদেশের কৃষিজ সম্পর্কের বিষয়ে তার সাম্প্রতিক গবেষণায় বলেছেন—'মূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্যটি জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে নয়, পার্থক্যটি অনুপস্থিত খাজনাভোগী এবং চাষবাসকারী জমির মালিকদের মধ্যে, যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বত্ববান প্রজা থেকে শুরু করে স্বত্বহীন প্রজা পর্যন্ত।[১৯] উত্তর প্রদেশ জমিদারী বিলোপ কমিটি একটি সুস্পষ্ট অনুচ্ছেদে কৃষিগত ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করে বলেছেন: "দু হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে লক্ষ লক্ষ লোক যে অধিকারগুলি ভোগ করছিল, এই সমস্ত বন্দোবস্তের ফলে সেই অধিকারগুলি থেকে তারা বঞ্চিত হল। উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকচাষী হয়ে দাঁড়াল মাত্রাতিরিক্ত খাজনার চাপে পীড়িত স্বত্বহীন প্রজা এবং এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যা নিরন্তর সামাজিক বিরোধ, অর্থনৈতিক অবক্ষয় এবং কৃষির অবনতি ডেকে আনল।"

ঊনিশ শতকে ভূমি মালিকানার কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল—সম্প্রতি কালের পুঞ্জীভূত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এটা স্পষ্ট। বাঙলা দেশের দিকে তাকানো যাক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াতেই বকেয়া পাওনার জন্য বহু রাজা ও জমিদারদের এস্টেট বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। রাজশাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, বিষ্ণুপুর, বীরভূম এবং মেদিনীপুরের বড়ো বড়ো জমিদাররা বিক্রী আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। আমাদের পঠন পাঠকের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হল, ভূস্বামীদের বিকাশমান শ্রেণীর সামাজিক গঠন।

রাণী ভবানীর মৃত্যুর পর নাটোরের রাজার জমিদারী ভেঙ্গে পড়ল এবং বহু সংখ্যক ছোট ছোট জমিদারী গড়ে উঠল, নাটোরের রাজার জমিদারীর বৃহৎ অংশ কিনে নিলেন কালী শঙ্কর রায় অর্থাৎ নাটোরের দেওয়ান, যিনি নড়াইলের জমিদারীর পত্তন করেছিলেন। অপর ক্রেতা ছিলেন ঠাকুরবাড়ী যারা ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণ পাল নামে একজন ব্যবসায়ী একটি অংশ কিনে জমিদারে পরিণত হলেন।[২০] বীরভূমে ক্রেতারা রাজার অধীনে পদাধিকারী ছিল, অবশিষ্ট অন্যান্যরা ছিল বণিক এবং বিভিন্ন জমিদারের অধস্তন কর্মচারী।[২১] উত্তরপাড়া জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন বেনিয়ানের পুত্র। তিনি হুগলী কালেক্টরেটে রেকর্ড কীপারের কাজ করতেন। তিনি জমিদারী কেনার কাজে নিযুক্ত হলেন এবং একজন বড়ো জমিদার হিসেবে আবির্ভূত হলেন। মহাজনী ব্যবসা ও শস্যের কারবার থেকে তিনি কখনও বিরত হননি। এ রকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একথা মনে করা ভুল হবে যে নোতুন জমিদারদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হত না। নতুন জমিদাররা আদৌ ক্ষুদ্র জমিদার ছিলনা.। প্রকৃতপক্ষে জমিদাররা 'জমিদারীর ওপর জমিদারী ও ভোগস্বত্বের ওপর ভোগস্বত্ব' কিনে প্রায়ই বৃহৎ তালুকের অধিকারী হত।[২২] দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, ঢাকা, ফরিদপুর, হুগলী, জঙ্গলমহল, ত্রিপুরা এবং কটকে ছড়িয়ে থাকা বিশাল ভূ-সম্পত্তি ঠাকুর পরিবার দখল করেছিলেন। কান্দী ও কাশিমবাজারের তালুক খুব বড়ো জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল। ১৮৮২ এ বাংলা ও বিহারের ১১০, ৪৫৬ টি তালুকের মধ্যে ২০,০০০ হাজার একরের বেশী জমির তালুক ছিল ০৪ শতাংশ। ১১ শতাংশ ভূ-সম্পত্তি ছিল ৫০০ থেকে ২০,০০০ একরের মধ্যে।[২৩] লক্ষ্যণীয় বিষয় হল জমিতে অধস্তন স্তরের বিন্যাস ও স্বত্বের বহুত্ব। প্রকৃতপক্ষে জমির অধস্তন ভোগদখলের নানা স্তরবিন্যাস ছিল, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ছিল স্থায়ী, হস্তান্তরযোগ্য উত্তরাধিকারের অধিকার। রাজস্ব ও খাজনার মধ্যেকার ফারাক ভূসম্পত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছিল। শহর ও গ্রামে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির একটি বিরাট অংশ জমিতে অধিকার অর্জন করেছিল এমন কি জমিদার ও কালেকটরেট দ্বারা নিযুক্ত আমলারাও ভূসম্পত্তি কিনতে ব্যর্থ হয়নি।

জোতদারদের দিকে এবার তাকানো যাক, যারা উনিশ শতকে একটি

সামাজিক শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ক্রমশঃ গ্রামীণ অর্থ-নীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠল। জোতদার সম্পর্কে খুব কম লেখকই আলোচনা করেছেন যদিও বুকনান-হ্যামিলটন ১৮০৬ এ উত্তর বাঙলার দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলায় জোতদারদের সন্ধান পেয়েছিলেন। জমির মালিকরা ছিল "নোতুন মানুষ" যারা এসেছিল প্রধানত ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্য থেকে। এদের জোতদার বলা হত এবং এদের জমি যোগাড় করে দিত "অত্যাচারী অনুচররা।" ব্যবসায়ীরা নিজেরা নিজেদের জমি চাষ করত না, কিন্তু ফসলের একটি অংশ পাওয়ার জন্য লোক নিয়োগ করত। প্রায় ষোলজনের একজন ছিল জোতদার, যে ৩০ থেকে ১০০ একর পর্যন্ত জমির খাজনা পেত। তারা জমির একটা অংশ নিজেরা চাষ করত এবং অন্য অংশে যে চাষ করত সে শস্যের একভাগ পেত। এই সমস্ত চাষীদের বৃহৎ পুঁজি ছিল। লক্ষ্যণীয় যে কৃষকরা বা কৃষিমজুররা কোনভাবেই সংখ্যায় বেশী ছিল না। পাটনা, ভাগলপুর, এবং কালনা থেকে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আসত, তারা কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের বাজারে জাহাজে করে বিপুল পরিমাণ ধানচাল পাঠাত। বহু মহাজন চাল, চিনি ও গুড় রপ্তানী করত।[২৪] বুকনান হ্যামিলটনের বিবরণী থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হল, জোতদাররা আসত ব্যবসায়ী ও কৃষকদের মধ্য থেকে এবং বর্গাদারদের সন্ধান পাওয়া যেত চাষের জন্য পুনরুদ্ধার করা জমিতে।

সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে পতিত জমি ও জঙ্গলকে চাষের আওতায় আনা হল। ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৭ এর মধ্যে ৪০ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ১৮৩০ থেকে ১৮৭২ এর মধ্যে সুন্দরবনে ৪৯৩,৯০৭ একর বা ৭৭১ বর্গমাইল জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছিল। পূর্ব বাঙলার হাতলাদারদের মতো, রিচার্ড টেম্পল ভালবেসে যাদের "কৃষক পুঁজিপতি" বলেছেন, সেই জোতদাররা বাঙলার জমি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। হাণ্টার লিখেছেন যে সুন্দরবন অঞ্চলে জমি পুনরুদ্ধারের ব্যয় জমির মালিকরাই বহন করত, যারা পরে জমিতে বর্গা চাষে বা ভাগ চাষে নিযুক্ত হয়েছিল। মেদিনীপুরে পতিত জমি পুনরুদ্ধারের ফলে ভাগ বন্দোবস্তের সৃষ্টি হয়েছিল।[২৫] এই ব্যবস্থায় কৃষক "জমি চাষ করে নিজের লাঙল দিয়ে এবং চাষের সমস্ত খরচ বহন করে। ফসল তোলার সময় সে সাধারণতঃ অর্ধেক নিজের হাতে রাখে ও বাকী অর্ধেক খাজনা হিসেবে

ক্ষেত্র বিশেষে জমিদার বা উঁচুতলার প্রজাদের হাতে অর্পণ করে।"[২৬] যশোর জেলায় রায়ত বলে বর্ণিত জোতদার পতিত জমি পুনরুদ্ধারের সময় নড়াইল ও মাগুরায় জমি দখল করেছিল। এরা কোনও দিন স্বহস্তে জমি চাষ করত না, তবে কখনও কখনও মজুরদের দিয়ে চাষ করাত। বেশীর ভাগ অঞ্চলেই জোতদাররা খুব অবস্থাপন্ন ছিল এবং যে খাজনা তাদের দেয়, তার থেকে কম খাজনাই তারা দিত।[২৭] মুর্শিদাবাদে এক একজন জমিদার তার জমির একটা অংশে "নিজেই জোতদার ছিলেন যা তিনি ভাগ ভাগ করে লীজ দিয়েছিলেন।"[২৮] পাবনা জেলায় বর্গাদার বলে পরিচিত "এক শ্রেণীর কৃষক ছিল যারা জোতদারের অধীনে জমি চাষ করত।"[২৯] পশ্চিম বাংলার জেলাগুলির জমিকে কিভাবে মহাজন দোকানদার অবস্থাপন্ন শ্রেণীদের কাছে বন্দোবস্ত দিয়েছেন, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"২৪ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান ও বীরভূমের জেলাগুলির প্রসঙ্গে আমি আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যে ১৮৫৯ থেকে এসব অঞ্চলের রায়তী স্বত্ব ধীরে ধীরে মহাজন, দোকানদার এবং স্বচ্ছল মানুষের হাতে চলে যাচ্ছে। এই সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের জোতকে হয় মালিক অথবা নোতুন প্রজার কাছে অস্বাভাবিক খাজনার বিনিময়ে ভাড়া দেয় এবং সার্ফ বা ভূমিদাসদের থেকে সামান্য উন্নত অবস্থায় পর্যবসিত করে।"[৩০]

হাণ্টার জোতদারদের বর্ণনা করেছেন "ক্ষুদ্র ভূস্বামী" বলে যারা প্রজাদের সঙ্গে আধাআধি ভাগে জমির বন্দোবস্ত করে জমি ভাড়া দিত। জোতদারদের সংখ্যা জেলায় জেলায় কমবেশী হত। আরও একটি শ্রেণী ছিল, ভদ্রলোক জোতদার। "জমির সঙ্গে যুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমাগত বৃদ্ধিকে" উৎসাহিত করা সরকারের নীতি ছিল। ২৪ পরগণায় ভদ্রলোক জোতদারদের সম্পর্কে হাণ্টার বলেছেন—"বর্গা বন্দোবস্ত প্রধানত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর দ্বারা অনুমোদিত ছিল।"[৩১] রেজিস্ট্রেশন রিপোর্টে একদল ক্রেতাকে "অন্যান্যরা" বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষরা হল মোক্তার, উকিল, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার যাদের নিজ "সম্পত্তির নিরাপদ লগ্নীর উপায় হিসেবে ঐ ধরণের সম্পত্তির প্রতি একটা পক্ষপাত ছিল।"[৩২] ও ম্যালি লিখেছেন যে দার্জিলিং জেলায় উকিলরা এবং ব্যবসায়ীরা জমি কিনেছিল ফাটকাবাজী ও লগ্নীর উদ্দেশ্যে।"[৩৩] গ্রানিং লিখেছেন যে জলপাইগুড়ির জোতদাররা এসেছিল আইন ব্যবসায়ী এবং মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে।[৩৪] যেহেতু

জমিতে লগ্নী করা নিরাপদ বলে মনে করা হত তাই ভদ্রলোকদের জমি কিনে তাতে বর্গা চাষের বন্দোবস্ত করার একটা ঝোঁক ছিল। অন্য কোনও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রের অভাবে অনিবার্যভাবেই ভদ্রলোকরা ভূ-সম্পত্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে তাদের বিশেষ স্বার্থ ছিল।

বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার এর লেখকগণ জোতদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন যারা সাধারণত জমিদারদের অধীনে জমির মালিক ছিল এবং নোতুন জমি পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছিল। দিনাজপুর জেলায় কর্ষণযোগ্য "জমির মালিককে রায়ত বলা হত অথবা স্থানীয় ভাষায় জোতদার।[৩৫] ও ম্যালি দার্জিলিং-এর জোতদারদের বর্ণনা করেছেন—"একজন সম্পন্ন কৃষক যে সুবিধাজনক খাজনায় জমির প্রকৃত উদ্ধারকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে।"[৩৬]

রংপুরে জোতদারদের অনেকেই ছিল "পূর্বতন প্রকৃত কৃষক" যারা "মধ্যস্বত্বভোগীতে" পরিণত হয়েছে এবং তারা জমিদারদের যে হারে খাজনা দেয় তার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণেরও বেশী হারে রায়তদের জমি ভাড়া দেয়। জোতদার শব্দটিতে "বোঝাত" "জমিদারদের প্রত্যক্ষভাবে অধীন যে কোনও প্রজাস্বত্ব ভোগদখলের আকার ও ধরণ যাইহোক না কেন।"[৩৭] বর্দ্ধমানের ভাগ জোতদারদের সম্পর্কে পিটারসন লিখেছেন, "প্রত্যেক সম্পন্ন প্রজারই ভাগ জোতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি থাকত…।"[৩৮]

বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত ব্যবস্থাকে ও ম্যালি বর্ণনা করেছেন "এই রকম বন্দোবস্তে প্রজা এক বছর বা একটি মরশুমে জমিকে কাজে লাগাত এবং জমির ফসলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ খাজনা হিসেবে দিত। সাধারণতঃ উৎপাদনের অর্ধাংশ এভাবে দিয়ে দেওয়া হত। জোতদার তার নিজের গরু বা বলদ এবং লাঙল দিয়ে জমি চাষ করত এবং বীজ ও সারের ব্যবস্থা নিজেই করত।'[৩৯]

১৯২৪—৪৬ পর্যন্ত সময়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, বর্গা ব্যবস্থার প্রসারণে জোতদারা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ভূমিরাজস্ব কমিশনের রিপোর্টে এ সময়ে মালিক চাষীর দখলী স্বত্ব হারানো এবং বর্গাদারদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির উল্লেখ আছে। ১৯২৯—৩৩ এ বিশ্ব-ব্যাপী মন্দার বছরগুলিতে বিস্তর জমি হস্তান্তর ঘটছিল যখন কৃষি পণ্যগুলির দাম দ্রুত পড়ে গিয়েছিল এবং জমি অকৃষিজীবীদের হাতে চলে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে এবং পরে জমি

হস্তান্তরের বিষয়টির প্রতি ভূমি রাজস্ব কমিশন নির্দিষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, 'বর্তমানের সবচেয়ে উৎকণ্ঠাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির একটি হল বর্গাদারদের সংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি। বংশানুক্রমিক রায়তরা তাদের মর্যাদা হারাচ্ছে এবং অপেক্ষাকৃত নীচু মানের জীবনযাত্রার দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে—এটা তারই পরিচায়ক।'[৪০] কিসান সভার কাছে এক স্মারকলিপিতে ভূমি রাজস্ব কমিশন এই প্রসঙ্গে বলেছে—'বাংলার আশেপাশের অঞ্চলগুলি সম্পর্কে এতটুকু ধারণা আছে এমন যে কোনও ব্যক্তির কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে এই ধরণের তথাকথিত প্রজাস্বত্ব অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে যে কোন ভাবে জমির এক তৃতীয়াংশ এইভাবে চাষ করা হচ্ছে।[৪১]

ফ্রাংক ওয়েন বেল ভ্রমণকালীন দিনপঞ্জীতে অর্থনৈতিক মন্দার বছরগুলিতে জোতদার কর্তৃক জমি ক্রয় করার বিষয়ে লিখেছেন। বেল এর দিনপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। প্রথমত বাংলার চিরাচরিত মহাজন সাহারা জমি কিনে তাকে বর্গা চাষে পরিণত করেছিল। যে মালিক চাষী জমি হারাল, সে বর্গাদার হিসেবে ঐ জমিতে পুনর্বাসিত হল। দ্বিতীয়ত, বর্গাদাররা (আধিয়ার বলে বর্ণিত) বড় বড় ভূসম্পত্তিতে নিযুক্ত হত। আপাতদৃষ্টিতে জোতদাররা যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দখল করেছিল। আমরা বেল এর দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃত করতে পারি ৹ 'অকৃষিজীবীদের কাছে জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল।' মহাজনীর বদলে জমি পেয়েছে এমন একজন সাহা আধিয়ারদের মাধ্যমে জমি চাষ করছে। (মৈমনসিংহ, ১৯৩৩)।

"আধিয়াররা বৃহৎ জোতদারের অধীন, যারা জমিদারকে পাঁচশত টাকা খাজনা দেয়। আধি ব্যবস্থা তখন গড়ে উঠে যখন ভূস্বামীর হাতে এত জমি থাকে যে তিনি তা স্বয়ং চাষ করতে পারেন না। তিন বৎসরের জন্য আধি কবুলিয়ত দেখা যায় যখন খাইখালামী হয়, অর্থাৎ বন্ধকদাতাকে বন্ধক গ্রহীতা জমিতে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করে।" (দিনাজপুর, ১৯৩৪)।

'এই গ্রামে অনেক ভদ্রলোক পরিবার বাস করে। তারা এখন জমি দখল করছে।' সাহারা আধিয়ারদের জমিতে বসিয়েছে। বলা হয় যে আধিয়াররা ফসল নির্বাচন করে। কি শস্য বোনা হবে তা জোতদার ঠিক করে। সে বীজ ও সার সরবরাহ করে। (রঙ্গপুর, ১৯৩৩)।[৪২]

বছরের পর বছর ধরে উত্তর বাংলার জোতদাররা জমি কিনেছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল। বেল লিখেছেন যে দিনাজপুরের

জোতদার শ্রেণী শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামাজিক দিক থেকে 'উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। জোতদার পরিবাররা অনেক বা হাজার হাজার একর জমি তাদের দখলে রাখতে পারত।' অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ডে ৩০ থেকে ৩০০ একর জমির মালিক জোতদার শ্রেণী থেকে প্রেসিডেণ্ট হত। জোতদারদের কয়েকজন তাদের সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতীক হিসেবে হাতি রাখত। তাদের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করত এবং আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করত। দিনাজপুরের পোরসা গ্রামের সা চৌধুরীরা দোতলা বাড়ি করেছিল এবং তাদের গোলায় থাকত ৬০,০০০ মণ ধান। ১০০ একর বা তার কিছু বেশী জমির মালিকানা সম্পন্ন ছোট জোতদারও ছিল। ধানের ব্যবসা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একজন মুসলমান জোতদার আইন ব্যবসায়ে রত একজন উকিল 'রায়তীস্বত্বে' ১,০০০ একর জমির অধিকারী ছিল। সে তার সঞ্চয় নিয়োগ করেছিল মহাজনী কারবারে এবং ৭৫,০০০ টাকার পুঁজি দিয়ে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল।[৪৩] উত্তর বাঙলার জোতদাররা ছিল ধনী কৃষক একথা মনে করা সত্যি অবাস্তব ব্যাপার।

পূর্ব উত্তর প্রদেশে বারাণসী জেলায় জমি হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছিল। ১৮০১ থেকে ১৮০৬ এর মধ্যে বারাণসীতে ভূসম্পত্তির প্রায় অর্ধেক হস্তান্তরিত হয়েছিল।[৪৪] গাজিপুর জেলায় ১৮৪২-৮২ এর মধ্যে "এক চতুর্থাংশ জমির হাত বদল ঘটেছে।" ঊনিশ শতকের প্রথমভাগে রাজস্বর বকেয়া পাওনার জন্য জমিদারদের তালুক বিক্রী হয়েছে। ১৯৪০ থেকে রাজস্বর বকেয়া পাওনা মেটানোর জন্য জমিদাররা তালুকের একাংশ বিক্রী করতে থাকে। নীলাম বিক্রীতে রাজপুত, ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানদের ভূমিকা ছিল প্রধান। তাদের জমি চলে যেত প্রধানত ভূমিহারদের (প্রধানত বারাণসীর মহারাজ) হাতে।[৪৫] কায়স্থ এবং বানিয়ারা যারা সরকারী কাজকর্ম ব্যবসা এবং আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা বিক্রেতার অন্য একটি দল গড়ে তুলেছিল। প্রায় ৪১ ভাগ জমি কেনা হয়েছিল এমন পরিবারের কাছ থেকে যাঁদের প্রধান জীবিকা ছিল মহাজনী কারবার, চাকুরী ও আইন ব্যবসা। এই সমস্ত পরিবারদের অধিকাংশ বাস করত বারাণসী শহরে। ১৮৮৫ এ বারাণসী, বালিয়া, গাজিপুর, ও জোনপুর জেলায় ১৩৪ জন বড়ো রাজস্ব দাতা ছিলেন। বার্ষিক এক হাজার টাকারও বেশী রাজস্ব দিত এমন বড় ভূস্বামীদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ এসেছিল

'নোতুন মানুষ' 'দের মধ্যে থেকে যারা তহশীলদার, সেরেস্তাদার, আমিন হিসেবে শাসন কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং ব্যবসায়ী পরিবার গুলির ব্যাংকিং, মহাজনী ও দানাশস্যের বাণিজ্য ও চিনি উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। ৪৬ শতাংশ ছিল অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্গত যার মধ্যে ছিল বারাণসীর মহারাজা, এই অঞ্চলের এককভাবে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদান কারী এবং ডুমরাও ও ভিজিয়ানাগ্রামের দুজন রাজা।[৪৬] উনিশ শতকের শেষ ভাগে বারাণসীতে একদল নতুন ভূস্বামীর আবির্ভাব ঘটল। যেহেতু কৃষিপণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছিল এবং আখের উৎপাদন লাভজনক হচ্ছিল তাই জমিতেই সঞ্চয় বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছিল। নোতুন ভূস্বামীদের অধিকাংশই বাস করত শহরে এবং তারা ছিল অনুপস্থিত খাজনা গ্রহীতা যারা তাঁদের শির জমিতে 'শিকমি' বা বর্গাদারদের নিয়োগ করত।[৪৭]

উত্তর প্রদেশে যে সব বড়ো বড়ো জমিদাররা কোনওভাবে টিঁকে ছিল তারা ভূমি হস্তান্তরের ফলে খুব কমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর প্রধান শিকার হয়েছিল ছোট ছোট ভূস্বামী ও চাষী মালিকেরা। কানপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার গ্রেসি (gracey) ১৯০৭ এ লিখেছিলেন ঃ 'বাস্তব ঘটনা এই যে ভারতীয় অর্থনীতিতে একমাত্র সেই জমিদারেরই উপযুক্ত স্থান আছে, যে হয় এমন একজন বড়ো তালুকদার যার সম্পত্তি জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকার আইনের দ্বারা পরিচালিত এবং এত বিশাল জমিদারীর মালিক যে তার পক্ষে উদার হওয়া সাজে অথবা নিজে জমি চাষ করে এমন কৃষক মালিক। যে সমস্ত মধ্য স্বত্বভোগী তাদের খাজনার ওপরেই জীবন নির্বাহ করার চেষ্টা করে এবং যাদের সম্পত্তি ক্রমাগতই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হচ্ছে, তাদের কোনও আশ্রয়স্থল নেই···।'[৪৮]

জমির মালিকদের সামাজিক গঠন বিন্যাসে বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটেছিল। পশ্চিম উত্তর প্রদেশে মোগল আমলের পুরানো অভিজাতরা যেমন মুসলমান রাজপুত এবং তাদের কায়স্থ ভৃত্যরা জমিচ্যুত হচ্ছিল; বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, কালোয়ার ইত্যাদি ব্যবসায়ী ও মহাজনী শ্রেণীরা নতুন ভূস্বামীরূপে আবির্ভূত হল। কিন্তু বিশাল বিশাল ভূসম্পত্তি টিঁকে ছিল। ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের জয় করা যায় বলে মনে হয়েছিল কিন্তু বৃহৎ ভূস্বামীরা টিঁকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলিগড়ে ১৮৭৪ এর ১২ শতাংশ মুসলমান জমি মালিকানা ১৯৪৩ এ নেমে আসে ১৫·৭ শতাংশ ভাগে। কিন্তু বড়ো বড়ো মুসলমান জমিদার

টি'কে ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০ এর পরবর্তী সময়ে বড়ো জমিদারের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় স্থিতিশীলতা দেখা গিয়েছিল।[৪৯] এক্ষেত্রে যা লক্ষ্যণীয়, তা হল, 'ভদ্র কৃষক শ্রেণীর অবলুপ্ত হওয়ার ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল।[৫০] কানপুর জেলাকে এখানে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। এখানে বড়ো জমিদারীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। ১,২২৯ জন ব্যক্তির মালিকানাধীন মাঝারি রকমের তালুক রাজস্বের ৫০ শতাংশ দাবী মেটাত। কানপুরে 'খাজনার অধিকার' অর্জনে ভালরকম বাণিজ্যিক বিনিয়োগ হত।'[৫১]

সহজেই মালিকানা হারানোর প্রবণতা আছে এমন ছোট চাষী বছরের পর বছর ধরে তার জমি হারাচ্ছিল এবং প্রান্তিক চাষী ও স্বত্বহীন প্রজার সংখ্যা বাড়ছিল। জমিদারী বিলোপ কমিটি হিসেব করেছিল যে ৬৭'৮ শতাংশ চাষীর এক একরেরও কম জমির মালিকানা ছিল। ৮১'২ শতাংশ চাষী ছিল ৫ একর জমির অধীন। মনে হয়, ছোট খামারের বদলে বড়ো খামার গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক স্টোকস্ উত্তরপ্রদেশের কৃষিগত কাঠামোর এই বৈশিষ্ট্যের উপর লিখেছেন: (পেশা হিসেবে) কৃষিকে অনুসরণ করার প্রবণতা অর্থনৈতিক ভাবে বড়ো খাজনা-গ্রহীতার প্রতি-যোগী হতে পারে এমন কৃষকশ্রেণীর থেকে বরং উপরতলায় বলিষ্ঠ অভি-জাত কৃষক গড়ে তুলছিল।[৫২] আমরা দেখতে পাব যে জমিদারদের জমি-দারীর একটি বিরাট অংশ ছিল শির জমি—স্বত্বহীন প্রজা বা মজুর দিয়ে এই জমি চাষ করা হত।

ঊনিশ শতকের প্রথমভাগে উড়িষ্যায় ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত এবং ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতা উপভোগকারী বাঙালী আমলারা নীলাম বিক্রীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাইক পাড়ার সিংহরা উড়িষ্যার বিশাল ভূসম্পত্তি দখল করেছিল। ১৮৩০ এর থেকে যে নোতুন দলটি ব্যবসা ও মহাজনী কারবার করে সৌভাগ্য গড়ে তুলছিল, তারাই ছিল জমিদারীর ক্রেতা। বালেশ্বরের সেটেলমেণ্ট অফিসার লিখেছেন "তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এমন ব্যক্তি ছিলেন, জমির মালিক হওয়া ছাড়াও যাদের কিছু মহাজনী কারবার ছিল এবং বাকীরা ছিল বৃত্তিধারী মহাজন।" বালেশ্বরের তিলি মহাজন এবং তামিলী বণিকরা ছিল জমির নোতুন ক্রেতা। পুরী জেলায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পুরোহিত শ্রেণী এবং কটকের বড়ো মহাজন পরিবাররা ছিল জমির প্রধান মালিক। সেটেলমেন্ট অফিসার লক্ষ্য করেছিলেন যে "জমিদারী স্বার্থের এক অর্ধাংশ" ধর্মীয় ও মহাজন শ্রেণীর হাতে চলে গিয়েছিল।[৫৩] দক্ষিণ

কটকে মহাজনদের পরিবার—ভীমারপুর ও গজরাজপুরের চৌধুরীদের এবং মোহান্ত রঘুনন্দন দাসের হাতে ছোট জমিদারী চলে গিয়েছিল।[৫৪] কৃষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের জমি হারিয়েছিল এবং স্বত্ব-হীন প্রজা ও বর্গাদার হিসেবে তারা কাজ করত।

উত্তরপ্রদেশের মতোই বিহারের বড়ো বড়ো জমিদারী টিঁকে ছিল। চম্পারণ জেলায় বড়ো জমিদার ছিল বেতিয়া রাজ, মধুবন রাজ, মুহাররাজ ও রামনগর রাজ। মোগল আমল থেকেই তারা ভূমিহার ও রাজপুত প্রধান ছিল। একমাত্র মুহাররাজ বিক্রী আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ছোট জমিদারীতে বিভাগ হয়ে গিয়েছিল। অন্য বড়ো জমিদাররা দেশ বিভাগ বা বিক্রী আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।[৫৫] দ্বারভাঙ্গা রাজ, সাবানের হুটোয়া এস্টেট এবং শাহাবাদের ভূপনারায়ণ সিংহের এস্টেটের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। জমি হস্তান্তর চলছিল ঊনিশ শতক জুড়ে এবং নোতুন ক্রেতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, য়ুরোপীয় নীলচাষের মালিক এবং স্থানীয় মহাজন। পূর্ণিয়াতে মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিল। চম্পারণে নীলচাষের অন্তর্ভুক্ত ছিল জমিদাররা।[৫৬] রাজস্ব ও খাজনার মধ্যেকার ফারাক যেমন বাড়ল, জমির মালিকরাও নিশ্চিতরূপে তাদের জমির একাংশ অধীন রায়তদের ভাড়া দিয়েছিল যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বাতাইদাররাও। অল্প কয়েকজন জমিদার জিরাত হিসেবে জমিকে রেখেছিল যেখানে কৃষি মজুরদের নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৩০ থেকে যথেষ্ট জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল এবং বকস্‌ত্‌ জমির প্রসারণ ঘটেছিল। কৃষক আন্দোলনের মুখে কংগ্রেস সরকার ১৯৩৮ এ বিহারে বকস্‌ত্‌ জমি প্রত্যর্পণের আইন পাশ করা হল।[৫৭]

ঊনিশ শতকের শেষ দিকে ছোটনাগপুরে পুরানো সাম্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। উপজাতি জায়গীরদার অথবা উপজাতি প্রধানের পরিবর্তে এল উপজাতি নয়, এমন জমিদার। পালামৌতে রাজপুত জায়গীরদার প্রভাবশালী শক্তি হয়ে দাঁড়াল। ১৮৫৬ এ রাঁচি জেলায় জায়গীরদারদের সংখ্যা দাঁড়াল ৬০০। ১৮৭৪ এর মধ্যে প্রাচীন মুণ্ডা ও ওঁরাও প্রধানদের পরিবর্তে হিন্দু চাষীরা এল। উপজাতিদের মধ্যে বড়ো রকমের জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল। জমি চলে গেল উপজাতি নয় এমন জমিদার ও মহাজনদের হাতে। ১৯০৮ এ ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ার পর জমি হস্তান্তর চলতে থাকল। ১৯২০র সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে

দেখা যায়, জমিদাররা প্রজাস্বত্ব আইনকে এড়িয়ে গিয়েছিল এবং ওঁরাও ও মুণ্ডারা দখলী স্বত্ব বিহীন রায়ত ও কৃষিমজুরদের বাহিনীকে বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৯১৮ এ পালামৌতে প্রায় ষাট হাজার কামিয়া ছিল, যারা ছিল প্রধানত সার্ফ বা ভূমিদাস।[৫৮]

বোম্বাইতে জমি হস্তান্তরিত হল মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছে যারা ভূস্বামী ও রায়তদের মধ্যবর্তী মালিক হিসেবে গড়ে উঠল। তুলা উৎপাদন লাভজনক ছিল তাই মারোয়াড়ীরা ভূ-সম্পত্তিতে পুঁজি নিয়োগ করল। মহাজনেরা যারা প্রধানত মারোয়াড়ী পরিবার থেকে এসেছিল তারা ১৮৬০ এর দশকে ছিল "বিস্তীর্ণ জমির মালিক।"[৫৯] উল্লেখযোগ্য যে পার্শী ও গুজরাটি বণিকদের কাছে জমি ছিল বিনিয়োগের প্রিয় ক্ষেত্র। বোম্বাই শহরে সবচেয়ে ধনী ভূস্বামী এসেছিল পার্শীদের মধ্য থেকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জমির দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা ভূ-সম্পত্তি থেকে আয় ভোগ করছিল। বিশিষ্ট পুঁজিপতি জামসেদজী টাটাও একজন বড়ো ভূস্বামী ছিলেন। তিনি নভসারিতে তাঁর পিতার ভূ-সম্পত্তি অধিকার করেছিলেন এবং বোম্বাই, মাহাদ, জুহু, বান্দ্রা, আনিক ও উটকামণ্ডে জমি কিনেছিলেন। ব্যবসায়ী ও লক্ষপতি কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ছিলেন বোম্বাইয়েব বৃহত্তম ভূস্বামীদের অন্যতম।[৬০]

রায়তউয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে কুনবিরা ক্রমশঃ প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। তাদের পরিবর্তে এল বানিয়ারা যারা ছিল প্রধানত মারোয়াড়ী। ১৮৭৬ এর দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশনের রিপোর্ট মারোয়াড়ী মহাজনদের আবির্ভাবের বিষয়ে বড়ো রকমের আলোকপাত করে। উনিশ শতকে কামারচাঁদ নামে একটি মারোয়াড়ী পরিবার আহমেদনগর জেলায় পার্নারে এসেছিল। কামারচাঁদের বড়ো ছেলে তুকারাম বাবার সহযোগী কর্মকর্তা হিসেবে মহাজনী কারবার শুরু করে এবং ক্রমে নিজস্ব তহবিল গড়ে তোলে। পার্নার ও নাগার তালুকে তার হিসেবের খাতায় সরকারের জমির বাবদে ৬৬৪ টাকা ছিল। কি পরিমাণ জমি তাঁর কাছে বন্ধক দেওয়া ছিল···নির্ভুল হিসেব দেওয়া অসম্ভব।···কুলকার্ণি লিখেছেন যে ১৮৭১-৭২ এর জন্য তুকারামের কাছে বার্ষিক ২,০০০ টাকা ধার্য করা হয়েছিল।[৬১] ১৮৬৩ এ রাওজী কাত্তরী রাজমুল মারোয়াড়ীর কাছ থেকে ২০০ টাকা ধার করেছিল। সুতরাং রাজমুল কাতরী এষ্টেটে রাওজীর অংশ দখল করে নিল। ফলে, রাওজীকে গ্রাম ছেড়ে তার স্ত্রীর গ্রামে ক্ষেতমজুর হিসেবে

কাজ করতে হল।[৬২] জমির ওপর মহাজনদের মালিকানা বাড়তে লাগল এবং কৃষকের জমি ক্রমশঃ কমতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে কুনবিরা তাদের জমি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। ১৮৬৯-৭০ এবং ১৮৭৩-৭৪ এর মধ্যে বন্ধকী কারবার ও বিক্রীর দলিলের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য জমি হস্তান্তর হয়েছিল। ১৮৭২এ পুণাতে কৃষকদের বিরুদ্ধে ঋণের দায়ে ১৪৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আহমেদনগর জেলায় তথাকথিত দখলের এক অষ্টমাংশ ছিল মহাজনদের হাতে।[৬৩] ডঃ ক্যাটানাক বলেন ঃ পরিসংখ্যান ও সরকারী রিপোর্টের সম্মিলিত প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা অবশ্যই এই ধারণাকে সমর্থন করব যে দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গার কুড়ি বা ত্রিশ বছর আগে কৃষিজীবীদের হাত থেকে অকৃষিজীবীদের হাতে জমি হস্তান্তরের ঘটনা ঘটেছিল এবং সম্ভবত তা ক্রমশঃ বাড়ছিল।"[৬৪]

বছরের পর বছর ধরে এই ঘটনা ঘটে চলল। বোম্বাই ভূমি রাজস্ব বিভাগের ১৯২৬-২৭ এবং ১৯৩৬-৩৭ এর রিপোর্ট দেখে মনে হয়, মালিক-কৃষকদের দ্বারা অধিকৃত পাঁচ মিলিয়ান একর জমি বা শতকরা কুড়ি ভাগেরও বেশী জমি মহাজনদের হাতে চলে গিয়েছিল।[৬৫] এর ফলে খাজনাদায়ী প্রজা ও কৃষি মজুরদের উদ্ভব হয়েছিল যারা কৃষকদের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল এবং যাদের জমি মহাজনদের কাছে বন্ধক দেওয়া বা বিক্রী করতে হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী লেখকরা সঙ্গতিপূর্ণভাবেই ভূমি করের ওপর তাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট করেছিলেন। ভূমিরাজস্বর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানোর প্রবণতা তাদের ছিল। তাদের ব্যাখ্যায় যা অনুপস্থিত তা হল কৃষি ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তনের বিশ্লেষণ। যখন আমরা দেশকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তখন কতকগুলি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জমি-প্রধানত অকৃষিজীবীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল ; এরা ছিল প্রধানত ব্যবসায়ী, মহাজন এবং শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ভূসম্পত্তি বন্ধক দেওয়া হচ্ছিল বা বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল। একটি নোতুন ভূস্বামী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল। এ-কথা ঠিক যে কিছু রাজা ও বড়ো বড়ো ভূস্বামী কোনও রকমে টিঁকে ছিল। কিন্তু ভারতীয় অভিজাতদের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে উঠতি ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছে বিনিয়োগের প্রিয় ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল জমি। দেখা যাবে যে বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যেহেতু শিল্পায়ণের গতি ছিল মন্থর

তাই শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিশেষত জমিদারী এলাকার ভূ-সম্পত্তি দখল করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ভদ্রলোক জোতদাররা ছিল বাঙলা দেশে স্বীকৃতিযোগ্য একটি সামাজিক শ্রেণী। প্রজাদের কাছ থেকে আর্থিক খাজনা নেওয়ার ব্যাপারে এরা কদাচিৎ উৎসাহী হত কিংবা জমি চাষের জন্য কৃষি মজুরদের ওপর এরা খুব কমই নির্ভর করত। অনুৎপাদক খাজনা গ্রহীতা শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন জমির মালিকদের বিতাড়ন চলছিল। এবার কৃষক সমাজের ভাঙনের কাহিনীর দিকে তাকানো যাক। ভূমি-স্বত্বের কাঠামো সংক্রান্ত পর্যালোচনা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কৃষক সমাজের মধ্যে শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে অর্থনৈতিক অনুসন্ধানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক, যা এদেশে আগেই করা উচিত ছিল বলে মনে হয়।

নির্দেশিকা

১। রিপোর্ট অফ দি ইণ্ডিয়ান ট্যাক/সেসন এনকোয়ারি কমিটি (১৯২৪-২৫), অনুচ্ছেদ ৯৬।

২। ও ম্যালি (সম্পাদক), মডার্ণ ইণ্ডিয়া এ্যান্ড দি ওয়েস্ট, ১৯৪১, পৃ—৭০৭।

৩। মুখার্জি এন্ড ক্রাইকেনবার্গ, দি রায়তওয়ারি সিস্টেম, ক্রাইকেন বার্গ (সম্পাদক) ল্যান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড সোস্যাল স্ট্রাকচার ইন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী, পৃ—২০০।

৪। ঐ পৃ—২২৫।

৫। ক্রাইকেনবার্গ, গুন্টুর জেলা (১৭৮৮-১৮৪৮) পৃ ৬৬।

৬। ঐ পৃ—৬৮।

৭। আর সি দত্ত, ইকনমিক হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়া ইন দি ভিক্টোরিয়ান এজ, ১৯০৬, পৃ—৩২৯।

৮। ঐ

৯। ঐ পৃ—৩৩২।

১০। ঐ পৃ—৪৯২।

১১। ও ম্যালি, পূর্বোল্লিখিত। পৃ—৭১০-১১।

১২। জে রাজ, দি মিউটিনি এ্যান্ড ব্রিটিশ ল্যান্ড পলিসি ইন থর্ন

ইন্ডিয়া (১৮৫৬-৬৮), ১৯৬৫, পৃ—১৯।

১৩। ঐ পৃ—২২।

১৪। ঐ পৃ—৭১।

১৫। মিনিট, ১৯ শে জুন, ১৮৬৪, রাজ, পৃ—৯৮।

১৬। রিপোর্ট অফ দি ফেমিন কমিশন (১৮৮০)। পৃ—১২০-২২।

১৭। রিপোর্ট অফ দি কংগ্রেস এ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস্ কমিটি (১৯৪৯)।

১৮। আর সি দত্ত। পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২৭১। দত্ত 'বুদ্ধিমান শাসকদের' প্রশংসা করেছিলেন যারা 'ভূসম্পত্তি নির্ভর শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়নি।

১৯। এরিক স্ট্রোকস, দি স্ট্রাকচার অব ল্যান্ডহোল্ডিং ইন উত্তর প্রদেশ (১৮৬০-১৯৪৮), দি ইন্ডিয়ান ইকনমিক এ্যান্ড সোস্যাল হিষ্ট্রী রিভিউ (এপ্রিল—জুন) ১৯৭৫।

২০। পি সিন্হা, সোস্যাল চেঞ্জ, এন কে সিন্হা, (সম্পাদক) হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫) পৃ—৪২২।

২১। বি চৌধুরী, ল্যান্ড মার্কেট ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ায় (১৭৯৩-১৯৪০), দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক এ্যান্ড সোস্যাল হিষ্ট্রী রিভিউ, এপ্রিল—জুন, ১৯৭৫।

২২। পি সিন্হা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৪২৩ ; পালিত, টেনসনস্ ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি (১৮৩০-৬০), পৃ—১৬-১৭।

২৩। ব্যাডেন-পাওয়েল, ল্যান্ড সিস্টেমস্ অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১৮৯২, পৃ—৪৪১।

২৪। বুকানন হ্যামিলটন, জিওগ্রাফিকাল, স্ট্যাটিসটিকাল অ্যান্ড হিস্টরিকাল ডেসক্রিপসন অফ দিনাজপুর, ১৮৩৩ ; এ ছাড়া বুকানন হ্যামিলটন পেপারস।

২৫। ডাবলিউ, ডাবলিউ হান্টার, এ-স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, ১ ম খণ্ড, পৃ—৩৩৭-৩৮।

২৬। ঐ তৃতীয় খণ্ড। মেদিনীপুরের ভূ-স্বামীদের সম্পর্কে হাণ্টার নিম্নলিখিত সংখ্যাগত হিসেব দিয়েছেন : জমিদার ৯৮৮ ; তালুকদার ২,২২৫ ; ইজারাদার ৩৩৭ ; জোতদার ৪০২।

২৭। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, যশোরে জোতদারদের সংখ্যা ছিল ৫,৬৯৭।

২৮। ঐ নবম খণ্ড।

২৯। ঐ।

৩০। ১৬ই অক্টোবর, ১৮৭৩ এর ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার 'রায়ত অ্যাণ্ড-জমিদার' শীর্ষক অংশে।

৩১। ডাবলিউ ডাবলিউ হাণ্টার, পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ—১৫৫, ৩৩৮।

৩২। বেঙ্গল রেজিস্ট্রেসন রিপোর্ট (১৮৮১-৮২) চৌধুরীর প্রবন্ধে উল্লিখিত, পূর্বোল্লিখিত পৃ ৩০৭।

৩৩। দার্জিলিঙ ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৭)।

৩৪। জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৮)।

৩৫। দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯১২)।

৩৬। দার্জিলিঙ ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৭)।

৩৭। রঙ্গপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৮)।

৩৮। বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৮)

৩৯। বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৮)।

৪০। রিপোর্ট অফ দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন বেঙ্গল। ১ম খণ্ড, পৃ—৩৮-৩৯, রিপোর্ট অফ দি কংগ্রেস অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস কমিটি (১৯৪৯) লক্ষ্য করেছিল: '…বিগত মন্দার সময়, বিপুল পরিমাণ জমি কৃষকদের হাত থেকে অকৃষকদের হাতে চলে গিয়েছিল…।' পৃ—৪০।

৪১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার স্মারক লিপি (১৯৩৯); পুরো অংশটির জন্য রিপোর্ট অফ দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন (১৯৪০), ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৪২। এফ ও বেল সংগ্রহ, মিস্‌সেলেনিয়াস পেপারস (১৯৩১-৪১):

৪৩। বেল, ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট অপারেশনস ইন দি ডিষ্ট্রিক্ট অফ দিনাজপুর (১৯৩৪-৪০), ১৯৪২।

৪৪। বার্ণার্ড এস কোহ্‌ন, স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ইন রুরাল সোসাইটি, ফ্রাইকেনবার্গ (সম্পাদক), ল্যাণ্ড কন্ট্রোল অ্যাণ্ড সোস্যাল স্ট্রাকচার ইন ইণ্ডিয়া, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৪৫। ঐ, পৃ ৭৬।

৪৬। ঐ, পৃ—৭৬-৭৮, ৮০।

৪৭। ঐ, পৃ—১০৫-০৭। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে জমির

দাম বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাজনাদাতা প্রজারা যে জমি চাষ করত, তা কেনার একটা ঝোঁক অকৃষকদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

৪৮। কানপুর সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট (১৯০৭) ষ্টোকস্ পূর্বোল্লিখিত।

৪৯। ষ্টোকস, পূর্বোল্লিখিত।

৫০। ঐ, গ্র্যামি ১৯০৭ এ আক্ষেপ করেছিলেন: ...পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যাঙ্কার, ফাটকাবাজ এবং বাণিজ্যিক শক্তি সমূহের অগ্রগতি ও সাফল্য...'।

৫১। ঐ।

৫২। ঐ।

৫৩। সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট, উড়িষ্যা (১৮৯২—৯৮) চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত।

৫৪। পুরী ফাইনাল রিপোর্ট, চৌধুরী, ঐ, উত্তর কটক ও বালেশ্বরে ক্রেতারা আসত 'কৃষক শ্রেণী' থেকে, প্রধানত, ধনী কৃষকদের মধ্য থেকে।

৫৫। ফাইনাল রিপোর্ট অন সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট অপারেশনস, চম্পারন (১৯১৩—১৯)।

৫৬। ঐ।

৫৭। প্রসিডিংস অফ অল ইণ্ডিয়া কিসান সভা (১৯৩৬-৩৯)।

৫৮। এই তথ্যটির ভিত্তি হল—কে সুরেশ সিং এর ট্রাইবাল ল্যাণ্ড অর্গানাইসেসন ইন ছোটনাগপুর, ট্রেণ্ডস্ সোসিও ইকনমিক চেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া (১৮৭১—১৯৬১) সিমলা, ১৯৬৯ দ্রষ্টব্য।

৫৯। রিপোর্ট অফ বম্বে চেম্বার অফ কমার্স (১৮৬৪—৬৫)।

৬০। সেন, দি হাউস অফ টাটা (১৮৩৯—১৯৩৯), ১৯৭৫, পৃ—১১, ২৩।

৬১। রিপোর্ট অফ দি ডেকান রায়ট্স্ কমিশন (১৮৭৬), ১ম খণ্ড, এ ছাড়াও আর কুমার এর ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি, ১৯৬৮, পৃ—১৫৯।

৬২। ঐ, পুণাতে 'অপেক্ষাকৃত ভাল শ্রেণীর জমি' সাহুকারদের হাতে চলে গিয়েছিল।

৬৩। ঐ. পৃ—৫৫—৫৯, ক্যাটানাক, রুরাল ক্রেডিট ইন ওয়েস্টার্ণ ইন্ডিয়া, ১৯৭০, পৃ-১৭।

৬৪। ক্যাটানাক, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২০।

৬৫। এম জে প্যাটেল, এগ্রিকালচারাল লেবারস ইন মডার্ণ ইন্ডিয়া আন্ড পাকিস্তান, পৃ—৫৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষকদের মধ্যে স্তর বিন্যাস

কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক বিকাশের আলোচনা থেকে এ দেশ মুক্ত থাকেনি। আশ্চর্যের বিষয় যে ব্রিটিশ আমলে কৃষকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান পার্থক্যকীকরণ কদাচিৎই আমাদের কিছু বিশিষ্ট লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা যেন মনে করতেন কৃষকরা একটি সমরূপ শ্রেণী। এই সহজ তথ্যটি প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে কৃষকদের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি সামাজিক স্তর রয়েছে যাদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ও উচ্চাশা আছে। কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভবের প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে গিয়ে আমরা একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হই: পরিসংখ্যানগত প্রমাণের অপ্রতুলতা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, জনগণনার বিবরণীতে প্রায়ই 'কৃষকশ্রেণী,' 'প্রজা,' 'মালিক কৃষক' এর উল্লেখ থাকে। কিন্তু কৃষক পরিবারগুলির জমির মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ হত; 'জনগণনার সংশোধিত সংজ্ঞা' কিভাবে 'কৃষিসম্পর্ক সংক্রান্ত বিপ্লব' এনেছিল তা আমাদের বলা হয়েছে।[১] ১৯৫১ সালে জনগণনার বিবরণীতে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে 'অকৃষক মালিক' 'মালিক কৃষক' 'কৃষি মজুর' 'প্রজা কৃষক' ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, 'অকৃষক মালিক' এবং 'মালিক কৃষক' এর মধ্যে বিভিন্ন স্তর ছিল কিনা।' 'অকৃষক মালিক' বলতে শুধুমাত্র অনুপস্থিত খাজনা গ্রহীতাদেরই নয়, এমন কি ধনী কৃষকদেরও ধরা হয়েছে কিনা, তা আমরা জানিনা।

ডাঃ চন্দ্র আমাদের বলেছেন, অষ্টাদশ শতকে কৃষকদের মধ্যে স্তর বিন্যাস যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যেত। ব্রিটিশ রাজত্বে এই প্রক্রিয়া তীব্রতর হয়েছিল এবং স্তরবিন্যাসে নোতুন সামাজিক রূপ নিয়েছিল।[২] শিল্পের বিকাশ, শিল্প কেন্দ্র গঠন, কৃষকদের গ্রাম ছেড়ে শহর ও শিল্পাঞ্চল গুলিতে যাওয়া গ্রামীণ বন্দোবস্তের ওপর খুবই শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল। কৃষকদের ব্যাপক অংশ কৃষি মজুর এবং কারখানা মজুর হিসাবে অনিবার্যভাবে ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তের আওতায় চলে আসছিল। বাজার প্রসারলাভ করছিল এবং অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী কৃষকদের আবির্ভাব

ঘটছিল। এরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রেতা হিসেবে বাজারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে কৃষকদের মধ্যে স্তর বিভাগ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুত বাড়ছিল। সমসাময়িক সরকারী রিপোর্টে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। ১৮৮০র দুর্ভিক্ষ কমিশন বলেছে—'স্বত্ববান শ্রেণী' ভেঙ্গে পড়ছিল এবং প্রজারা দুর্বহ করের ভারে পীড়িত স্বত্বহীন প্রজার দলে মিশে যাচ্ছিল। ডাফরিন অনুসন্ধান কমিটি মজুর ও প্রজার ক্রমবর্দ্ধমান শ্রেণীগুলির সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।[৩] আপাতদৃষ্টিতে 'অকৃষকীকরণের' পদ্ধতি এগিয়ে চলছিল। এবার 'অকৃষকীকরণের' পদ্ধতি ও কৃষিগত কাঠামোর ওপর তার তাৎপর্যকে পরীক্ষা করা যাক।

খাজনা দাতা প্রজা

জমিদারী ও রায়তউয়ারী উভয় অঞ্চলেই অকৃষিজীবীরা জমি বন্দোবস্ত দিত এবং প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। খাজনা দাতা প্রজাদের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, তারা এমন প্রজা যে ভূস্বামীর জমি চাষ করে এবং খাজনা হিসেবে তাকে ফসলের একটি অংশ দেয়। সরকারী রিপোর্টে তাদের "স্বত্বহীন প্রজা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে "যাদের প্রজাস্বত্বের কোন নিরাপত্তা নেই এবং যারা যে কোন সময়েই যে কোন জমিদারের দ্বারা উচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাংলায় আধিয়ার বা বর্গাদার বলে পরিচিত খাজনা দাতা প্রজাদের চাষের অধিকাংশ খরচ বহন করেও গড়ে মূল উৎপাদনের ৫০ শতাংশ খাজনা দিতে হত। সাধারণ নিয়ম ছিল তারা জমিদারের খোলানে ধান জমা করে রাখত। ফসলের ভাগ খোলানেই করা হত। জমিদার ও বর্গাদারের মধ্যে আধাআধি খড়ের ভাগ হত। খাজনা দাতা প্রজাদের উড়িষ্যা ও আসামে বলা হত আধিয়ার, উত্তরপ্রদেশে শিকামি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বাতাইদার, মাদ্রাজে ভরামদারস এবং মালাবারে ভেরুমপত্তমদারস।

কোলব্রুক উল্লেখ করেছেন, "জমির ওপর একচেটিয়া অধিকার সম্পন্ন প্রজাবর্গের একটি গোষ্ঠী যারা বাঁধত খাজনা বা ফসলের অর্ধেক খাজনার শর্তে জমির বন্দোবস্ত দেয়।" বুকানন হ্যামিলটন লক্ষ্য করেছিলেন, উত্তর বাংলার গরীব চাষীদের মধ্যে দিনাজপুরের আধিয়ারদের সংখ্যা ছিল ১৫০,০০০ লক্ষ। এদের কয়েকজনের ছোট এক টুকরো জমি ছিল।

কয়েক বছর ধরে আধি বা বর্গা ব্যবস্থা বাঙলা দেশের জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেটেলমেণ্টের রিপোর্ট দেখে মনে হয়, চাষীরা জমি পাবার লোভে প্রলুব্ধ হয়ে পুনরুদ্ধার করা জমিতে বন্দোবস্ত নিয়েছিল। আর্থিক খাজনার চেয়ে ফসলের খাজনা অধিকতর লাভজনক প্রমাণিত হলে জমিদাররা বর্গা চাষের দিকে অগ্রসর হল। ১৮৭২এ হাণ্টার লিখেছেন ১৮৫৭র তুলনায় দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল এবং ১৮৩০এর থেকে প্রায় তিনগুণ হল।[৪] কৃষি ফসলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের বর্গা চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ার একটা ঝোঁক দেখা গেল। রাজস্ব ও খাজনার ক্রমবর্দ্ধমান পার্থক্য জমিদারদের পছন্দ বা নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছিল।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, দিনাজপুরে সাঁওতালদের দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করানো হল, এদের প্রথম কয়েক বছর খাজনার হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। আর "কৃষককে দখলীস্বত্ব দানের শর্ত বারো বছরের মেয়াদপূর্তি নিকটতর হওয়ায়" তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল।[৫] বর্গাদারদের অধিকাংশ ছিল সাঁওতাল, রাজবংশী, বাগ্দী, ডোম এবং হরিজন। ১৯৫১তে পশ্চিমবাংলায় বর্গাদারদের ৪০·৮ শতাংশ ছিল তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতি। যারা পতিত জমি ও জঙ্গল পুনরুদ্ধার করছিল আপাতদৃষ্টিতে তারা বর্গাদারে পর্যবসিত হল। বাঁকুড়ায় জঙ্গল কাটার ফলে চাষের এলাকা প্রসারিত হল। কিন্তু রায়তরা জমি হারাল এবং ফসলের খাজনা অথবা ফসল ও আর্থিক খাজনা দিয়ে সাঁজা প্রজাতে পরিণত হল।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়ার কালেকটর লিখেছেন: "রবার্টসন তাঁর রিপোর্টে দেখিয়েছেন সাঁজা অথবা ফসলের খাজনা জেলার উন্নতির ক্ষেত্রে কী সাংঘাতিক ক্ষতির ব্যাপার। এই প্রথা চাষীকে চিরবর্দ্ধমান ঋণের বোঝার নীচে রেখে দেয়···এই অশুভ ব্যাপারটি যে কি গুরুতর মাত্রাতে ইতিমধ্যেই পেঁছেছে তা বোঝা যায় এই তথ্যটির থেকে—রায়তী জমির এক চতুর্থাংশ হয় ফসলে খাজনায় অথবা ফসলে খাজনার সঙ্গে নগদে খাজনার ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এই দুরকম খাজনাই ক্রমশঃ নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।"[৬]

সরকারী রিপোর্ট থেকে এটা বোঝা যায় বর্গাব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে মালিক কৃষকের ঋণগ্রস্ততার সম্পর্ক ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিচ্যুত হওয়ার মাধ্যম ছিল ঋণ। কৃষক জমি হারালে জমিতে পুনর্বাসিত হত "এই শর্তে যে ফসলের অর্ধেক সে দেবে।" ১৯১৩তে ঢাকার কালেকটর

রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে "বর্গা বন্দোবস্তের জমি ও মালিকদের খাস জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ভূমিস্বত্বের অধিকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ, প্রধানত রায়তদের ঋণ···মুরাপাড়ার জমিদারদের নেতৃত্বে ভূস্বামীদের অনেকেই ৩৭'৫ শতাংশ হার সুদের শর্তে টাকা ধার দিত এবং ধীরে ধীরে জমি দখল করত, সেই জমি নিজেদের অধিকারে রাখত অথবা বর্গাচাষের বন্দোবস্তে দিত।" ১৯১৭তে মেদিনীপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসার বর্গাচাষের প্রসারের সম্বন্ধে লিখেছেন : "ভাগে খাজনা লোপ পেয়ে টাকায় খাজনার প্রচলন বাড়া তো দূরের কথা, ভাগে খাজনা বেড়েই চলেছে! যখন বকেয়া খাজনার দায়ে টাকায় খাজনা দাতা প্রজার জমি বিক্রী হয়ে যায়, তখন ক্রেতার পক্ষে এটাই খুব সাধারণ রীতি যে সে ঐ জমিচ্যুতকেই ভাগে খাজনার ভিত্তিতে আবার জমিতে বসায়···ফসলে খাজনায় ফিরে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াটি এটাই দেখায় যে জমির জন্য প্রতিযোগিতা ক্রমশই কঠোর হচ্ছে—কারণ বাধ্য না হলে অনুরূপ জমির জন্য টাকায় খাজনার দুই বা তিনগুণ হারে এই জাতীয় খাজনায় প্রজা হতে কেউই রাজি হত না।"[৮]

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে বাঙালী ব্যবসায়ীরা "টাকায় এবং ধিনিময় প্রথায় ধার দিত, ধীরে ধীরে প্রজার স্বত্ব কিনে নিয়ে তাদের আধিয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে দিত।"[৯] বেল আমাদের জানিয়েছেন যে কিভাবে বাংলায় চিরাচরিত মহাজন সাহারা 'খাই খালাসীর' মাধ্যমে জমির ওপর জমি দখল করত যে জমিতে বন্ধক-গ্রহীতা বন্ধক দাতাকে বর্গাদার হিসেবে বন্দোবস্ত দিত।[১০] এ থেকে মনে হয় যে বিশ্বব্যাপী মন্দার নিরানন্দময় বছরগুলিতে খাই খালাসী ব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েসন এই ঘটনাটি লক্ষ্য করেছে—'অর্থনৈতিক মন্দার সময় রায়তরা ব্যক্তিগতভাবে বিক্রী করে জমি হারানোর পরিবর্তে বকেয়া খাজনার দায়ে বেশী জমি হারিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্গাদার হিসেবে জমি চাষ করার অনুমতি পেয়েছে।'[১১]

১৯২৮-৪০ পর্যন্ত সময়ের দিকে তাকালে বর্গা ব্যবস্থার মাত্রা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। জমি পুনরুদ্ধার সত্ত্বেও কর্ষিত জমির বিস্তৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির থেকে পিছিয়ে ছিল। জমি ও মানুষের অনুপাত এবং শিল্পায়ণের মন্থর গতি বাঙলার সমস্ত জেলাগুলিতে বর্গা বন্দোবস্তের বাস্তব ভিত্তি তৈরী করেছিল। ভূমিচ্যুত কৃষকরা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া কারিগররা বর্গাদার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯২৮-৪০ এর পর্বটির মধ্যেই মন্দার বছরগুলি পড়েছিল।

ভেরা অ্যানস্টে বলেছেন যে মন্দার পরের বছরগুলিতে চাষীদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৮-৩৯ পর্যন্ত কৃষিপণ্যের দর বাড়েনি। বন্ধক ও বিক্রীর তালিকা দেখে বোঝা যায় যে মন্দার বছরগুলিতে জমি বিক্রীর চেয়ে জমি বন্ধক দেওয়ার সংখ্যাই বেশী ছিল।[১২] বন্ধকী ব্যবস্থায় মালিক কৃষক বর্গাদার হিসেবে তার জমি চাষ করার অনুমতি পেত। মন্দার বছরগুলিতে বর্গাদারদের সংখ্যা কেন বৃদ্ধি পেয়েছিল তার ব্যাখ্যা ঐখান থেকেই পাওয়া যায়। ১৯৩৮ থেকে দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রীর সংখ্যাও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বাড়তে লাগল। আপাতভাবে জমিদার ও মহাজনরা মালিক কৃষকদের জমিচ্যুত করেছিল, যে মালিক-কৃষকরা মজুরের বাহিনী স্ফীত করছিল। এ সময়ে ছোট কৃষকরা কি রকম দুর্বল হয়ে পড়েছিল তা বিক্রী ও বন্ধকের একত্রিত মোট হিসাব দেখে বোঝা যায়।

১ নং সারণী

বাঙলায় জমি হস্তান্তর (১৯৩০-৪২)

বছর	বিক্রীর সংখ্যা	বন্ধকের সংখ্যা
১৯৩০	১২৯,১৮৪	৫১০,৯৭৪
১৯৩১	১০৫,৭০১	৩৭৬,৪২২
১৯৩২	১১৪,৬১৯	৩৬৮,৯৪৫
১৯৩৩	১২০,৪৯২	৩১৩,৪৩১
১৯৩৪	১৪৭,৬১৯	৩৪৯,৪০০
১৯৩৫	১৬০,৩৪১	৩৫৭,২৯৭
১৯৩৬	১৭২,৯৫৬	৩৫২,৪৬৯
১৯৩৭	১৬৪,৮১৯	৩০২,৫২৯
১৯৩৮	২৪২,৫৮৩	১৬৪,৮৯৫
১৯৩৯	৫০০,২২৪	১৫৪,৭৮০
১৯৪০	৫০২,৩৫৭	১৬০,১৫২
১৯৪১	৬৩৪,১১৩	১৫১,৫৫৩
১৯৪২	৭৪৯,৪৯৫	১০৬,০৮৮

উৎস ঃ—চৌধুরী পূর্বোল্লিখিত।

ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট দেখে মনে হয়, ২১ শতাংশ জমি বর্গাদাররা চাষ করত। সম্ভবত সংখ্যাটি কম করে দেখানো হয়েছে।

বর্গা চাষের এলাকা ঘোষণার ক্ষেত্রে জোতদাররা বেশ সতর্ক ছিল। প্রায়শই বর্গাদারদের প্রজা হিসেবে নথিভুক্ত করা হত না। ১৯২৮-৪০ এর মধ্যে কিভাবে রায়তী জমি হস্তান্তরিত করা হয়েছিল ভূমিরাজস্ব কমিশন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন। অনুসন্ধানকৃত জমির মোট পরিমাণ ছিল ৮,৫৪৭,০০৪ একর। এর মধ্যে ৫৫২,৩৩৫ একর জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল। এর অধিকাংশ (৩১·৭ শতাংশ) বর্গা চাষের জমিতে পরিণত হয়েছিল। ৩৮ শতাংশ জমি ক্রেতা পরিবারসমূহের দ্বারা কর্ষিত হত। মাত্র ৫·৭ শতাংশ জমি কৃষি মজুররা চাষ করত। মনে হয়, যতদিন পর্যন্ত বর্গাদাররা চাষের খরচ বহন করত এবং মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশ খাজনা হিসেবে জমা দিত ততদিন পর্যন্ত বর্গা চাষ ছিল তাদের কাছে আদর্শ ব্যবস্থা। জমিদারদের আচার ব্যবহারের ধরণ এই মন্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে—"আমি প্রচুর জমি পেয়েছি এবং নিজে কিছু জমি চাষ করি। যাই হোক, আমি দেখছি যে নিজের গবাদি পশু ও ভাড়া করা মজুর দিয়ে নিজের জমি চাষ করার চাইতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভাগ পাওয়ার শর্তে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া বেশী লাভজনক।"[১৪]

১৯৩৪ এর দুর্ভিক্ষের সময় ব্যাপক হারে জমির হস্তান্তর ঘটেছিল এবং মালিক-কৃষক বর্গাদারে পরিণত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ ছিল "মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ।" তখন ব্যবসায়ী ও জোতদাররা প্রচুর লাভ করেছিল। জোতদাররাই ছিল যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির সুবিধাভোগী ব্যক্তি যারা বিপুল পরিমাণ শস্য মজুদ করে রাখত এবং এই শস্য চড়া দামে বিক্রী করতে পারত। চালের দাম ১৯৪২এ মন প্রতি ৬্ টাকা থেকে ১৯৪৩এর অকটোবরে কয়েকটি জেলায় দাম বেড়ে হয়েছিল ৫০্ টাকা। এর প্রথম শিকার হয়েছিল ৫ একরেরও কম জমির মালিক কৃষক। দুর্ভিক্ষের প্রভাব ক্রমশ সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় প্রায় ১০ কোটি টাকা দামের জমি বিক্রী হয়ে গেল, ৫ শতাংশ কৃষক সমস্ত জমি বিক্রী করে দিয়েছিল এবং ১১ শতাংশ বিক্রী করেছিল আংশিক ভাবে।[১৫] ৪২০,০০০ একর ধানের জমি অকৃষিজীবীদের হাতে চলে গিয়েছিল। এদের হাতে ব্যবসা, ফাটকা কারবার এবং যুদ্ধের ঠিকাদারীর থেকে পাওয়া মুনাফার দৌলতে বাড়তি টাকা ছিল। এ বিষয়ে খুব কমই সন্দেহ আছে যে অকৃষিজীবীরা যথা জোতদার, শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সমৃদ্ধিবান কৃষক অধিকাংশ জমিই বর্গা চাষে বন্দোবস্ত দিয়েছিল।[১৬] ঈশাক রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪৬এ ২৫ শতাংশ জমি

বর্গা ব্যবস্থার আওতায় ছিল।[১৭] নিশ্চিতভাবেই ১৯৪০ থেকে বর্গা চাষের আওতাধীন এলাকা প্রসার লাভ করেছিল। এটা লক্ষ্য করার বিষয়, যেমন ডাঃ ঘোষ বলেছেন যে "বাঙলায় ভাড়া করা মজুর দিয়ে জমি চাষ করার চেয়ে বেশী জমিতে ভাগ চাষ হত।"[১৮] এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য বেশীদূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যে জোতদার প্রায়ই ব্যবসায়ী ও মহাজন হত, তার পক্ষে বর্গা ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রতিটি যুক্তি ছিল এবং যে ক্ষেতমজুরদের অবস্থা বর্গাদারদের চেয়েও খারাপ ছিল। জমিচ্যুত প্রজারা সেই ক্ষেতমজুর হওয়ার আতংকে আতঙ্কিত হত। কালক্রমে গ্রামে রুজি রোজগারের উপায়গুলি হ্রাস পেল এবং তা আরও অনিশ্চিত হল।

বাংলার অধিকাংশ জেলাগুলিতে বর্গা ব্যবস্থা ব্যাপক ছিল। এর ওপরেই এই বিষয়ে আমরা মনোযোগ নিবদ্ধ করেছি। ফসলে খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা একই কারণসমূহের ফলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল। অকৃষিজীবীদের হাতে জমি চলে গিয়েছিল। এরা দেখল টাকায় খাজনার চেয়ে ফসলে খাজনা বেশী লাভজনক এবং মালিক কৃষকরা প্রধানত ঋণের জন্যই জমি হারাচ্ছিল। ১৮২০তে উত্তর প্রদেশের জমিদার ও তালুকদাররা শিকামি প্রজাদের তাদের শিরজমিতে নিয়োগ করেছিল; পূর্ব উত্তরপ্রদেশে জমিদার প্রায়ই লাঙল গবাদি পশু এবং বীজ সরবরাহ করত। শিকামি প্রজাদের কোন দখলীস্বত্ব ছিল না এবং প্রায়ই তারা জমিদারদের গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ করত।[১৯] বাতাইদার নামক প্রজাদের আরও একটি গোষ্ঠী ছিল, এরাও ফসলে খাজনা দিত এবং তাদের প্রজাস্বত্বের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। উনিশ শতকের প্রথম দিকে লেখা দেওয়ান পসন্দ এর লেখক বাতাই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।[২০] ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মোরাদাবাদে বাতাই ছিল খাজনা দেওয়ার সাধারণ রূপ। মীরাটে বাতাই অথবা ভাওলী ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করা হত।[২১] মনে হয়, প্রজারা আর্থিক খাজনার চেয়ে বাতাই বেশী পছন্দ করত। ১৮৩২এ বার্ড বাতাইকে প্রজার পক্ষে অলাভজনক বলে মনে করলেন; এই ব্যবস্থা কোনভাবেই তাকে জমিদারের কবল থেকে রক্ষা করতে পারত না; "শস্য ঝরে না পড়া পর্যন্ত ফসল কাটার অনুমতি না দেওয়ায় অথবা ভাগ করতে দেরী করিয়ে দেওয়া জাতীয় পদ্ধতি"র[২২] সাহায্যে জমিদার প্রজাকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত। টাকায় খাজনার ক্ষেত্রে পাট্টার ওপরে যে চড়া হার ধার্য করা হতে পারে তার ভয়ে প্রজারা

বাতাই পছন্দ করত।

উনিশ শতকের শেষ দিকে জমি হস্তান্তরের কাজটি নিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলল, ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত গড় বিক্রীর সংখ্যা ছিল ৩২,৩৬১ এবং ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৩ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে বিক্রীর সংখ্যা ছিল ৩৫,৯২৮।[২৩] আগ্রা জেলার জমির ব্যবস্থার সারণীতে দেখা যায়, ২২'৪ শতাংশ জমি স্বত্বহীন প্রজার দ্বারা কর্ষিত হত এবং এদের গড় মালিকানা ছিল ৬ একর। শিকামি ও বাতাইদাররাও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২নং সারণী

আগ্রায় জমির ব্যবস্থা

কৃষকের শ্রেণী	মোট কর্ষিত জমির শতকরা ভাগ	শির জমির পরিমাণ (একরের হিসেব)	জোতের পরিমাণ (একর)
মালিক	২৩'৫	৯'৭	১১'৭
দখলীস্বত্বের প্রজা	৫২'১	০	৮'১
সুবিধাভোগী প্রজা	২'০	০	২'০
স্বত্বহীন প্রজা	২২'৪	০	৬'০

উৎস : আগ্রা সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট, ১৮৮০ হুইটকম্ব

দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিকামি প্রজা ও বাতাইদারদের দেয় ফসলে খাজনার হিসেবে মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল এবং মনে হয় দখলীস্বত্বের প্রজারা অনেক ভালো অবস্থায় ছিল। ১৯২১এ মাহারাণপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসার রিপোর্ট করেন যে "কৃষক মালিকদের চেয়ে দখলীস্বত্বের প্রজারা বেশী সমৃদ্ধিবান বলে মনে হয়" এবং গড়ে তাদের বড়ো জোত ছিল।[২৪] জমিদারদের চালু কৌশল ছিল প্রজাদের কাছ থেকে নজরানা পাওয়ার জন্য জমির প্রজাদের উচ্ছেদ করা এবং দীর্ঘদিনের দখলের ভিত্তিতে পুরানো প্রজার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে কঠিন করে দেওয়া।[২৫] জমিদারী উচ্ছেদ কমিটির মতানুযায়ী জমির প্রজাদের দ্বারা অধিকৃত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৭ লক্ষ একর এবং দখলী স্বত্ববিহীন প্রজাদের সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ। বাতাইদাররাও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৬]

মাদ্রাজের রায়তওয়ারি এলাকাগুলিতে জমির একটি বড়ো অংশ ভারাম, যে জমি ভাগচাষের ভিত্তিতে কর্ষিত হত। প্রজারা খাজনা হিসাবে ফসলের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ অথবা ৮০ শতাংশও দিত এবং এর

ফলে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হত। ১৯৩০ এ মাদ্রাজ ব্যাংক অনুসন্ধান কমিটি খাজনা দাতা প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন : 'টাকায় খাজনা দেওয়ার ভিত্তিতে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার ঘটনা বিরল। সাধারণতঃ ফসল ভাগের ভিত্তিতেই তা করা হত, এতে জমিদার উৎপন্ন ফসলের ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ এমন কি ৮০ শতাংশ পর্যন্ত পেত, প্রজারা পেত বাকী অংশ। এই জাতীয় শর্তের ভিত্তিতে জমিদারের কাছে ঋণ করে ও তারই সরবরাহ করা বীজ, গবাদি পশু ও সরঞ্জামের [চাষের] সাহায্যে প্রজারা সাধারণত বছরের পর বছর একটা অনিশ্চিত জীবন নির্বাহ করত·· প্রজা তার নিজের পশু এবং হাতিয়ার দিয়ে চাষ করতে পারত···এবং জমিদার যেখানে অনুপস্থিত সেটা এটা সব সময়ে পরিষ্কার ছিল না যে প্রকৃত চাষী একজন কৃষিমজুর অথবা অধীন প্রজা।'[২৭]

খাজনা দাতা প্রজারা কেন্দ্রীভূত ছিল তাঞ্জোর রামনাদ, মাদুরা, তিন্নেভেল্লী এবং চেঙ্গীলপেট জেলায়' ; ১৯৪৬-৪৭ এ কৃষিজীবী জনগণের ১৪ শতাংশ ছিল প্রজা। ১৫ শতাংশ ছিল ছোট জমির মালিক যারা খাজনা প্রাপকের জমিচাষ করত, অধীন প্রজার সংখ্যা ১·৫ মিলিয়ন হিসাব করা হয়।[২৮]

পাঞ্জাবে খাজনা দাতা প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল দখলী স্বত্বহীন প্রজা এবং বাতাইদার। শিখ রাজতন্ত্রের পতনের পর কৃষক মালিকরা কিভাবে দখলচ্যুত হয়েছিল সে বিষয়ে ডার্লিং তার বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন। শিখ শাসনে বন্ধক ছিল বিরল ব্যাপার। ১৮৭৮ এর মধ্যে ৭ শতাংশ বন্ধক দেওয়া হয়েছিল।[২৯] গুজরাণওয়ালা জেলা গেজেটিয়ার এর লেখক লিখেছেনঃ "বহিরাগত, পুঁজিপতি এবং মহাজনদের কাছে একবার দরজা খুলে যাওয়ার পর কৃষক সমাজের সমরূপ চরিত্রটি অদৃশ্য হল ; পরস্পর বিরোধী স্বার্থগুলির মধ্যে সংঘাত শুরু হল।[৩০] জমির দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে জমি হস্তান্তরের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেল। কৃষকদের দখলচ্যুত "একটি রাজনৈতিক বিপদ" হিসেবে দেখা দিল। ১৯০০এ ভূমি হস্তান্তর আইন পাশ হল। এই আইন বাইরের লোকদের কাছে কৃষিজমি বিক্রী এবং কৃষিজীবী উপজাতি কর্তৃক জমি বিক্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। সরকার অবশ্য জানতেন যে বিক্রীর তুলনায় বন্ধকের পরিমাণ বাড়বে। রিভাজ বলেছেন, এই পরিকল্পনা ছিল "জমির স্থায়ী হস্তান্তরের তুলনায় সাময়িক হস্তান্তরকে উৎসাহিত করা।"[৩১] প্রকৃতপক্ষে বন্ধক বাড়ছিল এবং কৃষকরা সাধারণতঃ জমিতে স্বত্বহীন প্রজা হিসেবে পুনর্বাসিত হচ্ছিল।

দেশ বিভাগের আগে ৩১˙১৭ মিলিয়ন একর কর্ষিত জমির মধ্যে ১৫˙২৬ মিলিয়ন একর জমি এমন প্রজাদের অধিকারে ছিল যাদের কোন দখল স্বত্ব ছিল না।[৩২]

বোম্বাইতে প্রজারা প্রধানত বার্ষিক চুক্তির (লীজ) শর্তে জোতদারের জমি চাষ করত। চাষের খরচ তারা বহন করত এবং ফসলে খাজনা দিত। নিম্নলিখিত অংশটিতে ফসলে খাজনা দেওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে ঃ

"প্রধানত বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে জমি চাষ করে এমন একজন প্রজা কতদিন তার দখলে জমি থাকবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে না। কারণ প্রজাকে তিনমাসের আগাম নোটিশ দিয়ে বছরের শেষে জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা ভূস্বামীর আছে সুতরাং প্রজাদের জমিতে কোন স্থায়ী স্বার্থ নেই। অনেক ক্ষেত্রে সেই রকম ভাগ চাষী প্রজাকে চুক্তির ভিত্তিতে (লীজ) জমি দেওয়া হয় যারা উন্নত মানের বীজ বপন করে অথবা ভাল সার দেয় বা জমিকে উর্বরা করার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করে, এই ভাবে তার খরচে উৎপন্ন বর্দ্ধিত ফসলের অর্ধেক ভূস্বামীর কাছে চলে যায়, প্রজা তার শ্রম ও উদ্যোগের যথাযথ প্রতিদান পায়না। একমাত্র বার্ষিক খাজনার জন্য অনুপস্থিত ভূস্বামীর আগমন ঘটে এবং চাষের পদ্ধতির উন্নতির ব্যাপারে সে কোন আগ্রহ দেখায় না।[৩৩]

বিহারে খাজনা দাতাপ্রজারা প্রধানত জমিদারের খাস বাকাসত জমিতে নিযুক্ত হত।[১] বাতাইদাররা এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৯ খৃীষ্টাব্দে পালামৌর সেটেলমেণ্ট অফিসার রিপোর্ট করেন যে যে "জোতদারের গ্রামগুলিতে এ পর্যন্ত টাকায় খাজনা দেওয়া হয়েছে, সে যখন প্রজাদের হয়রানি বা উৎখাত করতে চায় একমাত্র তখন সে বাট্টা ব্যবস্থা চালু করে এবং তার উদ্দেশ্য শীঘ্রই কার্যকরী হয়।"[৩৪]

উচ্চবর্ণের পুরোহিত, শিক্ষক, ডাক্তার এবং আইন ব্যবসায়ীদের জমিকে বাতাই চাষের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার একটা ঝোঁক ছিল। যেহেতু বাতাইদারদের ভোগস্বত্বের কোন নিরাপত্তা ছিল না তারা সর্বদাই জোতদারের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে যেতে পারত। এটিকে জোতদারের বাতাই ব্যবস্থার প্রতি অনুরক্তির কারণগুলির অন্যতম একটি বলে মনে হয়।

ঊনিশ শতকের শেষ দিকে বিহারে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল। ১৮৮৫-৯৫ এর দশকে মারান, চম্পারণ, দ্বারভাঙ্গায় মালিক কৃষকের উল্লেখযোগ্য দখলচ্যুতি হয়েছিল। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে বিহারে (ছোটনাগপুর বিভাগ ও সাঁওতাল পরগণা বাদ)

হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ ১'৪ লক্ষ থেকে ১'৬ লক্ষ একরে ওঠানামা করছিল। জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বর্তমান শতকেও কার্যকরী ছিল। পরবর্তী সারণী থেকে বোঝা যাবে যে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জমি হস্তান্তরের কাজ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলছিল।[৩৫] এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে সমস্ত কৃষক জমি হারিয়েছিল তারা হয় মজুরে পরিণত হয়েছিল কিংবা বাতাইদার হিসেবে জমিতে পুনর্বাসিত হয়েছিল। চম্পারণের কালেকটর ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জমি বন্ধক বিষয়ে লিখেছেন ঃ ঋণগ্রহীতা বা খাতকরা হয় নিজে জমি চাষ করতে পারে অথবা এটা বেশী স্বাভাবিক যে পুরানো রায়তকে বিপুল পরিমাণ ফসলে খাজনায় বন্দোবস্ত দিতে পারে।[৩৬]

৩নং সারণী

বিহারে জমি হস্তান্তর (১৯৩৫-৪০)

বছর	হস্তান্তরিত জমি (একর)
১৯৩৫	১,৫৩,৯০৫
১৯৩৬	১,৭৪,১৩২
১৯৩৭	১,৯৩,৮২৫
১৯৩৮	১,৮৯,৭৯৫
১৯৩৯	১,৯৩,৩৬০
১৯৪০	২,৬৬,২৮৭

উৎস ঃ রিপোর্ট'স অন অ্যাডমিনিস্ট্রেসন অব রেজিস্ট্রেসন ডিপার্টমেণ্ট, চৌধুরী, ঐ।

কৃষির উন্নতির পক্ষে প্রজাস্বত্বের ব্যবস্থা একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খাজনাদাতা প্রজাদের উৎসাহ খুব কমই ছিল, কারণ সে জানত, যে জমিদার প্রধানত চাষের খরচ বহন করেনা, সামান্য উৎপাদন বৃদ্ধিও তার কাছে পুঞ্জীভূত হবে। আধুনিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা তার পক্ষে খুবই কঠিন ছিল, উৎপাদনের বিরাট অংশ খাজনা হিসেবে তার কাছ থেকে নেওয়ার ফলে তাকে পড়ে থাকতে হত শুধুমাত্র জীবন ধারণের নিম্নতম প্রয়োজনীয় ফসল নিয়ে, বিনিয়োগ করার মতো প্রান্তিক ফসলও তার থাকত না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশন লক্ষ্য করেছিলেন যে স্বত্বহীন প্রজার 'মিতব্যয়িতা অথবা উন্নতির কোন উৎসাহ ছিল না।' ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসার রিপোর্ট করেছিলেন,

"অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগচাষ হতাশাব্যঞ্জকভাবে খারাপ এবং সর্বদাই নিকৃষ্ট চাষের সঙ্গে যুক্ত।" ভোগস্বত্বের নিরাপত্তার অভাব নিশ্চিতভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করত না। বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশন (১৯৪০) উৎপাদনের স্বল্পতাকে লক্ষ্য করে সুপারিশ করেছিলেন যে বর্গাদারদের প্রজা হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে এক তৃতীয়াংশ জোতদারের প্রাপ্য হওয়া উচিত। প্রাসঙ্গিক অংশটি এই : সমস্ত দেশগুলিতে মোটের ওপর মত হল এই যে চাষের এই ব্যবস্থা আর্থিক দিক থেকে সুবিধাজনক নয়।...ফসলের উৎপাদনের যে কোন বৃদ্ধির মাত্র অর্ধেকের দাম কৃষক লাভ করে যা তার শ্রম ও দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ।·· আমাদের সুপারিশ হল···যে বর্গাদাররা লাঙল, গবাদি পশু এবং চাষের সরঞ্জাম ব্যবহার করে প্রজা হিসেবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা·· আমরা আরও সুপারিশ করি যে ফসলের যে ভাগ তাদের কাছ থেকে আইনত উদ্ধারযোগ্য তা অর্ধেকের পরিবর্তে এক তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত।...[৩৭]

কৃষি মজুর

ফসলে অথবা টাকায় প্রাপ্ত মজুরীর উপর যাদের বেঁচে থাকতে হত, সেই কৃষি মজুরের এবং খাজনা দাতা প্রজাদের উদ্ভব পাশাপাশি এগিয়ে চলছিল। এর মধ্য দিয়ে ছোট কৃষকদের দখলচ্যুত করার প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হচ্ছিল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে অধ্যাপক মরিস কৃষিগত সম্পর্কের পরিবর্তনগুলি অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে যেহেতু পুরোনো প্রজারাই জমি চাষ করছিল, তাই জমি হস্তান্তর বলতে মনে করা হত অকৃষিজীবীদের কাছে জমি হস্তান্তরিত হবার আইনগত অধিকার।[৩৮] যা ঘটছিল তা হল এই যে কৃষকরা যে জমি বন্ধক দিত, সেই জমিতেই তারা বর্গাদার বা অধীন কৃষক হিসেবে পুনর্বাসিত হত এবং আমরা পূর্বতন অধ্যায়ে দেখেছি যে এই ধরণের চাষীদের ভোগস্বত্বের কোন নিরাপত্তা ছিল না এবং তারা উৎপাদনের উপকরণগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত। হস্তান্তরের সময় অনেক জমি বিক্রী হয়ে যেত এবং এ ধরণের ক্ষেত্রগুলিতে দখলচ্যুত মালিক কৃষকরা কৃষি মজুর বাহিনীর কলেবর স্ফীত করল।

ঊনিশ শতকে কৃষি মজুররা গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি উদীয়মান শ্রেণী ছিল। গ্রামীণ জনসমাজ কেবলমাত্র, জোতদার, ব্যবসায়ী মহাজন

এবং কৃষকদের নিয়েই গঠিত ছিল না, অসংখ্য কারিগর নিয়েও গঠিত ছিল। পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে শিল্পের ধ্বংসের পর্ব শুরু হয়েছিল এবং ঢাকা, মুর্শিদাবাদ লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি পুরোনো শহর ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস হয়ে যাওয়া কারিগরদের কী হল? এটা খুবই সম্ভবপর যে তারা ভূমিহীন মজুরের দলে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিল। জনসংখ্যার চাপে কৃষি ভারাক্রান্ত হল এবং গ্রামীণ জনসংখ্যায় উদ্বৃত্ত অংশ দেখা গেল যে অংশ কারখানায় কয়লাখনিতে এবং চা বাগানগুলিতে জীবিকা অনুসন্ধানে রত হল। এ দেশে শ্রমিকের দুষ্প্রাপ্যতার অভিযোগ কদাচিৎ শোনা গিয়েছিল। উদ্বৃত্ত শ্রমিক প্রচুর থাকার ফলে মিল মালিকরা শ্রমিকদের কম মজুরী দিতে পারত।[৩৯] শিল্পবিকাশ ছিল শ্লথগতি এবং কৃষি মজুরকে জীবিকা অন্বেষণ করতে হত গ্রামে, সে ছিল গ্রামীণ মজুর।

১৮৪২ খৃীষ্টাব্দে মুনরো রিপোর্ট করেছিলেন যে ভারতে কোন ভূমিহীন মজুর ছিল না। নিঃসন্দেহে এটা ভুল চিত্র। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে কৃষি মজুররা ছিল একটি স্বীকৃতিযোগ্য সামাজিক শ্রেণী। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে উচ্চবর্ণের মানুষ লাঙল স্পর্শ করত না, তাই জাঠ, আহীর প্রভৃতি বর্গ মজুর হিসেবে কাজ করত, টাকায় ও ফসলে যাদের মজুর দেওয়া হত।[৪০] বুকানন-হ্যামিলটন গোরখপুরের কৃষি মজুরদের হুবহু বর্ণনা দিয়েছেন। একশ্রেণীর শ্রমিক ছিল যাদের জমি চাষ ও বীজবপনের সময় নিয়োগ করা হত এবং মাসে ২ টাকা ও কিছু পরিমাণ শস্য দেওয়া হত। আরেক শ্রেণীর ভাড়া করা মজুর ছিল যাদের নিজস্ব জমি ছিল এবং মালিকদের জমিতে আংশিক সময়ের মজুর হিসেবে কাজ করত; অবসর সময়ে দৈনিক ঠিকা মজুর হিসেবে কাজ করত; তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল ভূ-স্বামীদের মজুর যারা ছিল প্রভুর ভৃত্য।[৪১] বুকানন হ্যামিলটন লিখেছেন যে দিনাজপুর জেলায় বর্গাদারদের সংখ্যা ছিল প্রচুর কিন্তু মাসিক হিসেবে নিযুক্ত কৃষক বা ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা কোনভাবেই অধিক ছিল না।[৪২] স্পষ্টতই মালিকরা তাদের কৃষিকাজের জন্য কৃষকদের চেয়ে আধিয়ারদের উপরেই বেশী নির্ভর করত।

ঊনিশ শতকের শেষভাগে কৃষি মজুররা একটি উঠতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। ১৮৮৮তে ডাফরিন অনুসন্ধান কমিটি পাঞ্জাব, আগ্রা এবং অযোধ্যার শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে লেখে। ১৮৭৬এ বিহারের দ্বারভাঙ্গায় কৃষিজীবী জনসংখ্যার ২৫ শতাংশকে কৃষিশ্রমিক

বলে বর্ণনা করা যেত।[৪৩] গয়াতে ১০,০০০ মানুষের অবস্থার পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছিল যে ১৮৮৮তে ২৩ শতাংশ মানুষ ছিল কৃষি মজুর। দশ বছর পরে মুর গ্রামীণ জনসংখ্যার ৩৪ শতাংশ বলে তাদের হিসেবে দেখিয়েছিলেন।[৪৪] ১৮৭২এ হাণ্টার লিখেছিলেন যে ২৪ পরগণা ও সুন্দরবন জেলায় কৃষিমজুরদের সংখ্যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণা সদর ও বসিরহাট মহকুমায় কৃষি শ্রমিকরা ছিল প্রায় "কৃষকদের মতোই বহু সংখ্যক।"[৪৫] ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে কৃষিশ্রমিকরা ছিল কৃষিজীবীদের" ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। কিন্তু পূর্ব বাঙলার বরিশালে ও উত্তর বাঙলার জেলাগুলিতে তাদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম।[৪৬] ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যায় কৃষি-শ্রমিকরা একটি বড়ো দলে পরিণত হয়েছিল। তারা কৃষি জনসংখ্যার ১৭·৫ শতাংশে পরিণত হয়েছিল।[৪৭] অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ঊনিশ শতকের শেষের দশকগুলিতে খাজনাদাতা প্রজা এবং কৃষি মজুরদের যুগপৎ বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন:

"রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোতের হস্তান্তরের সংখ্যা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩ হাজার থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বেড়ে হয়েছে ২৫ লক্ষ।...এর অর্থ হল খুবই বাঞ্ছিত এক শ্রেণীর কৃষকের জমি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া।' এরা...ভূমিহীন সর্বহারার বাহিনীকে স্ফীত করেছিল। "এই শ্রমিকেরা অবশ্য বাঙলার কারখানা ও বাগিচাগুলিতে যায়নি—যেখানে প্রধানত উত্তরভারত থেকে আসা শ্রমিকেরা যোগ দিয়েছিল। এই শ্রমিকেরা [জমিচ্যুত কৃষকেরা] হয় অধীন রায়ত অথবা কৃষিতে ভাড়া করা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে।"[৪৮]

১৯২১ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে কৃষি মজুরদের সংখ্যা ৪৯ শতাংশ বেড়েছিল। এরা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষি মজুরদের মোট সংখ্যার ২৮·৭ শতাংশ স্থান দখল করেছিল।[৪৯] লক্ষ্য করা দরকার যে কৃষি মজুরদের মধ্যে খাজনা দাতা প্রজারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা প্রায়শই শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে ঠিকা মজুর হিসেবে কাজ করত। তা সত্ত্বেও অবিভক্ত বাঙলায় কৃষি শ্রমিকরা একটি বড়ো গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল।

ঊনিশ শতকে মাদ্রাজের কৃষকদের দখলচ্যুতি শুরু হয়েছিল এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তা ক্রমাগত বেড়ে চলছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মজুররা কৃষি জনসংখ্যার এক অর্ধাংশে পরিণত হয়েছিল। প্রধানত অধিকারচ্যুত মালিক-কৃষকদের মধ্য থেকেই শ্রমজীবী প্রজা ও মজুররা আসত।

৪নং সারণী

মাদ্রাজে প্রজা ও শ্রমিক
(কৃষি জনসংখ্যার প্রতি হাজার)

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
কর্মরত প্রজা	১৫১	২০৭	২২৫	১২০
কৃষি শ্রমিক	৩৪৫	৩৪০	৩১৭	৪২৯

উৎস : পি পি পিল্লাই, ইকনমিক কণ্ডিশনস্ ইন ইণ্ডিয়া, পৃ—১১৪, সেনসাস রিপোর্ট মাদ্রাজ, ১৯৩১।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনাতে মোট ৭'৫ মিলিয়ন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। এই সংখ্যা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ২১ মিলিয়ন এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৩ মিলিয়নে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভবানী সেন কৃষিমজুদের এই দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধিকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হওয়া কিন্তু মাঝে মাঝেই ক্ষণস্থায়ী উন্নতির দ্বারা চিহ্নিত অর্থনৈতিক মন্দার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।[৫০] ১৯২৯ এ বিশ্বব্যাপী বিরাট অর্থনৈতিক মন্দা অগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণ ঘটিয়েটিল। সেনসাস কমিশনার ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিমজুরদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন এবং এটা কিভাবে ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন :

'যদি আমরা ১৯২১ এর সঙ্গে তুলনীয় সর্বনিম্ন অনুপাতটিকেও ধরি তা হলেও আনুপাতিক পরিবর্তন কিছুটা লক্ষ্যণীয়। সম্ভবত এটাই ব্যাখ্যা যে প্রজা বা মালিকের মতো জমির প্রকৃত অধিকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি না ঘটলেও কৃষিজীবী জনসংখ্যার বড়ো রকমের বৃদ্ধি ঘটেছে, যদিও এটা খুবই সম্ভবপর যে অকৃষক মালিকদের হাতেই জমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।'[৫১]

১৯৩১ এ ডঃ প্যাটেল কৃষক সমাজের সামাজিক গঠন সম্পর্কে যে অনুসন্ধান করেছিলেন তার থেকে মনে হয়, কৃষি মজুররা ছিল কৃষি জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ এবং চুক্তিবন্ধ শ্রমিকরা ছিল ২'৭ শতাংশ। আপাতদৃষ্টিতে জোতদাররা চুক্তিবন্ধ মজুরদের চেয়ে কৃষি মজুরদের ওপর বেশী নির্ভর করত। কৃষিজীবী মজুরদের ৩৩ শতাংশ ছিল স্বল্প মালিকানার মজুর এবং স্বত্বহীন প্রজা ও বর্গাদাররা ছিল ২৪ শতাংশ।[৫২]

৫ নং সারণী

সামাজিক গঠন	দশলক্ষের হিসাব	শতাংশ
মোট কৃষিজীবী জনসংখ্যা	১১১	১০০
এদের মধ্যে —		
১। খাজনা গ্রহীতা	৪	৩'৬
২। ৫ একরের বেশী জমি চাষ করে	২৮	২৫'৩
এদের মধ্যে—		
(ক) মালিক-কৃষক	১৮	১৬'৩
(খ) প্রজা	১০	৯
৩। খুদে মালিকানার মজুর	৩৭	৩৩'৩
(ক) খুদে মালিক	১০	৯
(খ) স্বত্বহীন প্রজা ও বর্গাদার	২৭	২৪'৩
৪। ভূমিহীন কৃষি মজুর	৪২	৩৭'৮
(ক) খতবন্দী মজুর	৩	২'৭
(খ) কর্মহীন বা বেকার মজুর	৩৫	৩১'৫
(গ) সর্বক্ষণের কৃষি ক্ষেত মজুর	৪	৩'৬

উৎস ঃ এম জে, প্যাটেল এগ্রিকালচারাল লেবারার্স ইন মডার্ণ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান, পৃ—১৪৮।

১৯৩১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত সময়ে কৃষি মজুরদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল, ১৯৩১ এ এরা ছিল ৩১'১ শতাংশ এবং ১৯৫১ তে ২৬'৭ শতাংশ। কিভাবে কৃষি মজুরদের সংখ্যা কমে গেল তা স্পষ্ট নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, অঞ্চল বিশেষে কৃষি মজুরদের অনুপাতে পার্থক্য হত। পূর্বতন একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ১৯৩১ থেকেই বাঙলায় বর্গাদারদের সংখ্যা বাড়ছিল। কৃষি মজুরদের চেয়ে বর্গাদারদের ওপর নির্ভর করার একটা ঝোঁক জোতদারদের মধ্যে ছিল। তা সত্ত্বেও কৃষি মজুররা একটি বড়ো গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫১তে কৃষি পশ্চিম বাঙলায় মজুররা ছিল কৃষিজীবী জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। অন্ধ্রের উপকূলের জেলাসমূহ এবং পাঞ্জাবের খাল অঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল ভিন্নতর। সেখানকার ভূস্বামীরা বর্গাদার অপেক্ষা কৃষিমজুরদের ওপরেই বেশী নির্ভর করত।[৫৩] এটা সকলেরই জানা আছে যে দক্ষিণ

ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ ছিল কৃষি মজুর। বিহার ও উত্তর প্রদেশের মালিক কৃষকদের দখলচ্যুতির কথা বলা হয়েছে। ১৯৩৯ এ উত্তর বিহারের খীরহার গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে যে ভূমিহীন কৃষকরাই ছিল সংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম শ্রেণী। এরা ছিল গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ।[৫৪] কৃষক সভার হিসেব অনুযায়ী ১৯৪৬ এ উত্তর প্রদেশের কৃষি জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ কৃষি মজুরদের নিয়ে গঠিত ছিল।[৫৫] ভাড়া করা মজুরদের নিয়োগের স্থায়ী এবং বিশেষ সুবিধা আছে—ভূস্বামীরা এটি বোঝার ফলে কৃষি মজুর নিয়োগের সংখ্যা বেড়ে গেল।

সমগ্র ভারত জুড়েই কৃষি মজুরদের কম মজুরী দেওয়া হত। এই মজুরীর হার ছিল মেয়েদের ক্ষেত্রে দৈনিক ২ থেকে ৪ আনা, ছেলেদের ৩ থেকে ৬ আনা এবং শিশুদের ১½ থেকে ২ আনা। অনেক সময় আর্থিক মজুরীর পরিবর্তে উপকরণের মাধ্যমে মজুরী দেওয়া হত।[৫৬] প্রকৃতপক্ষে দেশের অধিকাংশ জায়গায় আর্থিক মজুরী দেওয়ার পাশাপাশি উপকরণে মজুরী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এটা জমির ওপর ক্রমবর্দ্ধমান চাপের প্রতিফলন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে চালের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষি মজুরদের প্রকৃত মজুরী পড়ে গিয়েছিল। বাঙলায় ১৮৫২ থেকে ১৯২২ এর মধ্যে চালের দাম আট গুণ বেড়ে গিয়েছিল যেখানে মজুরী বেড়েছিল মাত্র ৪ থেকে ৬ ভাগ।[৫৭] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মজুরী বেড়েছিল, কর্মসংস্থানের নোতুন পথ খুলে গিয়েছিল কিন্তু মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের কল্যাণে জিনিষপত্রের দাম তীব্র গতিতে বেড়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস ভূমি সংস্কার কমিটি লিখেছিলেনঃ 'যুদ্ধ কৃষিমজুরদের প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে কোন বাস্তব উন্নতি ঘটায়নি।[৫৮] কম মজুরী ছাড়াও তাদের তীব্র বেকারী অথবা সাময়িক নিয়োগের যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছিল এবং বেকারির সময় শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। এরা প্রধানত কৃষিকার্যে নিযুক্ত হত, যেমন লাঙল চষা, ফসলকাটা, বীজবপন করা, নিড়ানি দেওয়া, রোয়া ইত্যাদি। ধনতান্ত্রিক খামারের মজুরদের সঙ্গে এদের মূলগত পার্থক্য ছিল। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে তারা "নিকৃষ্ট ধরণের শোষণের" শিকারে পরিণত হয়েছিল যার ফলে কৃষকরা কৃষি মজুরদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদাকে দুর্ভাগ্য মনে করত।[৫৯]

কৃষি মজুরদের নিকৃষ্ট সামাজিক অবস্থান জাতিভেদ প্রথার স্বীকৃতি

পেয়েছিল, এর ফলে সমাজে উচ্চবর্ণের প্রাধান্য অটুট ছিল। ডঃ থর্নার লিখেছেন ঃ "কৃষকরা আসে কৃষিজীবীদের কিংবা কারিগরদের জাত থেকে মজুররা আসে হরিজন, তপশীলী উপজাতি, দরিদ্র অথবা অনুন্নত শ্রেণী থেকে। স্থানীয়ভাবে নীচু বলে গণ্য কয়েকরকম কাজ যেমন পূর্ব উত্তর প্রদেশে লাঙল চষা ইত্যাদি ছিল এই নীচু জাতের জন্য সংরক্ষিত।...নীচু জাতের লোকেরা মেহনত করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে এবং উঁচু জাতের লোকেরা অন্যের পরিশ্রমের ফসল ভোগ করার জন্য জন্মেছে—এই ধরণের বিশ্বাস অনেক পরিমাণে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উভয় শ্রেণীর লোকেরা গ্রহণ করেছে। মালিকানা ও কায়িক শ্রম, এই দুয়ের মধ্যেকার বিচ্ছেদ গ্রামীণ সমাজের জাতি কাঠামোর অনুমোদন লাভ করেছে এবং তাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে।"[৬০]

সামাজিক অনুমোদন নিয়ে তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিদের মধ্যে ভূমিদাসত্ব ও ঋণদাসত্ব বিকাশলাভ করেছিল ও বেড়ে চলছিল, অধ্যাপক মুখোপ্যাধ্যায় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে দুবলা ও হালি হল "শর্তাবদ্ধ দাস" যারা বংশানুক্রমিকভাবে "তাদের প্রভুদের গৃহভৃত্য হিসেবে" সেবা করেছে। মাদ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিমে ইজভ্া, চেরুমা, পুনেয়া এবং হোলিয়া—এরা সকলেই প্রকৃতপক্ষে দাস ছিল। পূর্ব উপকূলে জমির ওপর ব্রাহ্মণদের শক্তিশালী মালিকানা ছিল এবং কৃষি মজুরদের একটি বড়ো অংশ "ঋণের জন্য বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারের ওপর নির্ভরশীলতা'র গহ্বরে পড়ে গিয়েছিল। বিহারের কামিয়ারা ছিল "শর্তাবদ্ধ ভৃত্য" যারা তাদের ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ভূস্বামীর কাজ করতে বাধ্য ছিল। কেবলমাত্র চাষের মরসুম ছাড়া অন্য সময়ে তারা অন্য ভূস্বামীর কাজ করতে পারত।[৬১] ঋণদাসত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আমাদের যা বলেছেন, কংগ্রেস ভূমিসংস্কার কমিটির অনুসন্ধানকৃত তথ্য তা সমর্থন করে। সুরাটে হালি ব্যবস্থার জন্ম ঋণের মধ্যে। হালিরা বংশানুক্রমিকভাবে তার মালিক ধানিয়ামার কাছে দাসত্বে বাঁধা থাকত এবং তাদের পক্ষ থেকে মালিককে ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা ছিল বিরল। কালিকটে রাজা ও ভূস্বামীদের কয়েকজন "কিছু কিছু ভূমিদাসকে তাদের অধীন" হিসেবে পেয়েছে। কেরালাতে একজন জেনামি টাকা অথবা ধান পাওয়ার পরিবর্তে তাদের ভূমিদাস বা সার্ফদের কিছু ব্যক্তির কাছে 'লীজ' দিত। মিরাসদার অপশাসিত তাঞ্জোর জেলার

খামারের মজুররা ভূস্বামীর কাছ থেকে ঋণ নিত, তাদের দেওয়া বাস্তু জমিতে বাস করত এবং প্রভুর কৃষিকাজ ও গৃহ কাজের জন্য তাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হত ; বোম্বাইয়ের হালি এবং মাদ্রাজের পান্নিয়ালদের ভূস্বামীর অধীনে ক্রীতদাসতুল্য সার্ফ হিসেবে থাকতে হত ; এর আংশিক কারণ হল, আবাদী গ্রামে এই সব মানুষের জন্য কোন বাস্তু জমি ছিল না।[৬২]

কংগ্রেস ভূমিসংস্কার কমিটি কৃষি ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করেছেন। 'জমি কিছু ব্যক্তির হাতে আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং ছোট কৃষকরা ক্রমশঃ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। কৃষি, অন্তত বিত্তশালী এক অংশের কৃষকের কাছে আর জীবনযাত্রার উপায় বা জীবন নির্বাহের পদ্ধতি নয়, তা হল মুনাফার উৎস।[৬৩]

ধনী কৃষক

কৃষি যাদের কাছে "জীবনযাত্রার উপায় নয়, মুনাফার উৎস" এবার আমরা সেই সম্পন্ন কৃষকের দিকে তাকাই। এর সাক্ষ্য প্রমাণ অল্প। তথাপি এটা কৃষকদের মধ্যে নির্দিষ্ট বর্গ হিসেবে ধনী কৃষকের আবির্ভাবকে সূচিত করে। এই গোষ্ঠীর আবির্ভাব পুরোনো ও নোতুন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা। যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা হল নোতুন উৎপাদন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রায় অদৃশ্যভাবে আবির্ভূত হচ্ছিল।

কিভাবে আমরা ধনী কৃষককে চিনতে পারি এ প্রশ্নটি তোলা হবে। উত্তরটি সহজ। ধনী কৃষক ছিল একজন চাষী যে আংশিকভাবে জমি ভাড়া দিত বা মজুর নিয়োগ করত এবং মুখ্যত বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রী করতে আগ্রহী ছিল। সম্পদশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই কৃষক সমস্ত জমি একত্র করতে উৎসুক ছিল ; কারণ সেক্ষেত্রে সে তার চাষবাসের উন্নতি করতে এবং উৎপন্ন ফসলের বৃহত্তর অংশ বাজারে বিক্রী করতে পারত। তার কৃষি খামার প্রায় ক্ষেত্রেই বড়ো হত যা তার পরিবারের সদস্যদের দিয়ে চাষ করানো সম্ভব হত না ; এজন্য তাকে দিনমজুর নিয়োগ করতে হত। তার প্রতিবেশীরা গরীব ছিল এবং আরও গরীব হচ্ছিল বলে সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির উপায় হিসেবে তাকে মহাজনীর উপর নির্ভর করতে হত। উৎপাদনের কারিগরী দিকের উন্নতির জন্য কেন সে তার সঞ্চিত মূলধন ব্যবহার করত না, তা এর থেকেই খানিকটা বোঝা যায়। ধনী

কৃষকরা ছিল কৃষকদের সংখ্যালঘু অংশ কিন্তু বাণিজ্য ও বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এটাও একটি ঘটনা যে কিছু কৃষক শ্রেণী অন্যদের চেয়ে অধিকতর যোগ্য প্রমাণিত হয়েছিল। বাঙলার মাহিষ্য এবং পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের জাঠরা তাদের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত দক্ষতার দ্বারা কৃষি খামারকে যথেষ্ট উন্নত করেছিল।

বুকানান হ্যামিলটন লক্ষ্য করেছিলেন, দিনাজপুর জেলার কৃষক পরিবারগুলির বিভিন্ন পরিমাপের জমি ছিল। এই কৃষকদের বিভিন্ন আয়তনের জমি ছিল, এই কৃষকদের বিভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেমন—"প্রধান কৃষক" "বড় কৃষক" "সম্পন্ন কৃষক" "গরীব কৃষক" ইত্যাদি। তিনি বলেছেন যাদের "তিন চার অথবা পাঁচটি লাঙল ছিল তারা হল মাঝারি কৃষক ; এদের "লাঙল ধরার থেকে অব্যাহতি নেই।" বড়ো চাষীদের কতগুলি লাঙল ছিল তা আমরা জানিনা। যা হোক, বুকানন হ্যামিলটন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন ঃ "বড়ো চাষীরা গরীব চাষীদের ধান কর্জ দিত এবং চড়া হারে সুদ আদায় করত।" তিনি লিখেছেন ঃ

"এটা সত্য যে বড়ো চাষীরা তাদের ওপর নির্ভরশীল লোকদের ঋণ দিয়ে বিপুল মুনাফা আদায় করে, কিন্তু তবু তারা এই লোকদের কাছে অশেষ উপযোগী।"[৬৪]

বুকানন হ্যামিলটন লিখেছেন যে একজন কৃষক একটি লাঙল দিয়ে ৫ একর অথবা ১৫ বিঘা চাষ করতে পারত। আপাতভাবে যার যত বেশী লাঙল ছিল, সে ছিল তত শক্তিশালী। ১৮৫০ তে নদীয়া জেলার একটি গ্রামে ২৫ টি কৃষক পরিবারের লাঙল ছিল একটি, ৮ টি পরিবারের ২টি, দুজনের ছিল তিনটি, তিনজনের ছিল চারটি এবং একটি মাত্র পরিবারের ৫ টি লাঙল ছিল।[৬৫] স্পষ্টতই ছোট চাষীরা ছিল কৃষকদের সংখ্যাধিক অংশ। যশোরে ১৫৫ টি পরিবারে ১০ বিঘা বা তার বেশী জমির মালিকানা ছিল। ২৩২ টি পরিবারের ৩ বিঘার কম এবং ৩৬৫ টি পরিবারের ছিল ২ বিঘা মাত্র। ১০ বিঘা বা তার বেশী জমির মালিক অধীন প্রজা নিয়োগ করত।[৬৬] খুলনার একটি গ্রামে মাত্র ৭টি জোত ছিল ৪০ থেকে ৫০ বিঘার, ৪৩ টি ছিল ২০ থেকে ৩০ বিঘার, ৬৭০ টি ছিল ১০ বিঘা বা তার কম।[৬৭] রাজশাহীর একটি গ্রামে কৃষক পরিবারের ৬ শতাংশ ২০ বিঘার বেশী জমির মালিক

ছিল, ২৩ শতাংশ পরিবারের ১০ থেকে ২০ বিঘা, এবং প্রায় ৫৭ শতাংশের মাত্র ৫ বিঘা জমি ছিল।[৬৮]

৬ নং সারণীতে দেখা যায়, বাঙলার জেলাগুলিতে স্থায়ী লীজের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছিল। এই লীজগ্রহীতাদের মধ্যে ধনী কৃষকরা একটি বড়ো স্থান অধিকার করেছিল। জর্জ ক্যাম্পবেল এই ঘটনাটিকে "ভূসম্পত্তির বিভাজন" [বা পরিব্যাপ্তি] বলে স্বাগত জানিয়েছেন। এটা সম্ভবপর যে লীজ গ্রহীতারা প্রায়ই তাদের জমির একটা অংশ ভাগে বন্দোবস্ত দিত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই লীজ যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়ে চলছিল। পাবনায় ভূমি সংক্রান্ত গণ্ডগোলের পর জমিদাররা ভেবেছিল যে সমস্ত সম্পত্তিবান কৃষক এই বিক্ষোভগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল তাদের লীজ মঞ্জুর প্রদান করাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ।

একজন ধনী কৃষক ছিল যুগপৎ মহাজন ও ব্যবসায়ী; পাটের চাষ সে করত। আমরা দেখতে পাব যে বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। ধনী কৃষকরা গ্রামেই বাস করত বলে ঋণ করার জন্য তাদের কাছে যাওয়ার একটা ঝোঁক গ্রামের কৃষকদের ছিল। এটা ভাবা ভুল হবে যে শুধুমাত্র ভূস্বামী এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ে মহাজনদের শ্রেণী গঠিত ছিল; মহাজনরা প্রায়ই ছিল ধনী কৃষক। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের সেনসাস কমিশনার লিখেছেন যে ধার করার সবচেয়ে বড়ো উৎস ছিল "ধনী কৃষকের একটি নোতুন শ্রেণী।"[৬৯]

৬ নং সারণী

স্থায়ী লীজ

বছর	লীজের সংখ্যা	বছর	লীজের সংখ্যা
১৯৬৮-৬৯	৩৬,৮০০	১৮৭৯-৮০	১২৬,১৩৭
১৮৭৩-৭৪	৬৬,৩৯৮	১৮৮০-৮১	১০২,৫১২
১৮৭৪-৭৫	১০০,৩২৫	১৮৮১-৮২	৭৪,৬৩৯
১৮৭৫-৭৬	১০৯,৩৯৯	১৮৮২-৮৩	৭০,৭৬৪
১৮৭৬-৭৭	১০২,১৪৭	১৮৮৩-৮৪	৭৫,৫৫২
১৮৭৭-৭৮	১০৮,৬৭৮	১৮৮৪-৮৫	৮৫,৫১৯
১৮৭৮-৭৯	১১৯,০১৫	১৮৮৫-৮৬	৮৭,২৩৬

উৎস ঃ চৌধুরী, কৃষি সম্পর্ক, পৃ ৩৩৫।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যুক্ত প্রদেশে, বিশেষত ইক্ষুচাষের এলাকায় ধনী চাষীরা ছিল একটি উদীয়মান শ্রেণী। ১৮৬০ এর দশকের বছর গুলিতে অযোধ্যার কৃষকরা কেবলমাত্র গ্রামের ব্যাংকার ও বানিয়াদের কাছে ঋণী ছিলনা কৃষিজীবী শ্রেণীগুলির বিত্তবান সভ্যদের কাছেও তারা ঋণী ছিল। কৃষকরা গ্রামের মহাজনদের কাছে যেত 'তাকে প্রতারণা করার আশায় কিন্তু সে জানে যে তার ভূস্বামীকে সে প্রতারণা করতে পারবে না।[৭০] লক্ষ্ণৌর ডেপুটি কমিশনার ১৮৬৮-৬৯ এ রিপোর্ট করেছিলেন যে টাকা জমাতে সমর্থ হয়েছে এমন একজন সমৃদ্ধিবান কৃষক সঙ্গে সঙ্গে ঐ টাকা "সমগোষ্ঠীর গ্রামবাসীকে ধার দিয়ে" বাড়ানোর চেষ্টা করত।[৭১] একটি মহাজন পরিবার ৫ একর জমি চাষ করে তিনবার খারিপ শস্য, দুবার রবি শস্য উৎপন্ন করত ; এর থেকে তার আয় হত ৭৯ টাকা, যেখানে মহাজনী কারবার থেকে তার বার্ষিক আয় ছিল ৩০০ টাকা।[৭২] চড়া দাম থেকে ধনী কৃষকরাও লাভবান হত। "যে সম্পন্ন কৃষকের বিক্রী করার মতো শস্য আছে, চড়া দাম এনে দেয় তার সৌভাগ্য, যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধার করতে হয়, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"[৭৩] উনিশ শতকের শেষ ভাগে কৃষিপণ্যের মূল্যের উর্ধগতি ধনী কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সাহায্য করেছিল।

মহারাষ্ট্রের দিকে তাকালে' ধনী কৃষকদের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বলে মনে হয়। সত্যিই গ্রামীণ উচ্চবর্গ হিসেবে মারোয়াড়ী ও গুজরাটি মহাজনরা কুনবিদের স্থান নিচ্ছিল। ডঃ কুমারের এই বক্তব্য আমাদের মনে রাখা উচিত যে কুনবিদের একটি সংখ্যা লঘিষ্ঠ অংশ ধনবান হয়েছিল। রাজস্ব নীতি তাদের সহায়ক হয়েছিল ; মারাঠাদের ধার্য লেভীর তুলনায় জমির ট্যাক্স কম বলে মনে হয়েছিল। ১৮৬৭ খৃীষ্টাব্দে ধনী কুনবিদের ইন্দাপুর গ্রামে জমিতে জলসেচের জন্য কুয়ো খুঁড়তে দেখা গিয়েছিল। গ্রামের পরিবর্তে ব্যবসার কেন্দ্রগুলিতে যাতে তারা ফসল বিক্রী করতে পারে সেজন্য যানবাহনের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে সাঁতারা জেলায় গাড়ির সংখ্যা ৫,৫৫২ থেকে ১৭,৪৪০ বৃদ্ধি পেয়েছিল। রেলস্টেশনে ফসল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুনবিরা গাড়ি ব্যবহার করত। শোলাপুর জেলার তিনটি গ্রামে ১৮৯০ এর দশকে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কৃষিকাজের জন্য বাগিচাভূমির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ধনী কুনবিরা বাণিজ্যিক কৃষি এবং গ্রামীণ সমবায়ের মতো ঋণদানের সংস্থাগুলির কাছ থেকে কিভাবে উপকৃত হচ্ছিল, তা আমরা

পরে দেখব।[৭৪]

ঊনিশ শতকের শেষ দিকে বিহারে সম্পন্ন রায়তরা জমির ক্রেতা হিসেবে একটি নোতুন গোষ্ঠী হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৯ পর্যন্ত সময়ে মজঃফরপুর জেলায় বিক্রীর মাধ্যমে ৪১৭ টি হস্তান্তর হয়েছিল। ক্রেতাদের মধ্যে ২১.২ শতাংশ রায়ত, ৮.৪ শতাংশ মহাজন এবং ১.২ শতাংশ ছিল আইন ব্যবসায়ী।[৭৫] ধনী কৃষকরা মহাজনী কারবার করত, এরা ইক্ষু চাষের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। ভূসম্পত্তি ছিল সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন গোয়ালা রায়ত উচ্চতর দামে জমি কিনত যেহেতু সে নিজেকে "গ্রামের মালিকদের সমমর্যাদা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে, যে মালিক ঘটনাচক্রে ছিল ব্রাহ্মণ।[৭৬] লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, জমি ক্রেতাদের মধ্যে রায়তরা ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। বাঙলায়ও এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট ছিল। পরিষ্কার ভাবেই বলা যায়, এই রায়তদের নির্ভর করার মতো সঞ্চয় ছিল।

যা আমরা সুদৃঢ়ভাবে বলতে চেষ্টা করেছি, তা হলো, অল্প কিছু সংখ্যক ধনী কৃষক এবং বহু সংখ্যক গরীব কৃষক—কৃষি সমাজ পরিষ্কার-ভাবে এভাবে বিভক্ত ছিল। কুয়ো গাড়ি এবং বাগিচার জমিতে ধনী কৃষকরা মূলধনী ব্যয় করত। আরও ভাল দাম পাওয়ার জন্য তারা গ্রামীণ মানুষের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ ছোট চাষীদের কাছ থেকে জমি কিনত। কিন্তু ধনী কৃষকদের সমৃদ্ধিকে বাড়িয়ে দেখা উচিত নয়। উৎপাদন নির্ভর করত প্রকৃতির খেয়ালের ওপর। বাণিজ্যিক ফসলের জন্য তারা খুব কমই লাভজনক দাম পেত এবং ধারের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হতে হত।

৭ নং সারণী

বিভিন্ন আয়তনের জোতের মালিক পরিবারের শতাংশ

প্রদেশ সমূহ	জোত পিছু একর			
	২ এর নীচে	২-৫	৫-১০	১০ এর বেশী
বোম্বাইঃ গুজরাট	২৭.৫	২৫.৭	২২.৩	২৪.৫
আসাম	৩৮.৯	২৭.৪	২১.১	১২.৬
দাক্ষিণাত্য	১৯.৮	১৬.৭	১৮.৮	৪৪.৭
পশ্চিম বাঙলা	৩৪.৭	২৮.৭	২০.০	১৬.৬
মধ্যপ্রদেশ (সি পি)	৪৯.০	—	২১.১০	৩০.০
উড়িষ্যা	৫০.০	২৭.০	১৩.০	১০.০

মাদ্রাজ	৫১'০	৩১'০	৭'০	১১'০
উত্তর প্রদেশ (ইউ পি)	৫৫'৮	২৫'৪	১২'৮	৬'০
পাঞ্জাব	৩৭'৯	১৭'৯	২০'৫	২৩'৭

উৎস ঃ কংগ্রেস ভূমি সংস্কার কমিটির রিপোর্ট ১৯৪৯, পৃ—১৪

এসব আমরা গ্রামীণ পরিবারের বিভিন্ন আয়তনের জোতের দিকে তাকাই। ৭ নং সারণীতে দেখা যায়, কৃষকদের মধ্যেকার বৈষম্য বা পার্থক্য ভূমি ব্যবস্থার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃষি সমাজের বড়ো অংশ ছিল গরীব কৃষক ও থেকে ১০ একর জমির মালিকানা সম্পন্ন গ্রামীণ পরিবার। কয়েকটি রাজ্যে, বিশেষত, গুজরাট, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম বাঙলা এবং পাঞ্জাবে বেশ বড়ো গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল ২ থেকে ৫ একর জমির মালিক মধ্য চাষীর পরিবার আসাম, গুজরাট, পশ্চিমবাঙলা, উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশে একটি বড়ো দলে পরিণত হয়েছিল।

উৎপাদনের প্রবণতা

এবার আমরা সংক্ষেপে কৃষিজ উৎপাদনের ঝোঁকের বিষয় উল্লেখ করব। 'অকৃষিকরণের' পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। ক্ষুদ্র জোতের অধিকারী গরীব চাষীর উদ্ভব হয়েছিল, এমন প্রজা ছিল যারা ফসলে খাজনা দিত এবং প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা ছিল না। ধনী কৃষকদের একটি শ্রেণী ছিল যারা ছিল গ্রামীণ পরিবারগুলির সংখ্যালঘু অংশ। আমরা জানতে চাই ধনী কৃষকের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ উৎপাদন বেড়েছিল কিনা। ধনী কৃষকরা কৃষিতে উন্নত কারিগরী পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল কিনা—এটাও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের যতটা জানা উচিত, আমাদের বর্তমান জ্ঞান দিয়ে তা সম্পূর্ণভাবে জানা যেতে পারে না। ধনী কৃষকদের আচরণের ধরণ সম্পর্কে আরও গবেষণা এখন জরুরী প্রয়োজন।[৭৭]

ব্লিন শুধুমাত্র সামগ্রিক উৎপাদনের ওপর নয়, একর প্রতি উৎপাদনের ওপরেও নোতুন আলোকপাত করেছেন। কেবলমাত্র একর প্রতি উৎপাদনের হিসেব দিয়েই কৃষিতে অগ্রগতি বা বদ্ধাবস্থার পরিমাপ করা যেতে পারে। ব্লিন দেখিয়েছেন যে একরের পর একর জমির বিস্তার অব্যাহতভাবে চলেছে কিন্তু ১৮৯১ থোক ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে একর প্রতি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। একরের হিসাবে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে

একর প্রতি উৎপাদন হ্রাস পেল। উৎপাদিত খাদ্যশস্যের অর্ধেক ছিল চাল এবং সামগ্রিকভাবে অর্ধশতাব্দী জুড়ে চালের উৎপাদন হ্রাস ছিল লক্ষ্যণীয় ঘটনা। খাদশস্যের এক চতুর্থাংশ ছিল গম এবং তা দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল-বিশেষত বৃহত্তর পাঞ্জাবে। বৃহত্তর বাংলায় চালের উৎপাদনে বড়ো রকমের অবনতি দেখা গিয়েছিল। ১৯১৫-১৬ এবং ১৯৪৫-৪৬ খৃীষ্টাব্দে ৩ মিলিয়ন একর জমি চাষের এলাকার বাইরে চলে গিয়েছিল। মাদ্রাজ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, সিন্ধু প্রদেশে চালের উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৃহত্তর পাঞ্জাবে খাদশস্যের একর প্রতি উৎপাদনে উর্ধগতি দেখা গিয়েছিল। অধিকাংশ "অতিরিক্ত সেচভুক্ত জমি" এর অন্তর্গত ছিল। উত্তর প্রদেশে খাদ্যশস্যের একর প্রতি উৎপাদনের অর্ধেক ছিল চাল ও গম, একর প্রতি গমের উৎপাদন সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু এই সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে চালের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবনতির ঝোঁক কেন দেখা গিয়েছিল ব্লিন তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। বৃহত্তর পাঞ্জাব বাদে সেচভুক্ত জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষ দেখা যায়নি। পাঞ্জাবে 'একর প্রতি উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ ভাল সেচের জন্য সম্ভব হয়েছিল। কারিগরী পরিবর্তন খুব সামান্যই হয়েছিল এমন কি পাঞ্জাবেও "কৃষিতে ব্যবহৃত সরঞ্জামের পরিবর্তন হীনতায় প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলে কথিত।" জোতের ছোট ছোট অংশ ভাগ হয়ে যাওয়া এবং এই জোতগুলি ছড়ানো ছিটোনো অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডিত রূপ এ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষিগত শিক্ষা বা গবেষণার জন্য সামান্যই চেষ্টা করা হয়েছে।[৭৮] নিশ্চিত ভাবেই এইগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তথাপি মনে হয়, মালিক পরিচালিত কৃষি খামারের বিস্তৃত কৃষির আধুনিকীকরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খাজনা দাতা প্রজারা আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পক্ষে ছিল খুবই দরিদ্র এবং বড়ো ভূস্বামীদের ধনতান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের আগ্রহ বিশেষ ছিলনা। থর্নার বলেছেন: "ভারতীয় ভূস্বামীরা খাজনা ও সুদখোরীকে দেখেছে ধনতান্ত্রিক মুনাফার প্রতিপক্ষ হিসেবে, অধিকতর সহজ, নিরাপদ ও সুবিধাজনক এবং লোভনীয় বিষয় হিসেবে।" এটাও একটা ঘটনা যে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল প্রধানত হস্তক্ষেপ না করা।[৭৯]

ব্লিন এর গবেষণা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে খাদ্যশস্য নয় এমন বাজার মুখীন ফসলের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিশেষত শেষের দশকগুলিতেই এটা ঘটছিল। লক্ষণীয়ভাবে ইক্ষু ও তুলার একর প্রতি উৎপাদন বেড়েছিল। ব্লিন লিখেছেন যে ব্রিটিশ ভারতে একর প্রতি উৎপাদনের হার যে শূন্য ছিল, তা অধোগতির চিহ্ন নয়; প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়েছিল একদল একরপ্রতি উৎপাদনে পরিবর্তন এনেছিল, অপরদল কৃষিকে অনুন্নত রেখেছিল।[৮০]

কৃষিগত উৎপাদনে বাণিজ্যিক কৃষি কোন পরিবর্তন এনেছিল কিনা এ প্রশ্নটি তোলা যেতে পারে। এর উত্তর সন্ধানের জন্য আমরা বাণিজ্যিক কৃষির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেব।

নির্দেশিকা

১। ড্যানিয়েল এ্যান্ড এ্যালিস থর্নার' ল্যান্ড অ্যান্ড লেবার ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬১, পৃ—১৩১—৩৩। সেনসাস বা জনগণনার রিপোর্ট থেকে এই ধারণা হয় যে কৃষি কাঠামো "সামাজিক সমতাবাদী" হয়েছিল, যদিও ভূমি সংস্কারের দাবী ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

২। এস চন্দ্র, 'সাম অ্যাসপেকট্স অফ ইণ্ডিয়ান ভিলেজ সোসাইটি ইন নর্দান ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রিভিউ ১।

৩। কনট্রিবিউসনস টু ইণ্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রী ডিসেম্বর, ১৯৬০ এ ডঃ ভাটিয়ার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪। হান্টার, স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ— ১৯১।

৫। এ মিত্র, সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ—৪৪৫। মিত্র সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন।

৬। ঐ পৃ ৪৪৮।

৭। সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট, ঢাকা, (১৯১০-১৭); চৌধুরী দি প্রসেস অফ ডিপেজেণ্টাইজেসন ইন বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রিভিউ, জুলাই, ১৯৭৫।

৮। সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট, মেদিনীপুর (১৯১১—১৭)।

৯। বর্গাদারস অ্যান্ড দেয়ার প্রবলেমস, ১৯৫৮।

১০। প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। রিপোর্ট অফ ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন (১৯৪০); বার অ্যাসোসিয়েসনের সাক্ষ্যের জন্য ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১২। চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত।

১৩। ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশনের রিপোর্ট, ১৯৪০, ২য় খণ্ড, পৃ—১২০।

১৪। চেন হ্যান সেঙ, 'আগ্রেরিয়ান রিজিয়নস্ অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান' থর্নার। পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১১১।

১৫। বি সেন, ডিভাস্টেসন ইন্ বেঙ্গলস কান্ট্রি লাইফ, পিপল্‌স্ ওয়ার ৫ই জুন, ১৯৪৫, এম বসু, বাঙলার চাষী (বাংলায়) ১৯৫৬।

১৬। বসু, পূর্বোল্লিখিত।

১৭। ইশাক রিপোর্ট (১৯৪৬)।

১৮। এ ঘোষ, এগ্রিকালচারাল লেবার ইন বেঙ্গল, আর কে মুখার্জি সম্পাদিত দি ডিনামিক্‌স্ অফ এ রুরাল সোসাইটি ১৯৫৭ এর অন্তর্গত।

১৯। এ সিদ্দিকি, অ্যাগ্রেরিয়ান চেঞ্জ ইন এ নদার্ণ ইন্ডিয়ান স্টেট (১৮১৯-৩৩), ১৯৭৫ পৃ-৩৪, ৩৫।

২০। ঐ

২১। ঐ পৃ—৬৪

২২। ১৮৩২ এর ২৫শে সেপ্টেম্বরে আর এম বার্ডের বিবরণী, সিদ্দিকি পূর্বোল্লিখিত পৃ ৮৪।

২৩। হুইটকম্ব, আগ্রেরিয়ান কন্ডিসন্‌স্ ইন নর্দার্ণ ইন্ডিয়া (১৮৬০—১৯০০), ১৯৭১ পৃ ২০২। একই বছরগুলির জন্য অযোধ্যার জমিবিক্রীর সংখ্যা ছিল ৬,২৫৭, ৬,৬৭২, ৭,০৭৫।

২৪। স্টোক্‌স্, পূর্বোল্লিখিত।

২৫। ইউ পি কিসান সভার রিপোর্ট, এ, আই, কে, এস এর বিবরণী (১৯৩৬-৩৯)।

২৬। কংগ্রেস অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস্ কমিটি (১৯৪৯), পৃ—৩৭।

২৭। মাদ্রাজ ব্যাঙ্কিং কমিটির রিপোর্ট (১৯৩০); আর, পি দত্ত, ইন্ডিয়া টু ডে ১৯৭০ পৃ ২৪২।

২৮। রিপোর্ট অফ দি কংগ্রেস অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস কমিটি (১৯৪৯) পৃ—৩৭।

২৯। ডারলিং, দি পাঞ্জাব পেজেণ্ট ইন প্রসপারিটি অ্যাণ্ড ডেট্, ১৯২৮, পৃ ২০৮।

৩০। গুজরানওয়ালা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৮৯৫) পৃ ৭২।

৩১। সি, এম রেভাজ এর বক্তৃতা কাউন্সিলের বিবরণী (১৯০০), ফিলিপসের সম্পাদিত, দ্রষ্টব্য, দি ইউলিউশন অফ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান (১৮৫৮-১৯৪৭), ১৯৬২, পৃ—৬৪৬-৪৭।

৩২। কংগ্রেস অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস কমিটির রিপোর্ট, পৃ—৩৭।

৩৩। ফেমিন এনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪৫), পৃ—২৬৯।

৩৪। দি অ্যাসিণ্টাণ্ট কমিশনার পালামৌ এর রিপোর্ট (২৫শে জানুয়ারী ১৮৭৯) চৌধুরীর অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেসনস্ ইন বেঙ্গল, এন সিনহা সম্পাদিত হিষ্ট্রি অফ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫) পৃ—২৭২।

৩৫। চৌধুরী, দি প্রসেস অফ ডিপেজেণ্টাইজেসন ইন বেঙ্গল।

৩৬। সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট, চম্পারণ (১৯১৩—১৯)।

৩৭। রিপোর্ট অফ দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন, ১৯৪০, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৮-৬৯। ১৯৭২ এর পরে একর প্রতি ২২ মন ধান উৎপাদনের রিপোর্ট খুব কমই পাওয়া গেছে; কমিশনের মতে বাঙলায় একর প্রতি গড়ে ১৮ মন ধান উৎপন্ন হত।

৩৮। এম ডি মরিস, 'ইকনমিক চেঞ্জ অ্যাণ্ড এগ্রিকালচার', ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিষ্ট্রি রিভিউ, জুন ১৯৬৬, ডঃ ধর্মকুমার মাদ্রাজ সম্বন্ধেও লিখেছেন…মহাজন ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা কৃষক সমাজের বিরাট অংশের সম্পত্তিচ্যুতি ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। ডঃ কুমারের ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড কাণ্ট ইন সাউথ ইণ্ডিয়া পৃ ১৭৯ দ্রষ্টব্য।

৩৯। মরিস, ইমার্জেন্স অফ এ লেবার ফোর্স ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬৫, পৃ—১৯৯-২০৪। মরিস লিখেছেন যে সুতা কলগুলিকে খুব কমই শ্রমিক ঘাটতির সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গ্রামগুলির উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা বোম্বাইয়ের সুতা কলগুলিতে কর্মসংস্থানের জন্য যেত, যেহেতু শ্রমিক সরবরাহ যথেষ্ট

ছিল, তাই মিল মালিকরা জীবনধারণের নিয়তম মজুরী দিত।

৪০। সিদ্দিকি, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৫০।

৪১। বুকানন-হ্যামিলটন পেপারস।

৪২। বুকানন-হ্যামিলটন, জিওগ্রাফিকাল, স্ট্যাটিসটিকাল অ্যান্ড হিস্টরিকাল ডেসক্রিপসন অফ দিনাজপুর, ১৮৩৩।

৪৩। চৌধুরী, অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেসনস্ পৃ—৩২০।

৪৪। ঐ

৪৫। ঐ, পৃ—৩২১।

৪৬। ঐ, উত্তর বাংলায় গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ হল বর্গাদার।

৪৭। ঐ।

৪৮। মুখার্জি, ল্যান্ড প্রবলেমস্ অফ ইণ্ডিয়া, পৃ—১৫৭।

৪৯। ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪০), ২য় খণ্ড। পৃ—১১৭। ১৯৪৬-৪৭ এর হিসাব অনুসারে, পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ পরিবারগুলির ২৪ শতাংশ ছিল কৃষি মজুর।

৫০। বি, সেন, ইভোলিউসনস অফ অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেসনস, পৃ—১৪৭।

৫১। সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৩১, ১ম খণ্ড, বি, সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৪৮।

৫২। প্যাটেল, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৪৮-৪৯। প্যাটেল লিখেছেন যে "মহাজন-ভুস্বামীরা কৃষকদের জমিচ্যুত করেছিল, কিন্তু জমিতে রেখে তাদের শোষণ করা তাদের কাছে বেশী লাভজনক মনে হয়েছিল।

৫৩। বি সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৬০।

৫৪। এম সরকার, ইকনমিক কণ্ডিসনস অফ এ ভিলেজ ইন নর্থ বিহার (১৯৩৯), ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ইকনমিকস, জুলাই, ১৯৩৯।

৫৫। এ, আই, কে, এম এর বিবরণী, ১৯৩৯-৪৬।

৫৬। রিপোর্ট অফ কংগ্রেস অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস কমিটি, ১৯৪৯, পৃ—১১৭।

৫৭। মুখার্জি, পূর্বোল্লিখিত পৃ—২২২।

৫৮। রিপোর্ট অফ কংগ্রেস অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস কমিটি, পৃ—১২০।

৫৯। বি, চ্যাটার্জি, এগ্রিকালচারাল লেবার, এণ্টারপ্রাইজ, অ্যান্ড-ল্যান্ড রিফর্মস ইন ইণ্ডিয়া, এনকোয়ারি, ২য় খণ্ড।

৬০। থর্নার, দি অ্যাগ্রেরিয়ান প্রস্পেকট ইন ইণ্ডিয়া, পৃ—১১, বি, সেন এর রচনায় উল্লিখিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৬৪।

৬১। মুখার্জি, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২২৬ ; থর্নার পূর্বোল্লিখিত পৃ—৩৪-৩৮। থর্নার যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে শ্রম শক্তির বেশীর ভাগই "স্বাধীন শ্রমিক" নয় ; এর মূলে আছে ভূস্বামীর কাছে ঋণের জন্য কৃষকের নির্ভরশীলতা।

৬২। রিপোর্ট, পৃ—১৩০-৩৫।

৬৩। ঐ, পৃ—১৩৭। 'কৃষি অর্থনীতিতে যুদ্ধ কালীন কাঠামো-গত পরিবর্তনের জন্য' কৃষি মজুরদের ইউনিয়নের প্রয়োজন তীব্র হয়েছে।

৬৪। বুকানন হ্যামিলটন, পূর্বোল্লিখিত।

৬৫। ফেমিন প্রসিডিংস (১৮৮৮), চৌধুরী অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস পৃ—৩১৫।

৬৬। ঐ।

৬৭। ঐ।

৬৮। ঐ।

৬৯। মিত্র, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৯৫। মিত্র লিখেছেন, ধনী কৃষকরা কৃষির সঙ্গে মহাজনীতে নিযুক্ত ছিল এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় যে জমি তারা কিনেছিল তা বর্গাচাষে দেওয়া হয়েছিল।

৭০। হুইটকম্ব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৬৬-৬৮।

৭১। ঐ, পৃ—১৬৬।

৭২। ডাফারিন এনকোয়ারি, পৃ—৭৭-৭৮, হুইটকম্ব-এ উল্লিখিত, পৃ—১৬৭।

৭৩। হুইটকম্ব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৯৮।

৭৪। কুমার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২৯৮-৩০৩ ; এ ছাড়াও রিপোর্ট অফ দি ডেকান এগ্রিকালচারিস্ট্স্ রিলিফ অ্যাক্ট কমিশন (১৮৯২)।

৭৫। রিপোর্ট অন্ সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেসনস ইন মজঃ-ফরপুর (১৮৯২-৯৯)।

৭৬। ঐ।

৭৭। জি ব্লিন, এগ্রিকালচারাল ট্রেন্ডস্ ইন ইণ্ডিয়া (১৮৯১-১৯৪৭) পৃ—৯৮, ১৪০, ১৭৪।

৭৭। ঐ, পৃ—২০০-১২।

৭৯। থর্নার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১১১।

৮০। ব্লিন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২৪০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার ঃ ১

ব্রিটিশ রাজত্বে কৃষিগত বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তার। অর্থকরী ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শিল্প তার পণ্যের জন্য বর্দ্ধমান বাজারের প্রয়োজন বোধ করছিল ; কাঁচামালের বর্দ্ধমান সরবরাহের প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছিল এবং তা বিদেশ থেকে এসেছিল। যেহেতু তুলোর প্রতিটি আউন্স আমদানী করতে হত। তাই ল্যাংকাশায়ার হৈ-চৈ শুরু করেছিল। ১৮৩৮ এ ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অফ কমার্স তাদের স্মারকলিপিতে রাস্তা নির্মাণের জন্য জরুরী তাগিদ জানায়, এমন কি "জমির করের পুনর্বিন্যাস" সুপারিশ করে যাতে তুলোর সরবরাহ বাড়ানো যায়। ১৮৪৮ এ তুলা কমিশন রেলপথের মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যকে উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করে। ১৮৫৩ এ ডালহৌসী তার রেলপথের স্মারকলিপিতে রেলপথের বাণিজ্যিক সুবিধাগুলির বিষয় নির্দেশ করেন ও বলেছিলেন যে রেলপথের সাহায্যে তুলো দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে বিদেশে রপ্তানীর জন্য বন্দরে বহন করে আনা সম্ভব হবে।২

এটা মনে করা ভুল হবে যে বাণিজ্যিক কৃষি ব্রিটিশ শিল্পের স্বার্থের ফলেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। একথা সত্য যে নীল পাট এবং তুলো ইংলন্ডে রপ্তানী হত। কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষদিকে যখন পাট এবং বস্ত্র শিল্প বোম্বাই, বাঙলা এবং আমেদাবাদে প্রসার লাভ করেছিল তখন পাট ও তুলোর একর প্রতি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৩০ এর দশকগুলিতে ভারতীয় পুঁজি বিনিয়োজিত এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপনায় চালিত চিনি শিল্প শক্তিশালী আকার গড়ে ওঠার সময় একর প্রতি ইক্ষু চাষ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিল্পের বিকাশ এবং বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার পাশাপাশি এগিয়ে চলছিল ; এরা ছিল পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং একে অন্যের জন্য বাজার তৈরী করছিল।

রেলপথ ও সড়কের মাধ্যমে অভ্যন্তর অঞ্চলকে উন্মুক্ত করার বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। প্রথম রেলপথ উন্মুক্ত হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে

বোম্বাই এবং থানার মধ্যে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৩000 হাজার মাইলের বেশী রেলপথ খোলা হয়েছিল। ব্রিটিশদের দ্বারা নির্মিত পরিকাঠামো দ্বারা ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হয়েছিল। এই ব্যবসায়ীরা শহরের ফার্মগুলির জন্য তুলা, পাট এবং তৈলবীজ কিনে বিস্তৃত পশ্চাৎভূমিতে ব্যবসা করতে পারত। তথাপি এটা বাস্তব ঘটনা যে ১৯৩০ এও লক্ষ লক্ষ গ্রাম রেলপথ বা বাঁধানো সড়কের দ্বারা যুক্ত ছিল না। শহরের বা রেলপথের বা ভাল সড়কের কয়েক মাইলের মধ্যে যারা থাকত, কেবলমাত্র তারাই তাদের উৎপন্ন পণ্য শহরের বিভিন্ন ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রগুলিতে বিক্রীর জন্য নিয়ে আসতে পারত। স্পষ্টতই বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়ছিল। ১৯৩০-৩১ এর সরকারী বিবৃতিতে গ্রামের বিচ্ছিন্নতার পরিষ্কার ছবি দেওয়া আছে ঃ

"এখন পর্যন্ত, পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, গ্রামগুলির মাত্র ক্ষুদ্র এক অংশের কয়েক মাইলের মধ্যে বাঁধানো সড়ক আছে এবং বাকী অংশে পৌঁছুতে গেলে মাঠের মধ্যেকার আঁকাবাঁকা পথ অথবা এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে যেতে হয়...এইরকম লক্ষ লক্ষ ভারতীয় গ্রাম, পাশ্চাত্য মাপকাঠি অনুসারে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন...যে গ্রামগুলি শহর, রেলপথ বা ভাল রাস্তার কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত...তারা উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য ভারতীয় শহরে কিংবা বিদেশে বিক্রী করতে পারে।[২]

আমরা এবার এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে পপি ও নীলচাষের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রধান নগদ ফসলগুলির ওপর মনোযোগ নিবন্ধ করব। কতকগুলো প্রশ্নও আমরা করতে চাই। বাণিজ্যিক কৃষি কিভাবে গড়ে উঠেছিল ? এর দ্বারা কৃষকরা কি উপকৃত হয়েছিল ? উৎপাদনের ধরণ কি ছিল ? একথা কি আমরা বলতে পারি যে কৃষিতে কারিগরী সংক্রান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল ?

পপি

আফিমের ব্যবসার ফলেই পপি চাষের উদ্ভব। আফিম ছিল একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবসা যা ব্রিটিশরা রাজস্ব লাভের উদ্দেশ্য পালন করেছিল। বারাণসী, বিহার এবং বাঙলা, মধ্যভারত ও মালোয়াতে আফিমের ব্যবসা কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৮৭০ সাল পর্যন্তও চীনের মোট আমদানীর প্রায় অর্ধেক ছিল আফিম। বছরের পর বছর ভারতীয় বণিকরা আফিমের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৮৬০ এর দশকগুলিতে আফিমের "হুণ্ডি"

আফিম বিক্রীর জন্য চালু ছিল।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধানের জমিকে পপি চাষের জমিতে পরিণত করার জন্য চাষীদের ওপর বাধ্যতামূলক চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। বার্ক তার বিখ্যাত 'নাইনথ' রিপোর্টে (১৮৭৩) লেখেন" ধান গাছে ঢাকা সবুজ মাঠগুলিতে ঐ গাছ লাগানোর জন্য জোর করে লাঙল দেওয়া হয়েছিল" এবং এটা করা হয়েছিল "গ্রামের ব্রিটিশদের উপস্থিতিতে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধে যারা এই দৃশ্য দেখেছিল।"[৪] কৃষকদের দাদন দিয়ে তাদের পপি চাষে বাধ্য করাই ছিল প্রচলিত ব্যবস্থা। পপি চাষের জন্য সরকার জোতদারদের প্রধানত গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নির্ভর করত।

মনে হয়, ছোট চাষীদের অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল পপি চাষের ভিত্তি। এই পদ্ধতি ছোট চাষীদের পপি চাষে বাধ্য করেছিল; যতই দিন যেতে লাগল, এই চাষ ততই অলাভজনক বলে প্রমাণিত হল। যেমন গোরখপুরের আফিম চাষের এজেন্ট লিখেছেন, অগ্রিম দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারত "আসামীদের (কৃষকদের) ওপর একটি দাবী যা অন্যভাবে বজায় রাখতে পারত না"।[৫] কৃষকদের কাছে এই পদ্ধতি লাভজনক বলে মনে হচ্ছিল না বলে ক্রমশ দমনমূলক হয়ে উঠছিল। তাদের চড়া হারে খাজনা দিতে হত; একটা নির্দিষ্ট দামে সমস্ত ফসল আফিম এজেন্টদের কাছে সমর্পণ করতে হত; এবং তারা বাজারে আফিম বিক্রী করতে পারত না। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হলে তারা আলু এবং ইক্ষু চাষ অধিকতর লাভজনক মনে করল।

বাজারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পপি চাষের পদ্ধতি ভেঙে পড়ল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ম্যাঙ্গেলস রিপোর্ট করেছেন :—"জল এবং স্থল উভয় পথেই যাতায়াতের উন্নত উপায় চাষীদের কাছে দেশীয় পণ্যের বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল যা তারা আগে লাভ করেনি···যে আলু আগে শুধুমাত্র শহরের কাছাকাছি উৎপন্ন করা যেত তা "প্রায়ই উৎপন্ন স্থানেই বিক্রী হয়ে যায়।" বোর্ড অব রেভিনিউ বাজারের প্রসারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চাষীদের গ্রামেই. ফসল বিক্রী করতে হত বলে তারা অগ্রিম নিত এবং "পপি চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল জমি দিয়ে দিত।" কিন্তু রেলপথের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে "দেশের বাণিজ্যের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান দাবী বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দিয়েছে।" ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বিহারের আফিম এজেন্ট রিপোর্ট করেছিলেন—"এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

থাকতে পারে না যে বেঙ্গল এবং উত্তর পশ্চিম রেলপথ উন্মুক্ত হওয়ার পর পপির মতো দুর্বল ফসল চাষের ব্যবস্থা বজায় রাখার দুরূহতা বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৬] পপি চাষ হতে থাকলেও একর প্রতি তা হ্রাস পাচ্ছিল কারণ কৃষকরা আলু, ইক্ষু এবং পাট চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

নীল

রঙ করার বৃহত্তম দ্রব্য হিসেবে পৃথিবীতে ব্যবহৃত নীলের দাবী য়ুরোপে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ বণিকরা নীল চাষে উদ্যোগী হল। এই শিল্পের অর্থসংস্থান হত প্রধানত ব্যাংক ও এজেন্সি হাউসের মাধ্যমে। মালদা, পূর্ণিয়া, পাবনা, নদীয়া, যশোর, মেদিনীপুর, রংপুর ও রাজশাহীতে এর কারখানা স্থাপিত হয়েছিল এবং ধানের জমিকে নীল চাষের জমিতে পরিণত করা হয়েছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর নীল চাষকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে, যে সমস্ত গ্রামে নীল চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে, সেখানে জমির দাম খুব বেড়ে গিয়েছে। প্রসন্নকুমার "য়ুরোপীয় দক্ষতা এবং মালিকাকানার প্রয়োগকে" স্বাগত জানিয়েছিলেন। নীল চাষের উদ্দেশ্যে জমি পাওয়ার জন্য জমিদারদের চড়া খাজনা দিতে হত—এটা দর্শানোর বহু সাক্ষ্য প্রমাণাদি আছে। আপাত দৃষ্টিতে জমিদারদের নীল চাষের ক্ষেত্রে স্বার্থ ছিল। তাদের কয়েকজন, বিশেষত দ্বারকানাথ প্ল্যাণ্টার হওয়াই পছন্দ করেছিলেন।[৭]

নীল চাষের দুটি ধরণ ছিল—নিজ আবাদ এবং রায়তী। নিজ আবাদ বলতে বোঝাত ভাড়া করা মজুরের সাহায্যে প্ল্যাণ্টারের এর জমি চাষ; প্ল্যাণ্টার স্বয়ং চাষের খরচ বহন করত।

রায়তী প্রথায় ছোট চাষীরা চুক্তির ভিত্তিতে তাদের জমিতে নীল চাষ করত এর প্ল্যাণ্টারের কাছ থেকে অগ্রিম পেত। চাষীকে বহন করতে হত চাষের খরচ এবং নির্দিষ্ট দামে নীল করদের কাছে সমস্ত ফসল সমর্পণ করতে হত।[৮] নিজ আবাদ প্রথার থেকে রায়তী প্রথায় নীল চাষের দিকেই নীলকরদের ঝোঁক ছিল। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য বেশী দূর যাবার প্রয়োজন নেই। মূলধনী ব্যয়ের সঙ্গে নিজ আবাদ অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ন ব্যাংক উঠে যাবার পর অর্থসংস্থান করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় নীল সমিতির চাষের আওতায় ৭৫,০০০ বিঘা জমি ছিল, এর মধ্যে ৬১,০০০ বিঘা জমি

ছিল রায়তী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।[৯] নীল কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে লারমুর বলেছেন: "আমাদের লক্ষ্য সর্বদাই নিজ আবাদে নীল চাষ কমানো ও রায়তদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা···নিজ আবাদ বাদ দিয়ে যত বেশী রায়তকে আমরা স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে পারব, আমাদের ভূ-সম্পত্তির মূল্য ততই বাড়বে।"[১০] আর পি সেজ নামক একজন নীলকর বলেছিলেন: "একজন নীলকরকে নিজ আবাদ প্রসারের জন্য পরামর্শ দেওয়া আমার উচিত নয় কারণ যে পরিমাণ জমি সে পেতে পারে, সে ব্যাপারে বছরের পর বছর ধরে একটা অনিশ্চিত থেকে যায়।[১১] জমি দখল করাও যথেষ্ট দুরূহ ব্যাপার ছিল যা প্রায়ই জমিদার ও নীলকরদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করত।

অগ্রিমের ওপর ভিত্তিশীল রায়তী ব্যবস্থা প্রকৃত পক্ষে নির্ভরশীল কৃষকদের দ্বারা বাধ্যতামূলক আবাদে পরিণত হয়েছিল। নীলকমিশনের কাছে অ্যাসলে ইডেনের সাক্ষ্যে বলা হয়েছে:

"নীলচাষ সর্বদাই বাধ্যতামূলক। প্রথমতঃ আমি বিশ্বাস করি এটা লাভজনক নয়, সুতরাং চাষীরা সে চাষে সম্মতি দেবেনা। দ্বিতীয়ত এটা কিছু পরিমাণে হয়রানি মূলক হস্তক্ষেপের সঙ্গে জড়িত···চতুর্থ যদি রায়তরা স্বাধীন ব্যক্তি হয় তাহলে তারা নীলচাষ করবে না···সপ্তমত যখনই রায়তরা এ বিষয়ে সচেতন হয় যে তারা আইনত ও বাস্তবত স্বাধীন তক্ষুনি তারা চাষবাস চালিয়ে যেতে অসম্মত হয়···[১২]"

নীলচাষ যে কৃষকদের পক্ষে লাভজনক ছিলনা তা উত্তর পাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বীকার করেছিলেন। তিনি লিখেছেন: "তাদের জমিদার, আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তারা এটা রোপণ করে এবং যেহেতু তারা আগেও রোপণ করেছে···'[১৩] ছোট চাষীকে ধানের জমি নীলচাষের জমিতে পরিবর্তিত করতে হয়েছিল কিন্তু নেহাৎ বেঁচে থাকার জন্য তাদের ধানের জমির ওপর নির্ভর করতে হত। সয়্যারস নামক একজন নীলকর এভাবে বলেছেন: 'এর দ্বারা তার ও তার পরিবারের খাদ্য সংস্থান হয় এবং খড়ের দ্বারা গবাদি পশুর খাদ্য সংস্থান হয় এবং কুটিরের চাল ছাওয়ানের ব্যবস্থা হয়, সুতরাং নীলের সঙ্গে চালের তুলনা করা সঙ্গত নয়"[১৪] মোটামুটি হিসেব অনুসারে একজন কৃষক তামাক উৎপাদন করে বিঘা প্রতি ১১ টাকা লাভ করে এবং এক বিঘা তামাকের জমিতে নীলচাষ করে ৯ টাকা লোকসান দেয়।[১৫] নীলচাষীদের বিদ্রোহের কেন্দ্র বারাসাতে পাটের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছিল যেহেতু "প্রতি দুমন চাল রপ্তানীর জন্য চটের

ব্যাগের প্রয়োজন হচ্ছিল।[১৬] আমরা দেখব, ১৮৫০ এর দশকে বাঙলা দেশের জেলাগুলিতে পাটের চাষ প্রসারিত হচ্ছিল। মনে হয়, ছোট চাষীরা অগ্রিমের দ্বারা খুব কমই উপকৃত হত যা প্রায়ই "সমৃদ্ধিবান রায়তরা" গ্রহণ করত। বারাসাতের পরিস্থিতি সম্পর্কে ইডেনের বক্তব্যে এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে: "অগ্রিমের জন্য ইচ্ছুক হয়ে কেবলমাত্র সেই মানুষরা কারখানায় যায়, নীলকর বা রায়তকে প্রবঞ্চিত করার প্রকাশ্য মতলব নিয়ে যারা আসে।"[১৭]

১৮৫৯—৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে বিক্ষোভ ঘটে তার ফলে নীলচাষ দারুণভাবে মার খেয়েছিল। একর প্রতি নীলচাষের পরিমাণ দারুণভাবে কমে গিয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে বিহারে মূলধন চলে গিয়েছিল। নিম্নলিখিত সারণীতে দেখা যায় বিহার ও বারাণসীতে একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী কৃত্রিম রঙ বাজারে উপস্থিত করায় ভারতে নীলচাষের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল।

৮নং সারণী

নীল উৎপাদন (মনের হিসাব)

প্রদেশ	১৮৫৭-৫৮	১৮৭৭-৭৮
বারাণসী	১০.০০০	১৭,৫৫৬
বাঙলা	৫০,৩৩০	১৬,৫০২
বিহার	১৮,৮২২	৩৪,৮৫৭

উৎস: রীড, দি কালচার অ্যান্ড ম্যানফাকচার অফ ইন্ডিগো, ১৮৮৭, পৃ-৮৫, পালিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৫০

বিহারে নীলচাষ শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের মাঝামাঝি এবং ১৮৭০ এর দশকের বছরগুলিতে দ্রুত উন্নতি লাভ করেছিল। নীলচাষ কেন্দ্রীভূত ছিল উত্তর বিহারে বিশেষত চম্পারণে। নীলকররা জমিদার হওয়ার ফলে চম্পারণে রায়তী ব্যবস্থা চালু রাখার দিকেই তাদের ঝোঁক ছিল। ১৮৬০ এর দশকে "জিরাত" ব্যবস্থা বা ভাড়া করা মজুর দিয়ে চাষের ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছিল বিহারে, বিশেষত মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা এবং সারাণে। শ্রমিকদের খুব কম মজুরী দেওয়া হত, তা হলেও শীতকালে অন্য কোনও কাজ না থাকায় তারা এই কাজ গ্রহণ করত। স্টিভেনসন মুর লিখেছেন: "চম্পারণে নীলচাষের কারখানাগুলিতে দৈনিক মজুর নিয়োগের সংখ্যা ছিল ৩৩,০০০ এবং শ্রমিকদের অর্ধেক

নিযুক্ত হত শীতকালে যখন তাদের দুর্দশা চরমে উঠত। "এটা দেখা যায় যে নীলকররা নোতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রবর্তন করেছিল যা পরে ইক্ষুচাষে ব্যবহৃত হয়েছিল। নীলচাষ অর্থনীতির আধুনিককরণে সাহায্য করেছিল। বাজারের জন্য অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করা হত। প্রকৃত পক্ষে চাষীরা অর্থকরী ফসলের মূল্য বুঝতে ভুল করেনি এবং তারা ইক্ষুচাষের দিকেই ঝুঁকেছিল।[১৮] ১৮৯০ এর দশকে ইক্ষু চাষের আওতায় চম্পারণে প্রায় ১১,০০০ একর জমি ছিল যা ১৯৩০ এর দশকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পাট

এবার তাকানো যাক বাঙলাদেশের "সোনার ফসল" পাটের দিকে যা আজ পশ্চিম বাঙলার প্রধান অর্থকরী ফসল। প্যাকিং এর উপাদান হিসেবে পাট পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিশ্বের বাজারে এর চাহিদা খুব বেশী ও ক্রমবর্ধমান। ডান্ডির ব্যবসায়ীরা ভারতীয় পাটের ওপর নির্ভর করত। যে দেশ কম্বল ও সস্তা কার্পেটের উৎপাদনের পাট ব্যবহার করত সেই জার্মানী ছিল কাঁচা পাটের একজন বড়ো ক্রেতা। পাট শিল্পে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাহিদা বেড়ে গেল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ অকল্যান্ড কর্তৃক রিষড়াতে প্রথম চটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে চটশিল্পের সচল বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, এই বিকাশ সম্ভব হয়েছিল য়ুরোপীয় (প্রধানত স্কটিশ) প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চটকলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭৭ টিতে, যেখানে ২৮৮,০০৩ জন মজুর নিযুক্ত ছিল। চটশিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রপ্তানীকৃত পাটের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, এই রপ্তানী হ্রাসের পরিমাণ ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫২·৭ শতাংশ থেকে ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ৩৫·৭ শতাংশ।[১৯]

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দি ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফাকচারার্স এসোসিয়েসন (আই, জে, এম, এ) প্রতিষ্ঠিত যে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থা পরিবর্তিত জুট মিলস এ্যাসোসিয়েসন নাম গ্রহণ করে। আই, জে, এম এর বাংলার আইন সভায় দুজন প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ ছিল; সুতরাং চটশিল্পে তাদের অবশ্যই একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল; এটা মিলগুলির আভ্যন্তরীন বিরোধ এড়াতে সাহায্য করেছিল; উৎপাদনকে নিয়মিত করা এবং উঁচু হারে মুনাফা বজায় রাখার সহায়ক হয়েছিল।[২০] কাঁচা পাটের প্রধান রপ্তানীকার ছিল ব্রিটিশ কারখানাগুলি বিশেষত র‍্যালি ব্রাদার্স,

এম ডেভিড এণ্ড কোং, আর সিম এণ্ড কোং।[২১] মারোয়াড়ী বণিকরা ক্যালকাটা বেল্ড জুট এ্যাসোসিয়েসনে সংগঠিত হয়েছিল, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিড়লা ও জালানরা পাট শিল্পে মূলধন কেন্দ্রীভূত করেছিল। শেঠ সুরযমল জালান (জন্ম-১৮৮১) চটশিল্পে জড়িত বাজোরিয়া পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানকে প্রধান কেন্দ্র করে তিনি কলকাতায় গদী বসান এবং চটশিল্পে প্রবেশ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাট রপ্তানী শুরু করেন; ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান জুট প্রেস স্থাপিত হয় এবং তিন বছর পরে হনুমান জুট প্রেস খোলা হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে হনুমান জুট প্রেস কাজ শুরু করে; এর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় পাট কেনার অনেক এজেন্সি ছিল।[২২] ১৯১৯-২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিড়লারা শিল্পে আত্মনিয়োগ করে এবং কলকাতার কাছাকাছি পাটের কল স্থাপন করে। বাংলার পাট ব্যবসায়ীদের প্রধান ভাগ্যকুলের জমিদারদের অনেক ষ্টীমার ছিল এবং তারা পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতায় কাঁচা পাট নিয়ে আসত।[২৩] পশ্চাৎভূমিতে কাজকর্মে সক্রিয় ছিল এমন বেশ কিছু ব্যাপারী, ফড়িয়া, পাইকার, দালাল ছিল প্রধানত বাঙালী।

কয়েক বছর ধরে চটশিল্পে উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পাট চাষের আওতাধীন জমি ৮৫০,০০০ একরের বেশী ছিলনা; ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত শেষ পাঁচ বছরে এই জমির পরিমাণ ছিল বছরে গড়ে ৩,১৫০,৪০০ একর।[২৪] পাট ছিল বাংলার একচেটিয়া ফসল যদিও তা আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলে উৎপন্ন হত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৯০ শতাংশ পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হত। পাট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্ব বাংলা। নারায়ণগঞ্জে, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বেশী পাট উৎপন্ন হত। উত্তর ও পূর্ব বাংলাতেও পাটশিল্পের প্রসার ঘটেছিল। পশ্চিমবাংলার পাটশিল্প মুর্শিদাবাদ নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণায় প্রসারিত হয়েছিল।[২৫] এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় যে দেশবিভাগের পর পাটশিল্প পশ্চিমবাংলায় দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল।

পাটচাষের অধীন এলাকার বিভিন্ন বছরে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছিল, এটা বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একর প্রতি পাট উৎপাদনের পর্যালোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। আবহাওয়ার প্রশ্নটিও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বীজ বপনের পূর্বে অংকুরোদ্গমের পরের বৃষ্টি

ফসলের এলাকাকে প্রভাবিত করত। কিন্তু যে প্রধান কারণটি একর প্রতি উৎপাদনের বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য দায়ী ছিল তা হল দামের স্থিতি-সাম্যহীনতা। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় একর প্রতি উৎপাদন বেড়েছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ হ্রাস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মনে হয় ধানের উচ্চমূল্য পাট চাষ বর্জন করে চাষীদের এই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করেছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাটের দাম নিম্নমুখী হওয়ার একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দ এর ব্যতিক্রম। দামের ওঠাপড়া নিশ্চিতভাবেই পাটচাষীদের দারুণ আঘাত করেছিল।

সাধারণভাবে জমির মূল্য হ্রাসের ফলে একর প্রতি উৎপাদন হ্রাস পেত।

৯ নং সারণী

পাটের জমি ও দাম (১৯২০-২৯)

বছর	পাটের জমি (একর)	গড় বার্ষিক মূল্য টাকা-আনা-পাই
১৯২০-২১	২,৪৭২,৯৭৮	৯৫— ৮— ৭
১৯২১-২২	১,৫৫৫,৫২৭	৯০—১১— ২
১৯২২-২৩	১,৪৫৬,৪২৬	৭৮— ১— ৮
১৯২৩-২৪	২,৩২৯,২৩২	৭২—১—৮
১৯২৪-২৫	২,৭৩৭,৯৩১	৯৮—১১— ৭
১৯২৫-২৬	২,৯২৩,৪০৮	১০৫— ২— ৮
১৯২৬-২৭	৩,৬০৯,৪৯০	৮৭—১১— ৬
১৯২৭-২৮	৩,২৯৩,৮০১	৭৫—১১— ৬
১৯২৮-২৯	৩,০৬২,৩০২	৭৩— ২— ৬

উৎসঃ রিপোর্ট অফ বেঙ্গল জুট এনকোয়ারি কমিটি, ১৯৩৪, ২য় খণ্ড

বিশ্বব্যাপী মন্দা

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অর্থনীতি এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। এই মন্দার অব্যবহিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ফল হল কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস। ভেরা এ্যানস্টে লিখেছেন যে মূল্য হ্রাসের ফলে কৃষিজাত পণ্যের দাম অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল যা নিশ্চিতভাবেই সব শ্রেণীর কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।[২৬] ভারতীয় শিল্পগুলির মধ্যে প্রথম যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা হল পাটের মতো রপ্তানী

প্রধান শিল্প। ১০ নং সারণীতে দেখা যায়, পাট ও পাট শিল্পে ক্রমাবনতি ঘটছিল। মন্দার মুখোমুখি হয়ে আই, জে, এম, এ ছাঁটাইয়ের কাজে নেমে পড়ল। ১৯৩৩ এর মধ্যে প্রায় ১৪,০০০ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছিল। অনেক পাটকল এবং চালের কল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২৭]

১০ নং সারণী

পাট ও পাটজাত দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানী (১৯২৯-৩৭)

বছর	পাটের রপ্তানীর মূল্য (১০০০ টাকা)	পাটজাত দ্রব্যের মূল্য (১০০০ টাকা)
১৯২৯-৩০	২৭১,৭৩৮	৫১৯,২৬৮
১৯৩০-৩১	১২৮,৮৪৭	৩১৮,৯৪৫
১৯৩১-৩২	১১১,৮৮১	২১৯,২৪৩
১৯৩২-৩৩	৯৭,৩০৩	২১৭,১১৮
১৯৩৩-৩৪	১০৯.৩২৭	২১৩,৭৪৯
১৯৩৪-৩৫	১০৮,৭১১	২১৪,৬৮৩
১৯৩৫-৩৬	১৩৭,০৭৬	২৩৪,৮৯৫
১৯৩৬-৩৭	১৪৭,৭১০	২৭৯,৪৭৫

উৎস : অ্যানুয়াল স্টেটমেণ্ট অফ সী-বোর্ণ ট্রেড অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১ ম খণ্ড।

পাটের দামও পড়ে গেল।[২৮] ১৯২০-২৯ এর মধ্যেকার বন্দরগুলিতে কাঁচা পাটের দাম ছিল ৯'৬ আনা, ১৯৩০-৩৪ এর মধ্যে গড় দাম ছিল ৩'১০ আনা।[২৯] নিশ্চিতভাবেই পাট চাষের আওতাভুক্ত জমি হ্রাস পাচ্ছিল। ১৯৩০ এ খুব ভাল ফসল হলেও ১৯৩১-৩২ এ পাট চাষের আওতাভুক্ত জমি ছিল মাত্র ১'৯ মিলিয়ন একর। ১৯৩৩ থেকে পাট চাষের আওতাভুক্ত জমি বৃদ্ধি পাওয়ার একটা ঝোঁক দেখা গেল।[৩০] সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, কারণ কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর ওপর করের ফলে বিস্তর রাজস্ব পাওয়া যেত। পাট চাষের ওপর স্বেচ্ছাধীন সঙ্কোচন প্রকল্প আরোপকে সরকার উৎসাহিত করল। কিভাবে স্বেচ্ছাধীন বিধিনিষেধের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল তা আমরা এবার দেখব।

১১ নং সারণী

পাট চাষের এলাকা (১৯২৯-৩৪)

(১000 একর)

প্রদেশ	১৯২৯-৩0	১৯৩0-৩১	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩	১৯৩৩-৩৪
বাঙলা	২,৯৮৬	৩,0২৮	১,৫৯৭	১,৮২২	২,১৪২
বিহার	২৩৮	২৩৮	১৪৯	১৭0	১৯0
আসাম	১৫৭	১৯২	৯৯	১২৭	১৫৭
কুচবিহার ও ত্রিপুরা	৩৪	৩৪	১৭	২৪	২৬
মোট	৩,৪১৫	৩,৪৯২	১,৮৬২	২,১৪৩	২,৫১৭

উৎস : ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি, ১৯৪0, বিহারের সংখ্যাগুলি বিহার ও উড়িষ্যা সংক্রান্ত।

১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী মন্দা শীর্ষে পৌঁছেছিল। অর্থমন্ত্রী পাটের দামের মারাত্মকভাবে পড়ে যাওয়া এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন। পাটের পরিমাণ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮,৭২৯,৫৭0 বেল থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৫,১২৭,৫00 বেল এ কমে গিয়েছিল। ফসলের দাম ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮ কোটি টাকা কমে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৪ কোটি টাকা। প্রধান খাদ্যশস্য চালের দাম এ সময়ে ৮৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছিল।[৩১] ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকার পাট চাষের ওপর স্বেচ্ছাধীন বিধিনিষেধ আরোপের তাগিদ দিয়েছিলেন। গ্রামগুলিতে বিলি করা ইস্তাহারে ছিল : "গত বছর সরকার পূর্ববর্তী বছরের থেকে বেশী পাট উৎপাদন না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন...তা সত্ত্বেও কৃষকরা পূর্ববর্তী বছরের থেকে বেশী পাট উৎপাদন করেছিলেন···এ বছর চাষীদের নিজেদের স্বার্থেই পাট চাষ কমানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।[৩২]

মনে হয়, ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বেচ্ছাধীন সঙ্কোচনের যে নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল তা বেশী সাফল্য লাভ করতে পারেনি, এটা পাটের দামকেও প্রভাবিত করেনি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর কালেকটর লিখেছিলেন যে "আমি এ কথা বলতে পারিনা যে

স্বেচ্ছাধীন সংকোচন পরিকল্পনা খুব সাফল্য লাভ করেছিল। যে অনুকূল দাম পাওয়া গিয়েছিল তা প্রতিকুল আবহাওয়ার জন্য।"[৩৩] বগুড়ার জেলাশাসক বলেছিলেন যে পাট চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণ খরা অথবা বন্যা।[৩৪] অনেক পদস্থ কর্মচারী এ বিষয়ে জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে পাটের কোন বিকল্প সামগ্রী নেই, এবং চাষীরা তাদের জমি শূন্য অথবা কর্মহীন রাখতে চায় না। এস কে দে দেখিয়েছিলেন যে পাটের এলেকার সংকোচন একটি অসার কল্পনা—যেহেতু 'ফাড়িয়া ও ব্যাপারী থেকে মিল মালিক পর্যন্ত সকলেই এর বিরোধী কারণ সরবরাহ যত কম, এই মানুষগুলির কাছে কাঁচা মালের দাম তত বেশী।' দে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বিধিনিষেধ কেবলমাত্র 'রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানায় পাটচাষ' অথবা 'নির্বাচিত বড়ো চাষীদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাষের মাধ্যমে' কার্যকরী হতে পারে।[৩৫] এম এম বসু ভেবেছিলেন যে স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হবে না কারণ "জোতদার, মহাজন এবং বড়ো চাষীরা প্রায়শই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তাদেরই এজেন্সিকে ব্যবহার করা হয় প্রচার কার্যের উদ্দেশ্য ; তারা নিজেরাই চাষীদের পাটচাষ হ্রাসের সুবিধা নিয়ে নিজেদের চাষ বাড়িয়ে নেয়।"[৩৬] বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স উৎপাদন সংকোচনের পরিবর্তে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেছিল এবং চতুরভাবে এই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে রায়তদের মনোভাবই নির্ধারক উপাদান ঃ 'রায়তরা সংকোচন নীতির প্রচারের সঙ্গে সাড়া দেয়নি এবং বপনের সময় আবহাওয়ার পরিস্থিতির দ্বারা বপনের সময় দামের দ্বারা এবং একটি বিকল্প ও একই রকমের লাভজনক ফসল পাওয়া ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হত…এটা মনে হয় যে বর্তমান সময়ে পাটের মতো লাভজনক বিকল্প কোন ফসল নেই।[৩৭] দি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স 'উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত সংকোচনের' অনুকূলে মত প্রকাশ করেছিলেন, সংকোচনের ফলে উন্মুক্ত জমিকে 'ইক্ষু, তামাক, বাদাম চিনাবাদাম, রেপসীড, ধান এবং তুলা ও গম চাষের 'জমিতে পরিণত করা যেত।[৩৮] মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স দেখিয়েছিল যে সংকোচন নীতির প্রচার ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে সাফল্য লাভ করেছিল ; সি আর দাসের প্রচারের কল্যাণে পদস্থ অফিসারদের দ্বারা সংগঠিত প্রচারের সাফল্য লাভ করার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। তারা 'নিশ্চিতভাবেই পাটের ফসলের

বাধ্যতামূলক সংকোচনের বিপক্ষে' ছিল এবং 'স্বেচ্ছাধীন নিয়ন্ত্রণের উন্নত ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন।'[৩৯]

মন্দার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে আই, জে, এম, এ পাটকলের সংকুচিত উৎপাদনের জন্য তাগিদ জানাত ; ১৯৩১ এর ২রা মার্চ থেকে মিলে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ শুরু হল (আগে তারা ৫৪ ঘণ্টা কাজ করত)। তাদের তাঁতের ১৫ শতাংশ বন্ধ ছিল। এর ফল হল কাঁচা পাটের বিপুল মজুদ যার পরিমাণ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুনে ছিল ৫,৯৫৬,০০০ বেল, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬,০৯০,০০০ বেল এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫,৯৩৫,০০০ বেল।[৪০] কিন্তু নোতুন মিলগুলি উৎপাদন সংকোচনে আগ্রহী ছিল না। এই মিলগুলি বিপুল মূলধনী ব্যয় করে শুরু হয়েছিল এবং তাদের সমৃদ্ধির বছরগুলিতে সঞ্চিত কোন আর্থিক সম্পদও ছিল না। নোতুন মিলগুলি যুক্তি দেখাত যে সংকুচিত উৎপাদনকে স্বীকার করার অর্থ মৃত্যুর আলিঙ্গনে নিজেদের সমর্পণ করা এবং আই জে এম এ থেকে অপসৃত হওয়া। দি স্টেটসম্যান তাদের মনোভাবকে 'বিকৃত ও স্বার্থ পরায়ণ' বলে বর্ণনা করে ; তারা সরকারের হস্তক্ষেপকে ত্বরান্বিত করতে বলেছেন এবং আশা করেছিল যে 'এমন একটি পরিস্থিতি হতে পারে যখন বর্তমান কালের স্বাগত সংকোচন নীতি সংগঠনের ওপর ভারী শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াবে।[৪১] ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সরকার হস্তক্ষেপ করেছিল এবং মিলগুলি একটি চুক্তিতে এসেছিল যা নোতুন মিলগুলিকে সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টার কাজ মঞ্জুর করেছিল। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটকলগুলির মুনাফা হ্রাস পেলে বঙ্গীয় সরকার ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল জুট অর্ডিন্যান্স জারী করল। এর ফলে মিলগুলির পক্ষে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা কাজ বাধ্যতামূলক হল। দি বেঙ্গল চেম্বার নিশ্চিতভাবে বলেছিল যে নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন অনিবার্যভাবে পাটের দামকে প্রভাবিত করবে ; জুট অর্ডিন্যান্সের 'আশু ফল হল কাঁচা পাটের দর উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করা।'[৪২]

এখন আমরা ভারতীয় বণিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে তাকাই। মনে হয়, তারা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান বোঝা কৃষক জনগণের ওপর পড়েছিল। কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর বলেছেন ঃ

'উৎপাদন সংকুচিত করে মিলমালিক লোকসান থেকে রক্ষা পেল, কিন্তু পাটের দর আরো হ্রাস করতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করল। সংগঠিত

আন্দোলন পরিচালিত করতে না পারায়, সাধারণ মন্দা অতি উৎপাদন এবং মাল মজুদ হবার ফলে যে লোকসান হল তার ভার গিয়ে পড়েছিল কৃষকদের ওপর।'[৪৩]

ভারতীয় বণিকরা যে সমস্যার সম্মুখীন জেলাগুলিতে ব্যবসায়ী ও মারোয়াড়ী বণিকদের ব্যবসা যার অন্তর্গত, পাট শিল্পের দিকে তাকালে তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাল পরিবহনের জন্য তাদের চড়া ব্যয় করতে হত ; পাট পরিবহনের জন্য ইণ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের যাহা খরচ ইণ্ট ইণ্ডিয়ান এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ধার্য খরচের চেয়ে বেশী ছিল। তদুপরি ভারতীয় বণিকদের বিদেশী ক্রেতার কৃপার ভরসায় থাকতে হত। ইন ভয়েস প্রথা ব্রিটিশ ফার্মগুলিকে ভারতীয় পাটের সর-বরাহ নিতে অস্বীকার করার ক্ষমতা দিয়েছিল। মিলগুলি পাটজাত দ্রব্য সামগ্রীর চড়া দাম ধার্য করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত অথচ ব্যবসায়ীদের মুনাফা ছিল অল্প।[৪৪] তারা বলেছিল যে মিলগুলি আধুনিক যন্ত্র-পাতি প্রয়োগ করে উৎপাদন খরচ কমাতে পারে। মোক্তার বার এ্যাসো-সিয়েশন (ঢাকা) বুঝেছিল যে 'কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দামের বর্তমান বিপুল ফারাক রাখার কোন যুক্তি নেই' এবং পরামর্শ দিয়েছিল যে 'ম্যানেজিং এজেণ্টের কাছে যে মুনাফা চলে যায়, তাকে অবশ্যই খুঁটিয়ে দেখতে হবে।'[৪৫] এটা অসাধারণ ঘটনা যে মোক্তারগণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বস্তুত ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতি-ষ্ঠানগুলি সস্তাদরে কাঁচা পাটের বর্দ্ধমান সরবরাহে আগ্রহী ছিল।

কিন্তু সবচেয়ে বিতর্কমূলক প্রশ্ন হল, কাঁচা পাটের ভবিষ্যৎ বাজার। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের বক্তব্য ছিল যে ভবিষ্যৎ বাজার দামের ঊর্ধ্ব ও নিম্নগতি তীব্রতর করতে বেলার ও ফাটকাবাজদের সাহায্য করেছিল। পাটচাষীদের পক্ষে যখন পাট ধরে রাখাটা বিজ্ঞোচিত হত তখন তাকে পাট বিক্রী করতে এবং যখন বিক্রী করাটা বিজ্ঞোচিত হত তখন তাকে পাট ধরে রাখতে প্ররোচিত করে বিপথচালিত করতে ভবিষ্যৎ বাজার বেলার ও ফাটকাবাজদের সাহায্য করেছিল।···দি ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস অ্যাসোসিয়েসনের যুক্তি ছিল যে ফাটকাবাজার চাষীদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। কিন্তু বেড়ে উঠছে এমন ফসল আগাম বিক্রী করে দিতে চাষীকে সাহায্য করত এবং যে সব ব্যবসায়ী ও ব্যাপারীরা মফঃস্বল বাজার থেকে কাঁচা পাট কেনে তাদেরও ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করত। অবশ্য ভবিষ্যৎ বাজার যে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার তা ভারতীয় ব্যবসায়ীরা

মেনে নিয়েছিল। বেঙ্গল জুট ডীলারস্ অ্যাসোসিয়েসন অবশ্য কাঁচা জুটের জন্য ভবিষ্যৎ বাজারের কথা বলেনি। তাদের বক্তব্য ছিল যে চাষীদের পাটের জন্য যে দাম দেওয়া হয়, তা এই বাজার কমিয়ে দেয় এবং শিল্পের পাটজাত সামগ্রী উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত অংশগুলির স্বার্থে দামের গতিবিধিকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে। বাস্তবিকপক্ষে পাটজাত সামগ্রী উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত অংশগুলি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত ছিল।

নিম্নতম দাম

এবার বাংলাদেশের গ্রামগুলির চারপাশে ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকানো যাক। গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, অশিক্ষিত, অসংগঠিত চাষী ক্ষুদ্র জমিতে পাট উৎপন্ন করত এবং ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দাক্ষিণ্যপ্রার্থী হয়ে থাকতে হত। মন্দার সময় ধান ও পাটের দাম পড়ে যাওয়ায় কৃষকরা নৈরাশ্যময় ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ যত দ্রুতভাবে সম্ভব অস্ত্রসজ্জা শুরু করে এবং প্রতিরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম ছিল বালুর বস্তা। পাটশিল্পের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির একটা যুগ ছিল আসন্ন। কিন্তু যে কৃষকদের মন্দার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল, তার দাম লাভজনক না হলে পাটের চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ বাড়াতে চাইল না। শেষ পর্যন্ত সরকার পাটের নিম্নতম দাম নির্দিষ্ট করার প্রশ্নটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বোধ করল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল জুট এনক্যোয়ারি কমিটি প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিল।

এবার পাটের বাজার এবং পাটচাষীদের ওপর তার প্রভাবের বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। পাটচাষীদের অধিকাংশই ছোট চাষী যারা তাদের উৎপন্ন ফসল বিক্রী করত ফড়িয়াদের কাছে। ব্যাপারী বা ফড়িয়ারা পাটচাষীদের বাড়ীতে গিয়ে পাট কিনে নিত; কখনও চাষীরা সবচেয়ে নিকটবর্তী হাটে পাট বিক্রী করে দিত। কেবলমাত্র "বড়ো চাষীরা নিকটতম আড়তে গিয়ে তাদের পাট বিক্রী করে।"[৪৮] ছোট চাষীদের অবস্থা বড়ো চাষীদের থেকে ভিন্নরকম ছিল। বড়ো চাষীরা পাট বিক্রী স্থগিত রাখতে পারত কিন্তু ছোট চাষীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাট বিক্রী করে দিত। ছোট চাষীরা প্রায়ই বিক্রেতাদের ধার্য করা ধলতা বা ভাতা (সাধারণত মণ প্রতি এক সের) ওজনে দিত। মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা কাশীপুর রোড, হাটখোলা, ফুলবাগান, উল্টাডাঙ্গা, শ্যামবাজার,

বাগবাজার—কলকাতার এই সব আড়তগুলি থেকে পাট কিনত। বেলের গুদামসহ কাশীপুর রোড ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার। ব্যবসায়ীরা পাটের মান নির্ধারণ করত। এরা পাটকে তিনভাগে ভাগ করত—প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী এবং পরিত্যক্ত শ্রেণী। পাটের মান নির্ধারণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাট কিনে নিয়ে মিলগুলি বিদেশে রপ্তানী করত[৪৯] চাষীরা ফসল কাটার সময়ই পাট বিক্রী করত—যখন দাম খুব অল্প থাকত। নীচের সারণী থেকে জানা যায়, ফসল কাটার সময়কালীন দামের তুলনায় কলকাতার পাটের দাম বেশী ছিল।

১২ নং সারণী

কাঁচা পাটের দাম (১৯১১-১২ থেকে ১৯৪০-৪১)

বছর	ফসল কাটার সময়ের দাম (টাকা/আনা)	কলকতার দাম (টাকা/আনা)
১৯১১-১২ থেকে ১৯২০-২১	৭— ৬	৯—১২
১৯২১-২২ থেকে ১৯৩০-৩১	৯— ৭	১২— ৬
১৯৩১-৩২ থেকে ১৯৪০-৪১	৫— ১	৬—১২

উৎস : রিপোর্ট অফ দি আই. জে. এম. এ, ১৯৪৯

উৎপাদকের অবস্থা অনুযায়ী জেলায় জেলায় পাট উৎপাদনের খরচের পরিমাণগত পার্থক্য ঘটত; উৎপাদকরা ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগ করলে ভারী মূলধনের প্রয়োজন হত। চাষী পরিবার কর্তৃক পাট উৎপাদিত হলে উৎপাদন খরচ কম হত। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স উৎপাদন খরচ মন প্রতি দু টাকা আট আনা থেকে তিন টাকা আট আনা ধার্য করেছিল; কিন্তু মৈয়মনসিংহের কালেকটর একে চার টাকার ওপরে ধার্য করেছিলেন।

উৎপাদন খরচ-এর হিসাব এই ভাবে ধরা যেতে পারে :

খাজনা	১—৮
জমিতে লাঙল দেওয়া	২—০
বীজ	০—৮ আনা
আগাছা উৎপাদন	৮—০
সার	১—৮
ফসলকাটা	১—০

জলে ভেজানো	১—০
পাট নিষ্কাসন	৪—০
রং করা	০—৮ আনা
	২০—০

প্রতি বিঘায় স্বাভাবিক উৎপাদন প্রায় ৫ মন ধরে নিয়ে মন প্রতি উৎপাদন খরচ দাঁড়িয়েছিল ৪ টাকার বেশী।[৫০] উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অধিকাংশই নিম্নতম দাম মন প্রতি ৭ টাকা করার সুপারিশ করেছিলেন। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স পাটের নিম্নতম দর বেধে দেবার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তাদের মতে পাটের বহুসংখ্যক প্রতিযোগী এবং প্যাকিং সামগ্রী হিসেবে পাটের প্রাধান্যকে উৎখাত করার চেষ্টা চলছিল।[৫১] দি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স লক্ষ্য করেছিল যে "প্রশ্নটি খুবই জটিল" যেহেতু পাট এবং চটের থলে হল রপ্তানী দ্রব্য। দি মারোয়াড়ী চেম্বার অফ কমার্স নিম্নতম দাম নির্দিষ্ট করার বিষয়টিকে 'বিবেচনাযোগ্য" মনে করেছিলেন কিন্তু এও বলেছিলেন যে এই দাম বজায় রাখা কঠিন যেহেতু পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী পণ্য। দি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স দামের নির্দিষ্ট করণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কিন্তু এই সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করেছিলেন যে এটা সরকারের পক্ষে বিপুল আর্থিক ব্যয় হয়ে দাঁড়াবে।" জুট বেলারস সংঘ অনিশ্চিত অবস্থান গ্রহণ করেছিল।[৫২] আপাতভাবে বেঙ্গল চেম্বার এবং ভারতীয় বণিকরা পাটচাষীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, এইচ এল দে ঢাকা রোটারী ক্লাবে একটি গবেষণা পত্র পাঠকালে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে পাটের নিম্নতম দাম নির্দিষ্টকরণ বাঞ্ছনীয় কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব। যদি দামকে বাজার দরের চেয়ে বাড়াতে হয় তাহলে পাট উৎপাদন সংকুচিত করতে হবে কিন্তু এটা করা যেতে পারে যখন একটি বিশেষ বছরে পাটের মোট চাহিদা সুনিশ্চিত করা যায়। নিম্নতম দাম নির্দিষ্টকরণের জন্য প্রয়োজন বৃহৎ একদল পরিদর্শকের এবং সমবায় পাট সমিতির সংগঠন যারা "লক্ষ লক্ষ ছড়িয়ে থাকা এবং ছোট চাষীদের" কাছ থেকে পাট কিনবে। খুব ভাল ফসল হলে সরকারকে অতিরিক্ত ফসল কিনে নিতে হবে: বঙ্গীয় সরকার "বিপুল আর্থিক ঝুঁকি নিতে পারবে কি না সন্দেহ। চাহিদা পড়ে গেলে অথবা দাম কমে গেলে পাট মজুদ করে রাখার

সমস্যাও ছিল। সমবায় বিক্রয় সমিতির সংগঠন গড়ে তোলা, বিভিন্ন ধরণের ফসল চাষ-এর প্রবর্তন ঋণের বোঝা হ্রাস এবং সস্তায় ঋণের ব্যবস্থার কথা দে বলেছিলেন ; তাঁর মতে পাটচাষীদের দর কষাকষির ক্ষমতাকে উন্নত করা উচিত।[৫৩]

সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলিকে কিভাবে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা যেতে পারে দে তা পরীক্ষা করে দেখেন নি। কৃষি পরিচালক বলেছেন, পাটের জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি "অতীতে সফলতা লাভ করেনি" এবং আরও বলেছিলেন যে বাজার দর চড়া না থাকলে "কোন তাথিক লাভই উৎপাদকের কাছে জমা পড়ে না।"[৫৪] সস্তা ঋণ দেবার সুপারিশ দে সঠিকভাবেই করেছিলেন। বাস্তবিকই এটা ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পাব, ছোট চাষীরা ঋণে ডুবে ছিল এবং তাদের দাদন বা অগ্রিমের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী পাটচাষীদের প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যে সমিতি ঋণ হিসেবে চাষীদের উন্নত বীজ সরবরাহ করবে, পাট জমা দিলে নগদ টাকা কিছু দেবে এবং "সেণ্ট্রাল বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সুবিধাজনক ভাবে পাট বিক্রী করবে ; ডিবেঞ্চার বিক্রী করে মূলধন বাড়ানো বেড়ে পারত এবং প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাট বন্ধক রেখে সমবায় সমিতিগুলি টাকা পেতে পারে।[৫৫]

যেহেতু "পাটের মজুদ নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে" তাই পাট অনুসন্ধান কমিটি সুপারিশ করেছিল যে পাটের চাষ কমানো উচিত হবে না। কমিটি নিম্নতম দর পাটের গুণ অনুযায়ী ৭, ৮, ৯ টাকা (প্রতি মন) সুপারিশ করেছিল।[৫৬] যে কৃষকদের জমি ক্ষুদ্র এবং যে তার সমস্ত জমিতে পাট উৎপন্ন করে, তাকে নিজের এবং পরিবারবর্গের খরচ বহন করার জন্য নিম্নতম দরের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আশ্বস্ত করা উচিত।[৫৭] মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতির মুখে এই সুপারিশের অশেষ গুরুত্ব। পাটচাষীরা বণিকদের করুণার ওপর নির্ভরশীল ছিল, লাভজনক দরের নিশ্চয়তা বিনা তারা পাট চাষ সম্প্রসারিত করতে উৎসাহ পেত না।

উৎপাদনের অবস্থা

পাট উৎপাদনে একর প্রতি বেশী শ্রমের প্রয়োজন হত। এক বিঘা জমির আগাছা নিড়ানির জন্য ৬ জন মজুর নিয়োগ করা হত। ফসল

পাকবার আগেই পাট কাটা হত এবং আছড়ে ও ঝেড়ে তন্তু বের করার আগে প্রায় তিন সপ্তাহের জন্য ডোবা, পুকুর বা ছোট নদীতে ডুবিয়ে রাখা হত। পাটের তন্তু বের করার জন্য যন্ত্রপাতি খুব কমই প্রয়োগ করা হত। তন্তুগুলি রোদে শুকোনো হত এবং গোছা করে রাখা হত। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে পাট জন্মাত এবং জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফসল কাটা হত।[৫৮] সব শ্রেণীর কৃষকরাই অর্থকরী শস্যের উৎপাদন করত যদিও বেশীর ভাগই ছিল ছোট কৃষক। আসল কথা হল, পাট উৎপাদকদের মধ্যে "বড়ো চাষী, মহাজন এবং জোতদার" ছিল। এটা লক্ষ্যণীয় যে বড়ো চাষীরা ফসল কাটার সময়ের দামে পাট বিক্রী করত না। ব্যাপকভাবে পাট চাষ করে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করেছিল। আমরা দেখব, এরা ছিল মহাজন এবং দাদন দেওয়ার সুযোগে কৃষকের ফসলের একটা অংশ আত্মসাৎ করত। নিশ্চিত-ভাবেই জোতদাররা পাট চাষ থেকে লাভবান হলেও এটা বলা কঠিন যে পাট চাষের প্রধান জেলাগুলিতে বর্গা চাষ একটা ব্যাপক পদ্ধতি ছিল কি না।[৫৯] ঢাকা, নোয়াখালি, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর নদীয়া, এবং রাজশাহীতে বর্গা চাষ কখনও বড়ো স্থান দখল করেনি। এটাও সত্য যে বর্গাদারদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের একটা ঝোঁক ছিল যার জন্য একর প্রতি কম খরচ প্রয়োজন হত। জোতদার এবং ধনীকৃষক পাট উৎপাদনে ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগ করত। পাট চাষের এলাকায় বর্গা ব্যবস্থা ব্যাপক ছিল, এর প্রমাণ খুব কমই আছে।[৬০]

পরিশোধের কঠোর নিয়মের শর্তে ছোট কৃষকরা চলতি মূলধনের জন্য ঋণ সংগ্রহ করতে বাধ্য হত। পাট চাষের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ এটাই। ছোট চাষীরা তাদের উৎপন্নের একটি অংশ বন্ধক দেওয়ার পরিবর্তে জমির মালিক ও মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিত। এভাবে জমির মালিক ও মহাজনরা চাষের কোনও খরচ বহন না করেও চাষীদের ফসলের একাংশ আত্মসাৎ করত। এবার দেখা যাক, দাদন চাষীদের কিভাবে প্রভাবিত করত। নীচে দাদনের চুক্তিপত্রের একটি অংশ দেওয়া হল :[৬১]

"আমি ভদ্রলোকটির কাছ থেকে ২৪ টাকা দাদন হিসেবে নিয়েছি এবং আমি ১২৭৯ সালে মন প্রতি ২ টাকা দরে ভাল করে শুকোনো ১২ মন পাট তার বারুইপুরের বাসগৃহে জমা দিতে রাজী আছি…আমি

চলতি বাজার দরের হিসেবে সুদসহ ১২ মন পাটের দাম দিব।

স্বাক্ষর, কার্তিক, ১২৭৯।"

কার্তিক (অক্টোবর) মাসে পাট চাষীরা যখন খুবই আর্থিক দুরবস্থার চাপে দিন কাটাত তখন তারা দাদন নিত। আপাতভাবে দাদন ছিল সুদ মুক্ত। কৃষক তার ঋণদাতার বাড়ীতে ১২ মন পাট পেঁছাতে না পারলে চাষীকে সুদ সহ ধার শোধ করতে হত। ২৪ পরগণার কৃষকরা পাট চাষের আগে ফড়িয়াদের কাছ থেকে দাদন নিত। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দাদন ছিল ২ টাকা থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত। হুগলী জরিপ হালদার রিপোর্ট করেন "সারাজীবন ধরে পাট চাষের কথা আমি জেনেছি... ২০ বছরে এটা খুবই বেড়েছে। পাট চাষের জন্য আমি কোন দাদন গ্রহণ করিনা কিন্তু মাঝে মাঝে আমি মহাজনদের কাছ থেকে ধার করি, এই মহাজনরা ঋণ পরিশোধ বাবদ ফসলের একটি অংশ চলতি দামের থেকে কিছু কম দামে নিয়ে নেয়।"[৬২] মনে হয় এটাই ছিল সাধারণ পদ্ধতি : মহাজন চলতি বাজার দর থেকে কম দামে কৃষকের উৎপন্ন ফসলের একাংশ পেত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অনুসন্ধান থেকে আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহী, ডিভিশনের সমবায় সমিতিগুলির সহকারী রেজিষ্ট্রার রিপোর্ট করেন "এক বিঘা ফসল (যা প্রায় ৫ মন) বন্ধক দেবার শর্তে বিঘা প্রতি প্রায় ৫ টাকা দাদন ব্যাপারী বা ব্যবসায়ী বা দালালদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তাদের বিনা সুদে দাদন দেওয়া হত বলে তারা কম দাম নিতে বাধ্য হত।"[৬৩]

একথা মনে হয় না যে এই ব্যবস্থা সমস্ত জেলাগুলিতে ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল অথবা সমস্ত শ্রেণীর কৃষকরা দাদন নিয়েছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পাবনার সিরাজগঞ্জের সাবডিভিসনাল অফিসার রিপোট করেন : সমস্ত চাষীরাই ফসল কাটার আগে ফসল বন্ধক দেয়না ; তাদের কয়েকজন অন্তত মারোয়াড়ী বা ব্যাপারীদের কাছে তা করে থাকে। টাকা দাদন দেওয়া হয় এই শর্তে যে গুদামে নির্দিষ্ট দামে তাই জমা দিতে হবে ; অনেক সময় পাটের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হত।[৬৪] রংপুরে কৃষকরা "বহুক্ষেত্রে ফসল কাটার আগেই শস্য বন্ধক রাখে বা বিক্রী করে।" ২৪ পরগণা জেলার পাট উৎপাদনের একটি প্রধান এলাকা বারাসাতে উৎপাদকদের "প্রকৃতপক্ষে ফসল বন্ধক দিতে হত।"[৬৫] জলপাইগুড়িতে কৃষকরা এই শর্তে দাদন নিত যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট ব্যবসায়ীদের দিতে

হবে।[৬৬] ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল চেম্বার এবং ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার পাট অনুসন্ধান কমিটির কাছে সাক্ষ্যদান কালে বলেন যে ব্যবস্থাটি কমে আসছে, বিশেষতঃ কৃষিগত ঋণ আইন পাশ হওয়ার সময় থেকে।[৬৭] কিন্তু এটা মনে হয় কম করে বলা হল ; বহু জেলায় ব্যবস্থাটি আগের মতই চলতে লাগল। ঢাকাতে চাষীরা "জমিতে যাদের সুবিধাজনক স্বার্থ" ছিল, তাদের কাছে ফসল বন্ধক দিত।[৬৮] মুর্শিদাবাদে কৃষকরা "কিছু মাত্রায়" ফসল বন্ধক দিত। বগুড়ায় কৃষকরা ২ শতাংশ ফসল মহাজন ও আড়তদারদের কাছে বন্ধক দিত। ফরিদপুরে চাষীরা "খুব নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত মহাজন ও পাটের কারবারীদের কাছে বন্ধক দিত।" কৃষি পরিচালক বলেছিলেন যে বন্ধকের ব্যবস্থা "একটা নির্দিষ্ট মাত্রায়" বাংলার জেলাগুলিতে চালু ছিল। খুলনায় কৃষকরা "মহাজনের কাছে কিছু মাত্রায়" ফসল বন্ধক দিত।[৬৯] সরকারী কর্মকর্তারা রিপোর্ট করেছিলেন যে বন্ধকের ব্যবস্থা মৈমনসিংহ এবং নোয়াখালি জেলায় প্রসারিত হয়নি।[৭০]

একর প্রতি উৎপাদনের প্রশ্ন আলোচনাকালে কারিগরী সংক্রান্ত পরিবর্তনের গুরুত্বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নীচের সারণী থেকে দেখা যাবে কয়েক বছর ধরে একর প্রতি উৎপাদন কম হয়েছিল। একর প্রতি স্বাভাবিক উৎপাদন বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন পরিমাণ হয়েছিল ; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাট উৎপাদন এলাকা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, রংপুর, ত্রিপুরাতে যা ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রদেশের উৎপাদক এলাকার ৬৫.৬ শতাংশ ছিল।[৭১] কৃষিপরিচালকের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে একর প্রতি স্বাভাবিক উৎপাদন ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ছিল ৩.৭ বেল, রাজসাহী বিভাগে ৩.৫ বেল এবং প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে ৩.২ বেল।[৭২] মনে হয় যে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একর প্রতি পাট উৎপাদন কমে গিয়েছিল।

১৩ নং সারণী

পাট উৎপাদনের প্রবণতা (১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩৭-৩৮)

বছর	একর প্রতি উৎপাদন (বেল)
১৯২৭-২৮	৩.৭
১৯২৮-২৯	৩.৬
১৯২৯-৩০	৩.৬

১৯৩০-৩১	৩'৩
১৯৩১-৩২	৩'৬
১৯৩২-৩৩	৩'১
১৯৩৩-৩৪	৩'২
১৯৩৪-৩৫	৩'১
১৯৩৫-৩৬	৩'০
১৯৩৬-৩৭	৩'২
১৯৩৭-৩৮	৩'০

উৎস ঃ কেন্দ্রীয় পাট কমিটির রিপোর্ট, (১৯৪০)

একথা মনে হয় না যে সরকার পাট উৎপাদনের উন্নতি সাধনের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ১৯০৪ খৃীষ্টাব্দে ফিন্‌লো তন্তু বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত হলে উন্নত মানের বীজ নিয়ে পরীক্ষা চালানো হল এবং 'কাক্যা বোম্বাই' নামক বিশেষ ধরণের বীজে ভাল ফসল পাওয়া গেল।[৭৩] কৃষকরা এই বীজ ব্যবহার করেছিল কি না তা আমাদের জানা নেই। ১৯৩৮ খৃীষ্টাব্দের পাট অনুসন্ধান কমিটি উন্নত বীজ ব্যবহার, বীজের পারস্পরিক বদল, সযত্ন সার প্রয়োগের এবং সুপারিশ করেছিলেন। কৃষি পরিচালক দেখিয়েছিলেন যে উৎপাদকরা এত গরীব যে উন্নত বীজ বা খামারের সার ছাড়া বেশী পরিমাণ সার ব্যবহার করতে পারে না।[৭৪] এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার পাট কমিটি কৃষকদের সুলভে ঋণ দান সম্পর্কে এইচ এল দের পরামর্শকে খুব কমই গুরুত্ব দিয়েছিল, এই কৃষকদের ঋণের জন্য ব্যবসায়ী বা মহাজনদের ওপর নির্ভর করতে হত। তৎসত্বেও ১৯৩০ খৃীষ্টাব্দের দশকগুলিতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল যদিও একর প্রতি উৎপাদনের গতি ওঠানামা করেছিল।

১৪ নং সারণী

গড়	একর (০০০)	৪০০ পাউণ্ডের বেল (০০০)
১৯৩২-৩৩ থেকে		
১৯৩৬-৩৭	২,৪৭৯	৮,০৭৭
১৯৩৭-৩৮	২,৮৮৮	৮,৬৮০
১৯৩৮-৩৯	৩,১৬৪	৬,৮৪৪
১৯৩৯-৪০	৩,১১৮	৯,৬৪৬

উৎস ঃ কেন্দ্রীয় পাট কমিটির রিপোর্ট (১৯৪০)

এটা ভাবা ভুল যে নীল চাষের এবং পাট চাষের পারিবারিক সাদৃশ্য ছিল ; এটা সত্যি যে বাঙলা দেশের অনেক জেলায় ছোট চাষীদের পক্ষে ফসল বন্ধক দেওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তারা ফসলের একটা অংশ বন্ধক দিত কৃষকদের মধ্যে পাট চাষের একটা ঝোঁক ছিল এবং ১৯৩০ এর দশকগুলিতে সরকার পাট উৎপাদন সংকুচিত করার যে প্রচার করেছিল, চাষীরা তাতে খুব কমই সাড়া দিয়েছিল। ফসল কাটার সময় খুব কম পাট বিক্রী করত, এমন ধনী কৃষকরা নিশ্চিতভাবেই বাণিজ্যিক কৃষি থেকে উপকৃত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, গ্রামীণ বাঙলার শক্তিশালী উপাদান হিসেবে ধনী কৃষকদের উত্থানের ব্যাপারটি বাণিজ্যিক কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩·৩ মিলিয়ন একর জমি ছিল পাট চাষের আওতাভুক্ত ; দেশবিভাগের পর পশ্চিম বাঙলায় পাট চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

পাটের বাজার নিয়ন্ত্রিত হত আই জে এম এ এবং ভারতীয় ব্যবসায়ী-দের দ্বারা যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল মারোয়াড়ী এবং মুসলমান ব্যবসায়ী। বিশেষত মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স এর প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন আদমজী হাজী দাউদ এবং এম এ ইস্পাহানী। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল পাটের দরকে নীচের দিকে রাখা।[৭৫] তাৎপর্যের বিষয় বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এবং ভারতীয় বণিকরা পাটের নিম্নতম দাম নির্দিষ্টকরণের বিরোধিতা করে। যেখানে দাম কমিয়ে রাখার ব্যাপারে মিল মালিক ও বণিকদের একটা সাধারণ স্বার্থ ছিল, সেখানে বড়ো চাষীরা, জোতদাররা এবং মহাজনরা 'লাভজনক দাম পেতে আগ্রহী ছিল, এমন সাক্ষ্য প্রমাণ খুব কমই আছে। দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা যতদিন ছিল ততদিন তারা চাষের খরচ বহন না করেও চাষীর উৎপন্ন ফসলের একাংশ পেত।[৭৬]

বছরের পর বছর পাট চাষ করে বণিক শ্রেণী বিত্তবান হয়েছিল। মনে হয়, পাট ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলিতে বণিক এবং মহাজনী পুঁজির বিশেষ সাফল্য কৃষি উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগকে ব্যাহত করেছিল। বাণিজ্যিক কৃষির আলোচনায় শুধুমাত্র ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত অবস্থার ওপর আলোকপাত করলে চলবে না, বণিক ও মহাজনী পুঁজির ভূমিকার ওপরেও তা করতে হবে ; কারণ, বণিক ও মহাজনদের আচরণের ধরণ বাঙলার উৎপাদনের পুরানো পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছিল।

নির্দেশিকা

১। সেন, ইকনমিক পলিসি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (১৮৪৮—১৯৩৯), পৃ—২-৩।

২। মরাল অ্যান্ড মেটেরিয়াল প্রগ্রেস রিপোর্ট (১৯৩০-৩১)।

৩। বোম্বাই : ফিনান্সিয়াল প্রসিডিংস (মার্চ ১৮৬৫); এ ছাড়াও গ্রীণবার্গ, ব্রিটিশ ট্রেড অ্যান্ড দি ওপেনিং অফ চায়না, ১৯৫১।

৪। সেন (সম্পাদিত) এড মন্ড বার্ক অন ইন্ডিয়ান ইকনমি, ১৯৬৯, পৃ—১০।

৫। চৌধুরী, গ্রোথ অফ কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার ১৯৬৪, পৃ—৫৮।

৬। রয়াল কমিশন অন ওপিয়াম, ৫ খন্ড, চৌধুরী পূর্বোল্লিখিত পৃ—৭১। ১৮৯০ এ বিহারে পপি চাষের অধীন এলাকা ছিল ৩·৯ লক্ষ একর এবং বারাণসীতে ছিল ৩·৭ লক্ষ একর।

৭। পালিত, টেনসনস ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি (১৮৩০-৬০) ১০৭৫, পৃ—১০৬ ১০৭।

৮। ললিত মিত্র, হিস্ট্রি অফ ইন্ডিগো ডিসটার বেন্সেস, ১৯০৬ ; মিত্রের পিতা হলেন নীল দর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্র।

৯। চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১২৫

১০। রিপোর্ট অফ ইন্ডিগো কমিশন, মিনিট্স অফ এভিডেন্স (১৮৬০)

১১। ঐ।

১২। ঐ, ১৮৩০ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত ৪৯ টি খুন, অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি, লুণ্ঠন এবং এর ঘটনা ইডেন উল্লেখ করেন। ফাগুর্সন লক্ষ্য করেছিলেন যে নদীয়াতে নীল চাষ মোট জমির ৫ শতাংশের বেশী দখল করে থাকেনি।

১৩। ঐ।

১৪। ঐ।

১৫। ইডেনের সাক্ষ্য। ঐ।

১৬। মিত্র, পূর্বোল্লিখিত।

১৭। ইডেনের সাক্ষ্য, পালিত এ উল্লিখিত, পৃ—১৪৭।

১৮। গিরিশ মিশ্র, ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টেসন অ্যান্ড দি অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেসনস্ ইন চম্পারণ ; ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ, ডিসেম্বর ১৯৬৬ ; এ ছাড়াও চৌধুরী পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৩৬-৩৭। পালিত, পূর্বোল্লিখিত পৃ—১৫০।

১৯। কটন, হ্যান্ডবুক অফ কমার্শিয়াল ইনফরমেশন, ১৯২৪, পৃ—১১৩, পাটের প্রধান ক্রেতারা ছিল ইংল্যান্ড, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা, ইটালী এবং স্পেন।

২০। কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৩০।

২১। উনিশ শতকে ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্মগুলি পাটের ব্যবসায়ে রতছিল, সেন, ইকনমিক পলিসি, পৃ—৯৬, ৯৭ দ্রষ্টব্য।

২২। ব্যানার্জি, ক্যালকাটা অ্যান্ড ইট্স্ হিন্টার ল্যান্ড (১৮৩৩-১৯০০), ১৯৭৫, পৃ—১৯৬৫-৬৬ ; এ ছাড়াও টিমবার্গ, ইন-ডাষ্ট্রিয়াল আনট্রেপ্রেনিয়র-সিপ্ অ্যামং দি ট্রেডিং কমিউনিটিস অফ ইণ্ডিয়া ১৯৬৯।

২৩। বেঙ্গলী, ১১ই অক্টোবর ১৯০৮। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এর কয়েকজন সদস্য ছিলেন পাটের ব্যবসায়ী।

২৪। কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১১১।

২৫। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ারস দ্রষ্টব্য।

২৬। ভি অ্যানষ্টে, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, এল, এস এস ও ম্যালিতে, পূর্বোল্লিখিত পৃ—২৮৮। অ্যানষ্টে লিখেছেন যে বিশ্বমন্দা ঋণগ্রস্ততার সমস্যাকে তীব্র করেছিল।' এই সময়ের জমি হস্তান্তরের বিষয়টি ২য় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

২৭। মরাল অ্যাণ্ড মেটেরিয়াল প্রগ্রেস রিপোর্ট (১৯৩২-৩৩)।

২৮। ১৯৩২-৩৪ এ বাঙলায় ফসল কাটার সময়ে পাটের মনপ্রতি দাম ছিল : ঢাকায় ৩.৯ আনা ; ফরিদপুরে ৩.৪ আনা ; রাজশাহীতে ৩.৬ আনা ; রঙ্গপুরে ৩.৪ আনা, ২৪ পরগণায় ৪ টাকা, রিপোর্ট অফ দি সেণ্ট্রাল জুট কমিটি (১৯৪০)।

২৯। ঐ।

৩০। রিপোর্ট অফ বেঙ্গল জুট এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩৪)

৩১। ষ্টেটসম্যান, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩। ১৯২৯ এর তুলনায় চালের দাম ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছিল। প্রধানত স্থানীয় ভোগের জন্য চাল উৎপন্ন করা হত, উচ্চমানের চাল, যা ছিল উৎপাদনের ৫ শতাংশ, তার আমদানী প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৩২। ষ্টেটসম্যান, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩০।

৩৩। রিপোর্ট অফ দি বেঙ্গল জুট এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩৮), দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৪১।

৩৪। ঐ।

৩৫। ঐ, সাক্ষ্য এস কে দে, অ্যাডিসনাল কালেকটর, ঢাকা।

৩৬। ঐ, এভিডেন্স অফ এম এম বসু, আই সি এস, বসু লিখেছিলেন যে চাষীরা প্রায়ই নিয়মমত পাট চাষ করে; জলপ্লাবিত অঞ্চল পাটচাষের জন্য অধিকতর উপযোগী।

৩৭। ঐ। এভিডেন্স অফ চেম্বার অফ কমার্স।

৩৮। ঐ।

৩৯। ঐ।

৪০। রিপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (১৯৪০)।

৪১। ষ্টেটসম্যান, ১৬ই এপ্রিল ১৯৩২। এই পত্রিকা মিলমালিকদের "গলাকাটা প্রতিযোগিতায়" প্রবৃত্ত হবার বিরুদ্ধে সাবধান করেছিল।

৪২। জুট এনকোয়ারি (১৯৩৮)। এভিডেন্স অফ বেঙ্গল চেম্বার।

৪৩। ঐ এভিডেন্স অফ দি ডিরেকটর অফ এগ্রিকালচার বাঙলা।

৪৪। ঐ। এভিডেন্স অফ বেঙ্গল চেম্বার ও কমার্স অ্যান্ড মারোয়াড়ী চেম্বার অফ কমার্স।

৪৫। ঐ।

৪৬। ঐ।

৪৭। ঐ।

৪৮। ঐ। এভিডেন্স অফ ডিষ্ট্রিকট ম্যাজিষ্ট্রেট, বগড়া।

৪৯। ঐ। এভিডেন্স অফ জুট বেলারস্ অ্যাসোসিয়েসন।

৫০। ঐ।

৫১। ঐ।

৫২। ঐ।

৫৩। ঐ। ১৯৩৮ এর ২৭শে জুন ঢাকার রোটারী ক্লাবে পঠিত রচনা।

৫৪। ঐ

৫৫। ঐ। এভিডেন্স অফ মৌলভী আনোয়ার হোসেন, অ্যাসিটান্ট রেজিস্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিস, রাজসাহী মালদা ডিভিসন।

৫৬। রিপোর্ট অফ বেঙ্গল জুট এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩৮), ১ম খণ্ড, ১৯৪০, পৃ...৭৪।

৫৭। ঐ কমিটি লক্ষ্য করেছিল যে পাট হল বাঙলার "একচেটিয়া অর্থকরী ফসল", যদি পাটের সবচেয়ে ভাল দামের বিষয়টি পাট উৎপাদকদের কাছে নিশ্চিত করতে হয় "তাহলে এর দাম "সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।"

৫৮। কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১১১। এছাড়াও মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯১৪)।

৫৯। ভরদ্বাজ লিখেছেন ঃ 'অধিকাংশ প্রজা পশ্চিম বাঙলায় বর্গাদারী বা ভাগচাষের ব্যবস্থায় পাট উৎপন্ন করে।" কে, ভরদ্বাজের 'প্রোডাকসন কণ্ডিসনস ইন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার ১৯৭৪, পৃ ৫৯ দ্রষ্টব্য। এটিকে মনে হয় একটি ঢালাও বিবৃতি। যে সমস্ত অঞ্চলে ভাগচাষের ব্যবস্থা খুব ব্যাপক ছিল না সেই রকম মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়াতে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে পাট চাষ বিস্তৃতি লাভ করছে।

৬০। সরকারী রিপোর্টে ভাগচাষের ব্যবস্থায় পাট চাষের প্রসার সম্বন্ধে সাক্ষ্য খুব কমই আছে। যা হোক, এটি বাস্তব সত্য যে উত্তর বাংলায় একটি বড়ো অংশে বর্গা চাষ হত ; পাটচাষের আওতাধীন এলাকা ১৯০১—০২ এ ২২,০০০ একর থেকে ১৯১১—১২ তে প্রায় ৪০,০০০ একরে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রায়তরাই পাট উৎপন্ন করত। ও ম্যালি, মুর্শিদাবাদ, ১৯১৪।

৬১। এইচ সি কর, রিপোর্ট অন দি কালটিভেসন অফ অ্যাণ্ড ট্রেড ইন জুট ইন বেঙ্গল (১৮৭৩), বাঙলা তর্জমা ব্যানার্জির লেখায় উদ্ধৃত করা হয়েছে, পূর্বোল্লেখিত, পৃ—২০৭।

৬২। ঐ, এ ছাড়াও ব্যানার্জি, পূর্বোল্লিখিত পৃ—৮৮-৯০।

৬৩। রিপোর্ট অফ জুট এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩৩), ২য় খণ্ড, ১৮৩৪।

৬৪। রিপোর্ট অফ জুট এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩৩), ২য় খণ্ড, ১৯৩৪।

৬৫। ঐ, এভিডেন্স অফ কে কে হাজরা।

৬৬। ঐ, এভিডেন্স অফ মৌলভী তামিজুদ্দিন আহ্‌মেদ।

৬৭। রিপোর্ট অফ জুট এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩৮), ২য় খণ্ড, এভিডেন্স অফ বেঙ্গল চেম্বার অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার।

৬৮। ঐ।

৬৯। ঐ।

৭০। ঐ।

৭১। রিপোর্ট অফ সেণ্ট্রাল জুট কমিটি (১৯৪০), পৃ—১৪।

৭২। রিপোর্ট অফ জুট এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩৮), এভিডেন্স অফ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স।

৭৩। এন সি চৌধুরী, জুট ইন বেঙ্গল, ১৯০৮।

৭৪। রিপোর্ট অফ জুট এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩৮)। এভিডেন্স অফ ডিরেকটর অফ এগ্রিকালচার। বগুড়া কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাংকের ডেপুটি চেয়ারম্যান জমি খন্ডীকরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

৭৫। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন দেখিয়েছিল যে পাটকলগুলি 'অব্যবহার্য ও জীর্ণ হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি' খুব কমই বদলাত, এবং বিস্তর মুনাফা করত।

৭৬। রজত এবং রত্না রায় লিখেছেন যে মহাজনী এবং বর্গপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক প্রভাব এবং অর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত ছিল "অপরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা," পাটের বাজারে একদিকে ছিল চাষীদের পাট আটকে রাখবার অক্ষমতা, অপর দিকে ছিল পাট ক্রেতাদের অসাধারণ শক্তিশালী সংগঠন। "ডিনামিকস অফ কণ্টিনিউটি ইন রুরাল বেঙ্গল, ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিষ্ট্রি রিভিউ," ১০ম খণ্ড, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য। মুখার্জি বলেছেন, পাটের বাণিজ্য

থেকে লাভের বেশীর ভাগ চলে যায় পাটকলগুলির হাতে যাদের প্রতিনিধি রপ্তানীতে নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলি। মুখার্জি, ইম্পিরিয়ালিজম ইন এ্যাকসন থ্রু এ মারক্যানটিলিষ্ট ফাংকসন।. এসেস ইন অনার অফ এস সি সরকার, ১৯৭৬।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার ঃ ২

বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তৃতির বিষয়টি পরীক্ষা করার সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈদেশিক বাণিজ্যের কল্যাণে তুলো একটি বাণিজ্যিক ফসলে পরিণত হয়েছিল। ইউরোপের তুলোর চাহিদা মেটাত প্রধানত আমেরিকা ও ভারতবর্ষ। গঠিত হওয়ার পর থেকেই বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স একর প্রতি তুলা উৎপাদন করার গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিল।[১] ১৮৫০ এর দশকেই ব্রিটিশ পুঁজির কিছু অংশ ভারতীয় রেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। রেল নির্মাণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নাগপুর, বেরার, গুজরাট ও দক্ষিণ মারাঠা অঞ্চল থেকে তুলো ব্যবসায়ের কেন্দ্র কোলাবায় তুলো আনা হত। বাঙলায় আই জে এম এ পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। বোম্বাইতে যদিও ব্রিটিশ ফার্মগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী স্থান দখল করেছিল তথাপি সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে ভারতীয় বণিকদের পুঁজি এগিয়ে চলেছিল। গুজরাটি ও মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশ ফার্মগুলির কাছ থেকে তুলা কিনে পশ্চাতভূমিতে ব্যবসা পরিচালনা করত ; বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান গুলির মাধ্যমে তারা তুলো রপ্তানী করত। পার্শীরা বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং চীন ও ইংল্যাণ্ডে বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করেছিল।[২] ব্যবসা মারফৎ পাওয়া মূলধনের অধিকাংশই বস্ত্রশিল্পে পুনর্বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ভারতীয় মূলধনের দ্বারা গঠিত সুতীবস্ত্র শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তুলো চাষ একটি বড়ো উদ্দীপনা লাভ করেছিল এবং দেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষত বোম্বাই, সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে প্রসারিত হয়েছিল। যদিও তুলোর একটা সম্প্রসারণশীল আভ্যন্তরীণ বাজার ছিল। এর একটা বড়ো রপ্তানী বাজারও ছিল। ১৯২০ দশকে ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানীকৃত কাঁচামালের ৪১ শতাংশ ছিল তুলো।[৩]

বোম্বাই থেকে রপ্তানীকৃত তুলোর সারণী থেকে রেলের যুগ আসার আগে তুলোর ক্রমবর্দ্ধমান বাণিজ্যের পরিমাণকে বোঝা যায়। তুলোর দাম

ওঠানামা করছিল এবং একজন সমসাময়িক লেখক বলেছেন যে এটা "গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার আর্থিক বাজার এবং দুই দেশের ব্যাংকের কাজকর্মের" জন্য ঘটেছিল।[৪] যেখানে ভারতীয় তুলোর দাম ছিল এক পাউণ্ডে ১·৫ পেন্স (উৎপাদনের কম খরচ প্রকাশ করে), লিভারপুলে তা বিক্রী হত ৩·৫ পেন্সে। যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা হল কৃষকরা বিশ্ব বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, সে আর বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল না।

১৫ নং সারণী

তুলা রপ্তানী (১৮৪০ থেকে ১৮৪৪)

বছর	ব্রিটেনে পাউণ্ড	চীনে পাউণ্ড	পেন্সের হিসেবে পাউণ্ড প্রতি গড় দাম
১৮৪০-৪১	৮১,৫৮১,৬৮৮	৩৩,৭১১,০৪৯	৩·৪৯
১৮৪১-৪২	১০৪,৭৯৫,০৯১	৪৭,৪০৯,৪৬৪	৩·০৯
১৮৪২-৪৩	৬৯,৮৩৯,৯১৪	৭৬,৪৪৪,৭৪৪	২·৯৫
১৮৪৩-৪৪	৯১,৭৮১,৮২৮	৭৭,৫৫১,৪১০	২·৮৩
১৮৪৪-৪৫	৬২,২৯৬,৯৫৪	৬৮,৮১২,৮১৪	২·৬২

উৎস ঃ বম্বে কটন রিপোর্টস, ট্র্যাক্টস, ভল্যুম ৩৬৬

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুখ্য রপ্তানী দ্রব্য হিসেবে আফিমের স্থান গ্রহণ করল তুলো। ১৮৫৩-৫৪ এবং ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই থেকে তুলো রপ্তানীর সাধারণ দাম ছিল ৩ কোটিরও বেশী।[৫] আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-৬৫) তুলো ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব তেজীভাব দেখা গিয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লিভারপুলে তুলোর দাম পাউণ্ড প্রতি ৮ থেকে ১৫ পেন্সে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুলো চাষের আওতাধীন এলাকা ১৮৬০-৬১ র ১,০০২,১৯৬ একর থেকে ১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২,১৭১,৮৪৮ একরে পরিণত হয়েছিল।[৬] বিপর্যয় এসেছিল ১৮৬৬ খ্রীষ্টব্দে যা বোম্বাইকে আঘাত করেছিল। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল যে কয়েক বছরের মধ্যেই বোম্বাই এই ধরণের বড়ো বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছিল। ভারতীয় তুলো জাপানে নোতুন বাজার দেখতে পেয়েছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের দশকগুলিতে ভারতীয় তুলো জাপানী তুলাকে স্থানচ্যুত করতে আরম্ভ করল যার উৎপাদন দ্রুতভাবে কমছিল।[৭] ইয়ুরোপ ও

জাপানে আরও তুলো রপ্তানী করে এবং বস্ত্রশিল্পের কারখানা গড়ে তুলে বোম্বাই চরম বিপর্যয় থেকে সরে আসতে পারল। ১৮৬৯ এ সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হল এবং ১৮৭৩ এ বোম্বাই পোর্ট ট্রাস্ট তৈরী হল। ১৮৭৭ এর মধ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ৫১টি বস্ত্রশিল্পের কারখানা গঠিত হয়েছিল।[৮]

এটা ভাবা ভুল যে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় তুলোর দর বৃদ্ধি সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের উপকার করেছিল।[৯] ছোট চাষীরা দাদন পেত ওয়াকারিয়া অথবা মহাজনদের কাছ থেকে এবং সম্ভবপর নিম্নদামে তাদের উৎপন্নকে জমা দিতে হত। ১৮৪১ এ দি বোম্বাই চেম্বার অফ কমার্স রিপোর্ট করেন যে, ওয়াকারিয়া ও গ্রামীণ বানিয়ারা রায়তদের দাদন দিয়েছিল "যাতে তারা তুলোর বীজ বপন করতে পারে, এবং ধার্য দাম মেটাতে পারে, সর্বদাই ঘন ঘন তাদের ফসল পাকার আগেই এমন কি কখনও বোনার আগেই কিনে নিয়ে।"[১০] ফোরবেস রোয়লে ১৮৫৭ এ লিখেছিলেন যে রায়তরা মহাজন বা তুলোর ব্যবসায়ীর কাছে নিঃসহায়ভাবে বন্ধনদশায় আবদ্ধ থাকত এবং তার উৎপাদিত তুলোকে নিম্নতম দামে কিনে নেওয়া হত।[১১] প্রায়ই দামের ওঠানামা দেখা যেত এবং দামের অনিয়মিত অবস্থাই ছিল ভারতীয় তুলোর তুলনামূলকভাবে স্বল্প সরবরাহের বড়ো স্থায়ী কারণ।"[১২] রায়তদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় ছিল খাদ্যশস্যের উৎপাদন, তুলো গাছ খুব নরম বলে প্রায়ই জন্মাত না এবং কৃষকদের মধ্যে সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে তুলো চাষের পরিবর্তে আখচাষেয় একটা প্রবণতা ছিল। কয়েক বছর ধরে একর প্রতি উৎপাদন ছিল অল্প, আমেরিকায় যেখানে ২০০ থেকে ৩০০ পাউণ্ডের (একর প্রতি) সেখানে ভারতে ৬০ থেকে ৮০ পাউণ্ড উৎপাদন ছিল।[১৩] দাক্ষিণাত্যে আমেরিকান তুলো উৎপাদনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ লয়েছিল, আবহাওয়ার শুষ্কতা প্রধান কারণ বলে মনে হয়।[১৪] কৃষকরা ঋণে ডুবে ছিল এবং নোতুন কারিগরী পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রবণতা তাদের মধ্যেই খুব কমই দেখা যেত।

একজন সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী পশ্চিম ভারতের তুলোর ব্যবসার হুবহু বর্ণনা দিয়েছেন, বণিকী মূলধন তুলোর চাষে কিভাবে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল—এ তথ্য তার বর্ণনাতে সুস্পষ্ট ঃ

"স্বদেশে তুলার বিপুল অংশ উৎপন্ন হত যার পরিমাণ ছিল ৭৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই তুলা গ্রামীণ বানিয়ার হাত থেকে

বোম্বাই এজেন্টদের কাছে যেত, যারা বর্ষার পরেই কেনার জন্য সেখানে আসত। তারা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলোর সরবরাহের জন্য দালালদের কাছে টাকা দাদন রেখে দিত। এভাবে বানিয়া বা ব্যবসায়ীদের যে অর্থ অগ্রীম দেয়া হল, তাদের দ্বারা রায়তদের দাদন দেওয়া হত···সরকারী রাজস্বের যে প্রথম কিস্তি রায়তদের কাছে দাবী করা হত। বানিয়ারা সতর্কভাবে তার জন্য অপেক্ষা করে; যখন যে চতুরভাবে তার তুলো কেনার আগ্রহকে গোপন রাখে এবং রায়তদের স্বার্থ দেখার ভান করে তখন তাকে সরকারী দেনা পরিশোধ করতে টাকা দাদন দেয়। এই বন্দোবস্তের পরিবর্তে চলতি বাজার দরের থেকে ১½ এমন কি ২ টাকা কমে তাকে ধার্য করা নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলো সরবরাহ করার একটা চুক্তি রায়তের ওপর চাপিয়ে দেয়··· বানিয়ার সম্পূর্ণ মুনাফা ২৫ শতাংশে নিরাপদে গণনা করা যেতে পারে। ···এই ধরণের জিনিষ বৃহৎ পরিমাণে রায়তদের দারিদ্র্যর জন্য ঘটে, যা একটি অনুকূল সুযোগ আসা পর্যন্ত ফসল ধরে রাখতে তাদের বাধা দেয় এবং এমন কি তোলার আগেই তুলো বিক্রী করতে তাদের বাধ্য করে, এবং এমন একটি দামে যা সময় এবং শ্রমের দিক থেকে উৎপাদককে লাভবান করে তোলে না।"[১৫]

যদিও ছোট চাষীরা তুলোর জন্য লাভজনক দাম পেত না তবুও বস্ত্র শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তুলো চাষের আওতাধীন এলাকার পরিমাণ বেড়েছিল। আপাতভাবে বড় বড় ভূস্বামী ও ধনী কৃষকরা তুলো চাষে আগ্রহী ছিল। ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে বস্ত্র শিল্পের কারখানা ছিল ২৮৯টি যার ২০০ টি ছিল বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে। ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্র দ্রব্যের আমদানী উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল যা ভারতীয় কারখানাগুলিতে উন্নত মানের সুতির কাপড় তৈরী করায় উৎসাহ যুগিয়েছিল। শুল্ক নীতিও বস্ত্র শিল্পকে এক ধরণের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। ১৯১৭ এ বস্ত্রদ্রব্য ৫'৭ শতাংশ সাধারন হারের শুল্কের আওতায় এসেছিল যখন "একসাইজ" কর ৩'৫ শতাংশ হারের পুরানো স্তরে ছিল। ১৯২১ এ আমদানীর সাধারন হার ১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। "কটন একসাইজ" ১৯২৫ এ শীতকালে স্থগিত রাখা হয়েছিল এবং ১৯২৬ এ এই কর তুলে নেওয়া হল যখন বাজেট উদ্বৃত্ত হয়েছিল।[১৬] পরবর্তী সারণীতে ১৯১৮ থেকে তুলো চাষের আওতাধীন এলাকা এবং উৎপাদন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে বস্ত্র শিল্প সংরক্ষণ

পাওয়ার পর থেকে তুলো চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের মন্দা শুরু হওয়ার পর চাষের এলাকার পরিমাণ কমে গিয়েছিল।

১৬নং সারণী

তুলো চাষের এলাকা এবং উৎপাদন (৪০০ পাউণ্ড তুলোর বেল)

(সিন্ধু ও অন্যান্য ভারতীয় রাজ্য সহ বোম্বাই)

বছর	এলাকা (একর)	উৎপাদন
১৯১৮-১৯	৬,৬৭৮,০০০	৮৩৬,০০০
১৯১৯-২০	৬,৯৭০,০০০	১,৭১৬,০০০
১৯২০-২১	৬,৭৫৫,০০০	১,০৯৬,০০০
১৯২১-২২	৫,২৭৬,০০০	১,২২২,০০০
১৯২২-২৩	৫,৮৪৭,০০০	১,৩৫১,০০০

উৎস ঃ কটন পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১২৩

যেহেতু ব্রিটিশ শিল্পপতিরা দীর্ঘ আঁশের ভারতীয় তুলার জন্য চেঁচামেচি করত তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমেরিকান তুলা উৎপাদনের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে লাগল। কিন্তু প্রধানত গুজরাটে ও দক্ষিণ মারাঠা অঞ্চলে দীর্ঘ আঁশের তুলা উৎপাদনে সাফল্য লাভ করা গিয়েছিল ; উত্তর গুজরাটে ৬/৮ থেকে ৩/৮ ইঞ্চি পর্যন্ত। ধোলেরা জাতীয় তুলো উৎপন্ন হত এবং দক্ষিণ গুজরাটে ৩/৮ ইঞ্চির ব্রোচের তুলা উৎপন্ন হত।[১৭] ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রোচের তুলা চাষের অধীন আনুমানিক এলাকা ছিল ২.৪ মিলিয়ন একর খান্দেশ ও সিন্ধুতে প্রধানত ছোট আঁশের তুলা উৎপন্ন হত। মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদে, রাজপুতানায় এবং আজমীর মারোয়াড়ে দীর্ঘ আঁশের তুলা খুব কমই উৎপন্ন হত।[১৮]

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাঞ্জাবেই আমেরিকান তুলো চাষের আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধির একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। যদিও আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় থেকে তুলো চাষ উদ্দীপনা লাভ করেছিল, তথাপি প্রধানত ছোট আঁশের তুলো উৎপন্ন হত এবং আমেরিকান তুলো উৎপাদনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। একমাত্র ১৯২৭-২৮ ছাড়া ১৯২১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুকূল ছিল ; ঐ সময়ে তুলো চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৯] এখন আমরা দেখতে পাব যে জলসেচ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনে দিয়েছিল।

৭৫ শতাংশ তুলো ক্ষেত জলসেচের আওতাভুক্ত ছিল। আমেরিকান তুলোর জন্য উচ্চস্তরের শ্রম নিয়োগ এবং একর প্রতি উঁচু হারে নগদ টাকা প্রয়োজন হত ; কিন্তু দেশী তুলোর উৎপাদনে খরচ ছিল কম।

পরবর্তী সারণীতে দেখা যায়, আমেরিকান তুলোর তুলনায় দেশী তুলোর চাষ বৃহত্তর। তথাপি ১৯২২ থেকে আমেরিকান তুলা চাষের এলাকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৭নং সারণী

পাঞ্জাবে তুলা চাষের এলাকা (১৯১২-১৩ থেকে ১৯৩০-৩১)

(একর)

বছর (১)	দেশীতুলা (২)	আমেরিকান তুলা (৩)
১৯০১-০২	১,০৮০,২০০	—
১৯১২-১৩	১,৪৪২,৯২৯	—
১৯১৩-১৪	১,৮২৬,৪৫০	—
১৯১৪-১৫	১,৬৮৭,৭৬৩	—
১৯১৫-১৬	৮২৬,৫০৪	—
১৯১৬-১৭	১,০৬৪,৫৮১	—
১৯১৭-১৮	১,৬৪২,৫৫৫	—
১৯১৮-১৯	১,৪১৭,৯৯৫	—
১৯১৯-২০	২,০৭০,৫২৭	—
১৯২০-২১	১,৯৫৭,০১৬	—
১৯২১-২২	৭৪৭,৪৬৪	৪০১,০৮১
১৯২২-২৩	৮৯০,২০০	৩৮২,৮৫১
১৯২৩-২৪	১,১৪৫,৮১৫	৬০৩,৫১৯
১৯২৪-২৫	১,৩৬২,০০২	৯৬৪,৩৩৩
১৯২৫-২৬	১,৫৫৪,৬৭৫	১,১৪৭,৭৭৯
১৯২৬-২৭	১,৩৮৯,৪৬৫	১,১৩৪,২৫৩
১৯২৭-২৮	১,০৯১,১২০	৭৫০,৩৩০
১৯২৮-২৯	১,৫৩৪,৫৪১	৯৭৪,৩৭০
১৯২৯-৩০	১,৪০২,৬৫৫	৮৫০,৮৭৬
১৯৩০-৩১	১,৩২৭,৫৩৪	৮৩৬,৭০৫

উৎস : সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া পাঞ্জাব, ১৯৩১

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট কারিগরী পদ্ধতি ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছিল। ১৯২১ এর আগে 'রক্ষণশীল' চাষীরা খুব কমই নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নোতুন সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছিল। অধিকাংশ জেলাগুলিতে পুরানো পার্শিয়ান চাকার বদলে লোহার চাকা ব্যবহৃত হয়েছিল ; ৬,৬৫৮টি মেষ্টন লাঙল, ১২,২১১টি শস্য কাটার যন্ত্র ; ১৭৮টি মাটি কাটার যন্ত্র ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রী হয়েছিল। বহু জেলায় ছোট ছোট কারখানা গজিয়ে উঠল ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, গুরুদাসপুর জেলায় ছিল ২১টি লোহার ফাউণ্ড্রি যা বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জাম তৈরী করত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশে তৈরী প্রায় ৫,০০০ কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রী হয়েছিল। মন্দা শুরু হওয়ার পর্যন্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।[২০] এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কেবলমাত্র বড়ো ভূস্বামী ও ধনীকৃষকরা নোতুন যন্ত্রপাতি ও সার কিনতে পারত। তাৎপর্যের বিষয় হল এই সব শ্রেণীর মানুষের আচরণের ধরণ যা যাদের নোতুন পদ্ধতি গ্রহণের একটা ঝোঁক ছিল।

১৮৯১ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্লিনের কৃষির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। গম এবং তুলো ছিল পাঞ্জাবের প্রধান ফসল। ব্লিনের গবেষণায় দেখা যায় যে তুলোর উৎপাদন "এই সময়ে একর প্রতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।" কারিগরী সংক্রান্ত পরিবর্তন যে রাজ্যে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল তা হল পাঞ্জাব। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ১২টি গ্রাম পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে ৯টি জেলা উন্নত বীজ নিয়ে চাষের পরীক্ষা করেছিল ; ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উন্নত বীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গিয়েছিল যার ফলে একর প্রতি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। একর প্রতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জলসেচের প্রভাবের ওপর ব্লিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ; অধিকাংশ "অতিরিক্ত সেচযুক্ত জমি" ছিল পাঞ্জাবে।[২১]

আমরা সংক্ষেপে পাঞ্জাবে জলসেচের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করব। সরকারী খালসমূহ ছিল সেচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ১৮৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২.৩ মিলিয়ন একর জমিতে খালগুলির মাধ্যমে জলসেচ করা হয়েছিল। নিম্ন চেনাব খাল উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯০০-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে খালের দ্বারা সেচভুক্ত জমি ৬ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছিল। ১৯১১-২০ র দশকে ট্রিপল ক্যানাল পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং খালের

দ্বারা জলসেচভুক্ত জমির পরিধি ছিল ১০ মিলিয়ন একর। এরপর এল শতদ্রু উপত্যকা পরিকল্পনা এবং খালের দ্বারা জলসেচভুক্ত জমি ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১২'৪ মিলিয়ন একরে দাঁড়িয়েছিল। খাল ছাড়াও ভূস্বামীদের স্বতন্ত্রভাবে বা দলগতভাবে কুয়ো ছিল। ১৯২০ র দশকগুলিতে ইঁদারা বা বাঁধানো কুয়ো তৈরী করা হল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি ১,০০০ একরে ২৬২ একর জমিতে কুয়োর দ্বারা জলসেচ করা হত।[২২]

উত্তর প্রদেশে জলসেচের জন্য বিপুল পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হলেও তুলোর চাষের সামান্যই উন্নতি হয়েছিল। স্বল্পায়তন এলাকাতে দীর্ঘ আঁশের তুলো জন্মাত। মথুরাতে ১৮৭০ এর দশকগুলিতে তুলো চাষে উন্নতি হয়েছিল। এখানে চাষীরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অগ্রিম পেত "ফসলের জন্য এমন কি ফসল কাটার আগেই।"

হুইটকোম্ব আমাদের বলেছেন তুলা চাষের আওতাধীন এলাকার প্রসার প্রদেশে উৎপন্ন তুলার জন্য "যে সব বাজার ছিল তার অস্থিরতার" দ্বারা ব্যাহত হয়েছিল।[২৩] যা আমাদের বলা দরকার তা হল উত্তর প্রদেশে ১৫ টি তুলার কারখানা ছিল এবং ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে যে পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে সেই পর্বে তুলা চাষের আওতাধীন জমি ছিল ৯৪১,০০০ একর ; তুলার প্রধান এলাকাগুলি ছিল বুলান্দশহর, মথুরা, আলিগড় এবং আগ্রা জেলা। যেখানে খালসেচভুক্ত এলাকায় আমেরিকান তুলা উৎপন্ন হত, তা হল কানপুর।[২৪] ১৯৩০ এর দশকগুলিতে তুলা চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ দ্রুত কমতে লাগল ; কারণ এ সময়ে চাষীরা ইক্ষু চাষ বাড়াতে আগ্রহী হয়েছিল।

মাদ্রাজে উনিশ শতকে তুলো চাষের বিস্তৃতি ঘটেছিল। মাদ্রাজ বন্দর তুলো রপ্তানী করার সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। মারোয়াড়ী ও গুজরাটি দের মতো চেট্টিয়াররাও বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় সক্রিয় ছিল ; সিংহল ও ব্রহ্মদেশে তাদের কর্মধারা প্রসারিত ছিল। অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা তুলোর কারখানা তৈরী করেছিল ; তুলোর কারখানা গড়ে ওঠার ফলে তুলো চাষও প্রসারিত হয়েছিল। পাঞ্জাবের মতো মাদ্রাজেও দীর্ঘ আঁশের তুলো উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। ৩/৮ থেকে ১ ইঞ্চি মাপের কাম্বোডিয়া জাতের বীজ ১৯০৫ এ সরাসরি কাম্বোডিয়া থেকে পাওয়া গিয়েছিল ; এবং এই বীজের তুলো প্রধানত ত্রিচিনোপল্লী, কোয়েম্বাটুর, এবং মাদুরায় জলসেচযুক্ত এলাকায় উৎপন্ন হত। কৃষিবিভাগের দ্বারা নির্বাচিত তিন্নেভেলী এবং কারুনগান্নি জাতের

বীজ থেকে ফসল হত তিন্নেভেলী, রামনাদ এবং মাদুরার কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে। উত্তর, পশ্চিম এবং কোকনাদে ল্যাংকাশায়ারের সংজ্ঞা অনুযায়ী লম্বা আঁশের তুলো উৎপন্ন হত এবং একটা বড়ো কৃষিক্ষেত্র জুড়ে এদের চাষ হত। ২৫ পরবর্তী সারণীতে দেখা যায়, তুলো চাষের এলাকার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৯২২-২৩ যে পাঁচ বছর শেষ হয়েছে সেই পাঁচ বছরে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তুলো চাষের এলাকা ছিল গড়ে ২,৩৬৪,০০০ একর। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে তুলো চাষের এলাকা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল ; মন্দা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলো চাষের এলাকা এবং তুলো রপ্তানীর ক্ষেত্রে বড়ো রকমের হ্রাস দেখা গিয়েছিল।

১৮নং সারণী

মাদ্রাজে তূলোর চাষ (১৯২১-৩১)

বছর	তুলো চাষের এলাকা (একর)	কাঁচা তুলোর রপ্তানী (টনের হিসাব)
(১)	(২)	(৩)
১৯২১-২২	১,৭৮২,৯৮১	১৭,৮০৭
১৯২২-২৩	২,৩২২,৯২৮	১৭,০৯৮
১৯২৩-২৪	২,৬৩১,৬২১	২৬,৫০০
১৯২৪-২৫	২,৯০৩,৪৮৮	৩৭,৭২২
১৯২৫-২৬	২,৯২০,৭৪৩	৫৬,৬২২
১৯২৬-২৭	২,৭০৩,৬৮৮	২৭,৬৯৩
১৯২৭-২৮	২,০৯৯,৭১৮	২২,৬৬৮
১৯২৮-২৯	২,৪৬৪,৭৭৫	২৯,০৭৪
১৯২৯-৩০	২,৪৭৬,৬৬৩	৪১,৯২২
১৯৩০-৩১	২,০৪১,২৮৪	২১,১৬৭

উৎস ঃ সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ, ১৯৩১।

মনে হয়, জলসেচ ব্যবস্থা মাদ্রাজের বাণিজ্যিক কৃষির বৃদ্ধির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা দেখব, কয়েক বছর ধরে জলসেচের জন্য সরকারী খরচ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফসলের অধীন জলসেচভুক্ত জমি ছিল ৫,৮১৯,৯০৭ একর এবং দ্বিতীয় ফসলের অধীন জলসেচভুক্ত জমির পরিমাণ ছিল ১,২২০,০৬৬ একর। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীকে ব্যবহার করে যে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল,

সেই ব্যবস্থার ফলে সেচভুক্ত চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২৬] তারপর মেট্টুর পরিকল্পনা কার্যকরী হল। ভিজাগাপত্তম, সালেম, ত্রিচিনোপল্লী এবং রামনাদে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল দুর্বল। এটা লক্ষ্য করা দরকার যে এইসব জেলাগুলি থেকে বড় রকমের বহির্গমন ঘটেছিল।[২৭]

জলসেচ ব্যবস্থার বিকাশ সাধন ছাড়াও সরকার উন্নত বীজ ও কৃষির সরঞ্জামের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে আলফ্রেড চ্যাটারটন "পায়োনীয়ার কারখানাগুলির" আন্দোলন শুরু করেন এবং অয়েল ইঞ্জিন ও ইরিগেশন পাম্পের ব্যবহার সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।[২৮] সরকার কোয়েম্বাটুর ও প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য অংশে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন যার ফলে উচ্চ ফলনশীল বীজের ধান, তুলো এবং বাদাম উৎপাদন সাফল্য লাভ করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের দশকগুলিতে কৃষকদের মধ্যে লোহার লাঙল জনপ্রিয় হচ্ছিল। ১৯১৯ এর মাদ্রাজ কীট ও রোগ আইন (Pests and Diseases Act) অনুসারে বলা হয়েছিল যে ঘোষিত জেলাগুলিতে তুলো গাছের চারা উপড়ে ফেলা উচিৎ যাতে কীট পতঙ্গ অনাহারে থাকতে পারে।[২৯] মনে হয়, কৃষক জনগণ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করার মতো অবস্থায় ছিল না। কৃষকদের দারিদ্র্যই ছিল প্রধান সমস্যা। আপাতভাবে, বড়ো ভূস্বামী এবং ধনী কৃষকদেরই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করার মতো সঙ্গতি ছিল। ১৯২৭ এ কৃষি পরিচালক রিপোর্ট করেন ঃ

"ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করার প্রধান অসুবিধা ছিল তার খরচ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে অনেকক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা আর লাভজনক থাকেনি···কৃত্রিম সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু আবার এটিও প্রধানত খরচের প্রশ্ন। সাম্প্রতিক কালে দাম কমানো হয়েছে এবং আজকাল এই প্রেসিডেন্সীতে সালফেট বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। সার ব্যবহারের মাধ্যমে মুনাফাকে নিশ্চিত করার জন্য যদি সারের দামকে যথেষ্ট পরিমাণ কমানো যায় তাহলে তা ব্যবহারের জন্য কৃষককে রাজী করাতে বিশেষ কোন অসুবিধা থাকে না।"[৩০]

বিশ্বব্যাপী মন্দা

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হলেও এর ফলাফল ভারতীয় অর্থনীতিতে স্পষ্ট হয়েছিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

১৯৩০ এর ফেব্রুয়ারীতে সরকারের কাছে ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার এক স্মারকলিপিতে বলেছিলেন যে "ব্যবসা বাণিজ্য অচল অবস্থায় ছিল" এবং বস্ত্রশিল্পে "ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আসন্ন বিপদে"র মধ্যে রয়েছে।[৩১] মন্দা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জাতীয় আন্দোলনের সমকালীন ছিল। স্পষ্টতই যে ভারতীয় বণিকরা ম্যাঞ্চেস্টারের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করত, তারা সুখী ছিল না।[৩২] বাস্তবিকই পরিস্থিতি ছিল অনিশ্চিত। বস্ত্রশিল্পের অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৩ এর ১লা ফেব্রুয়ারী ই. ডি সাসুন গোষ্ঠীর ৯টি কারখানা" "পরবর্তী মাসের কোন সময়ে বন্ধ করে দেওয়ার" সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল।[৩৩] ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইর আরও চারটি কারখানা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।[৩৪] ১৯শে এপ্রিল গোয়ালিয়র কারখানা নৈশ বিভাগ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল যার ফলে ২,০০০ শ্রমিক বেকারে পরিণত হল।[৩৫] ২রা এপ্রিল আমেদাবাদ গুদামে মজুদ ছিল ১৩,০০০ বেল।[৩৬] ২০শে এপ্রিল আমেদাবাদ মিল মালিক সমিতির সভাপতি চমনলাল গিরিধারীলাল লক্ষ্মী কারখানা সহ আমেদাবাদের দুটি কারখানা বন্ধ করার সিন্ধান্ত ঘোষণা করেন।[৩৭] ২৪শে এপ্রিল নাগপুরের মডেল কারখানার কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন যে অবিক্রীত মাল জমে থাকার জন্য ১লা জুন থেকে কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে।[৩৮] ১লা মে টাটা কারখানা, নিউ চায়না কারখানা বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারী করা হল। ফিনিকস কারখানা স্থির করেন "সপ্তাহে তিনদিন কারখানাগুলিকে নিষ্ক্রিয় রাখতে।"[৩৯] ৩রা মে টাইমস অফ ইণ্ডিয়া রিপোর্ট করে যে "বাণিজ্যে মন্দার জন্য" ব্র্যাডবারী, মুন, করিমভয় এবং ক্রেসেণ্ট কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বোম্বাইর আরও পাঁচটি কারখানা বন্ধ করা স্থির করেছিল, যার ফলে ৭,০০০ শ্রমিক বেকারে পরিণত হত।[৪০] ১৭ই জুন বোম্বাইয়ের অ্যাটলাস কারখানা প্রকাশ্য নীলামে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে বিক্রী হয়ে যায়।[৪১]

একক রপ্তানী পণ্য হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তুলা, কিন্তু তুলার মূল্য ১৯৩১—৩২ এ ২৩·৪৫ লক্ষ থেকে ১৯৩৩ এ ২০·৩৭ লক্ষতে দাঁড়িয়েছিল।[৪২] ১৯৩২ এর ৩০শে এপ্রিল স্টেটসম্যান পত্রিকা রিপোর্ট করেন যে "রপ্তানী বাণিজ্য ছিল মুমূর্ষু।"[৪৩] যেহেতু কারখানাগুলি ভারতীয় তুলোর মাত্র ৫০ শতাংশ ব্যবহার করত, বিদেশী বাজারের বিপর্যয় ব্যবসায়ীদের এবং উৎপাদকদেরও সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কাঁচা তুলোর দাম যুদ্ধপূর্ব দামস্তরের নীচে নেমে গিয়েছিল

যদিও কৃষকদের উৎপাদনের চড়া খরচ এবং রেলের মাল পরিবহনের বর্ধিত ভাড়া বহন করতে হয়েছিল। ব্রিটেনে তুলা রপ্তানী দারুণভাবে কমে যাওয়াতে ভারতে বাণিজ্যরও ব্রিটিশ ফার্মগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হল। বিষয়টি পার্লামেণ্টে তোলা হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় তুলা অধিক পরিমাণে কিনবার গ্যারাণ্টি দিতে অসম্মত হল।[৪৪] সৌভাগ্যবশত জাপান বিপুল পরিমাণে ভারতীয় তুলো ক্রয় করতে থাকে। দাম কমে গেলে তুলো চাষের জমিও ক্রমাগত কমে যেতে লাগল।

১৯নং সারণী
তুলো উৎপাদন
(১৯২৭-৩৪)

বছর	এলাকা (১০০০ একরে)	একর প্রতি উৎপাদন (পাউণ্ডে)	গড় দাম পেন্স
১৯২৭-২৮	২৪,৭৬১	৯৬	৯.২১
১৯২৮-২৯	২৭,০৫৩	৮৬	৮.০৩
১৯২৯-৩০	২৫,৯২২	৭৯	৬.৩৯
১৯৩০-৩১	২৩,৬১৬	৮২	৪.০৪
১৯৩১-৩২	২৩,৭০০	এন.এ	এন.এ
১৯৩২-৩৩	২২,৫০০	এন.এ	এন.এ
১৯৩৩-৩৪	২৩,৮০০	এন.এ	এন.এ

উৎস : মরাল অ্যাণ্ড মেটেরিয়াল প্রগ্রেস রিপোর্ট, ১৯৩৩-৩৪, এছাড়াও অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার, ১৯৩১।

১৯৩১-৪১ এর দশকে অপ্রতিহত ভাবে মন্দা চলতে থাকে এবং কৃষি-পণ্যের দাম ছিল কম। পরবর্তী সারণীতে দেখা যায় ব্রিটেনে তুলা রপ্তানী কমে এলেও জাপান ভারতীয় তুলোর প্রধান বিক্রেতা হিসেবে রয়ে গেল। ১৯৩৭ খৃীষ্টাব্দে চীন জাপান যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপানে তুলো রপ্তানী উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেল। দি ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার এর চেয়ারম্যান দামের নিম্নগতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন : "তুলোর জন্য বর্তমানে যে দাম পাওয়া যাচ্ছে তা চাষীরা যে শ্রম, মজুরী এবং অর্থ নিয়োগ করছে তার যথার্থ বিনিময় নয়।"[৪৫]

২০নং সারণী

কাঁচা তুলোর রপ্তানী (১৯৩৪-৪০)

(৪০০ পাউণ্ডের ওজনের ১০০০ বেল)

বছর	যুক্তরাজ্য	জাপান
১৯৩৩-৩৪	৩৪২	১,০২২
১৯৩৪-৩৫	৩৪৭	২,০১১
১৯৩৫-৩৬	৪৫৬	১,৭৫৯
১৯৩৬-৩৭	৬১০	২,৩৩৪
১৯৩৭-৩৮	৩৯৫	১,৩৫৯
১৯৩৮-৩৯	৪১৮	১,২১১
১৯৩৯-৪০	৪৭৩	১,০৫৬

উৎস ঃ রিভিউ অফ দি ট্রেড অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৩৩-৪০, এ ছাড়াও অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার ১৯৩৭-৩৮।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বাজার বন্ধ হয়ে গেল এবং ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার "মজুদ মাল বৃদ্ধির" অভিযোগ জানান। ছোট আঁশের তুলোর চাহিদা সাংঘাতিকভাবে পড়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সেণ্ট্রাল কটন কমিটি তুলো চাষের জমি সংকোচনের ব্যবস্থা করল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ থেকে শস্য আমদানী বন্ধ হয়ে গেলে "আরও খাদ্য উৎপাদন কর" প্রচারাভিযান শুরু হল এবং ছোট আশের তুলোর চাষের ওপর বাধ্যতামূলক সংকোচন বলবৎ করা হল।[৪৬] দৃষ্টান্তস্বরূপ মাদ্রাজে ১৯৪৭-৪৫এ তুলোচাষের জমি ২৬ শতাংশ কমানো হলো।[৪৭] ১৯৪৩ এ সরকার তুলোর সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিলেন, মার্চেণ্টস চেম্বারের মতে যা পাঠ পরিকল্পিত 'কারখানার মালিকদের যুক্তি সঙ্গত হারে তুলো সরবরাহ করা''র জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল।[৪৮] মার্চেণ্টস চেম্বার উৎপাদনের ঊর্ধ্বমুখী খরচের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং যে কৃষকদের ষাঁড়, কৃষির সরঞ্জাম এবং ভোগপণ্যের জন্য চড়া দাম দিতে হত তাদের স্বার্থে জোরালোভাবে তুলোর নিম্নতম দাম নির্দিষ্টকরণের সুপারিশ করেছিলেন।[৪৯] দুর্বোধ ব্যাপারে হল লাভজনক দাম না পাওয়া সত্ত্বেও চাষীরা তুলো উৎপাদন করত। এ প্রশ্নটি তোলা যেতে পারে যে তুলো উৎপাদনে ধনী কৃষকদের স্বার্থ জড়িত ছিল কি না।

উৎপাদনের অবস্থা

তুলো উৎপাদনকারীদের মধ্যে সমস্ত শ্রেণীর কৃষকরাই ছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশে ছোট কৃষকরা ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছ থেকে দাদন বা অগ্রিম পেত এবং তাদের উৎপাদনের একটি বড়ো অংশ চলতি বাজার দরের চেয়ে কম দামে দিয়ে দিত। প্রকৃতপক্ষে, কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের একাংশ গ্রাস করার একটা ঝোঁক ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ছিল। তুলোর ব্যবসায়ে বণিক ও মহাজনদের পুঁজি একটি প্রভাবশালী স্থান দখল করেছিল এবং তুলোর দরবৃদ্ধির দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। বাংলায় আই জে এম এ পাটের নিম্নতম দাম বেঁধে দেবার বিরোধিতা করেছিলেন; ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার তুলোর সর্বনিম্ন দাম নির্দিষ্টকরণ সমর্থন করেছিলেন। এ সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থা এই ছিল যে চাষীরা কয়েক বছর ধরে লাভজনক দাম পায়নি।

তুলো উৎপাদকদের অন্তর্গত ছিল ধনী কৃষক যাদের আবির্ভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডার্লিং আমাদের বলেছেন যে "কৃষিজীবী মহাজন"রা পাঞ্জাবের গ্রামীন অর্থনীতিতে একটি নতুন উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।[৫০] মনে হয়, কৃষিজীবী মহাজন" ধনী কৃষকদের প্রতিভূ স্বরূপ ছিল, যে ধনী কৃষকরা বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তার থেকে লাভবান হয়েছিল। নির্বিচারে বলা যায়, উন্নত মানের বীজ ও কৃষির সরঞ্জাম ব্যবহার করার মতো সঙ্গতি তাদের ছিল। মাদ্রাজে মহাজনরা সাধারণত ছিল "একজন দোকানদার অথবা বণিক, যাদের কাছে ক্ষেত থেকে ফসল কাটার আগেই তা বন্ধক দেওয়া হত।" উনিশ শতকের শেষ দিকে "রায়ত-ঋণদাতার আবির্ভাব ঘটেছিল যার কাছে দারিদ্র কৃষকরা ঋণের জন্য আসত।[৫১] ১৯২৯ এ বেলারীর একজন সাক্ষী ব্যাঙ্কিং এনকোয়্যারি কমিটিকে বলেছিল যে যে কৃষকেরা ২০ একর জমি চাষ করে তারাই সুধু ফসল বাজারে বিক্রী করতে পারবে।[৫২] নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ছোট চাষীদের ফসল কাটার সময়ই তা বিক্রী করে দিতে হত, তুলনায় ধনী কৃষকরা অনেক ভাল অবস্থায় ছিল। ব্যাঙ্কিং এনকোয়্যারি কমিটি রিপোর্ট করেছেন যে "প্রত্যেক ধনী কৃষকের অধীনে একদল সাধারণ রায়ত থাকবে যারা টাকার জন্য তার উপর নির্ভর করে।"[৫৩] বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ছোট চাষীদের ধার করতে হত এবং ধনী কৃষকের উপর নির্ভর করতে হত। এ থেকে বোঝা যায় যে কেন ধনী রায়তরা গ্রামে বিপুল গুরুত্ব লাভ করেছিল।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল বড় বড় ভূস্বামী এবং ধনী কৃষকেরা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল এবং উৎপাদনের নতুন ধরনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পাঞ্জাবে লোহার চাকা, মেস্টন লাঙল, খড় কাটার যন্ত্র, মাটি কাটার যন্ত্র ১৯৩০ এর দশকগুলিতেই হয়েছিল। কৃষির সরঞ্জাম তৈরীর জন্য ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উন্নত সরঞ্জাম বেশী বেশী ব্যবহৃত করে হচ্ছিল। জলন্ধরে ৮৭টি কারখানা যন্ত্রপাতি নির্মাণে নিযুক্ত ছিল।[৫৪] মাদ্রাজে উন্নত লাঙল, জলতোলার সরঞ্জাম, মাটি কাটার যন্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা ছিল। ৫,৯০০টি লাঙল, লোহার চাকা এবং হাজার হাজার হরেক রকমের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ১৯৪৪-৪৫ এ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছিল। উন্নত লাঙলে বিক্রী হত প্রধানত তাঞ্জোরে, চিতুরে এবং অনন্তপুরে। কৃষিগত সরঞ্জাম তৈরী করার উদ্দেশ্যে লোহা ও ইস্পাতের যোগানের জন্য একটি ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা ছিল, লাঙল ও অন্যান্য সরঞ্জামের দাম নিয়ন্ত্রনে আনা হয়েছিল, স্থানীয় উৎপাদকদের তাদের খরচের ওপর দশ শতাংশ বেশী দাম রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; গাড়ির টায়ার ও এ্যাকসেলের জন্য রায়তদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা "যথাসময়ে এবং সন্তোষজনকভাবে পূরণ করা যায় নি।"[৫৫]

১৯২০ এর দশকগুলিতে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং সিন্ধু প্রদেশে আমেরিকান তুলা চাষের আওতাধীন জমি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা ছিল একটি সহায়ক উপাদান, আমেরিকান তুলা প্রধানত সেচভুক্ত জমিতে উৎপাদিত হত। পাঞ্জাবে আমেরিকান তুলা চাষের জমির তুলনায় দেশী তুলা উৎপাদনের আওতাভুক্ত জমির আয়তন বৃহৎ ছিল। কিন্তু ১৯৪০ এর মধ্যে তুলা চাষের আওতাভুক্ত জমি ছিল ২·৬ মিলিয়ন একর যার ৫৪·২ শতাংশ জমি আমেরিকান তুলা চাষের আওতাধীন ছিল। সিন্ধু প্রদেশে তুলা চাষের এলাকাভুক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ একর যার প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে আমেরিকান তুলার চাষ হত।[৫৬] যেহেতু দেশী তুলার তুলনায় আমেরিকান তুলা উৎপাদনে প্রতি একরে নগদ ব্যয় বেশী তাই মনে হয়, কেবলমাত্র বড় ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের পক্ষেই আমেরিকান তুলা চাষের জমিকে বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। গ্রামীণ উদ্যোগপতি হিসেবে তাদের

আবির্ভাব ঘটেছিল এবং এরাই হল সেই শ্রেণী যাদের দ্বারা কৃষি-কার্যের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। এভাবে উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির ভিত্তিস্থাপন করেছিল বাণিজ্যিক কৃষি এবং ভারতীয় কৃষির যুগ যুগ ধরে থাকা বদ্ধাবস্থাকে পরিবর্তিত করেছিল।

কারিগরী দিক থেকেও পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। কৃষিগত পুরানো সরঞ্জামগুলির পরিবর্তে নোতুন সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছিল; বিশেষত পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে এই ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। একদিকে নোতুন সরঞ্জামের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল; অন্যদিকে ভূস্বামী ও ধনী কৃষকরা চাষবাসের উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল এবং ভাড়া করা কৃষি-শ্রমিকের ওপর নির্ভর করছিল। মনে হয়, কৃষি সম্পর্কিত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের মন্থর বিকাশ কৃষির আধুনিকীকরণের পথে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেবলমাত্র ১৯৩০ এর দশকগুলিতে কিরলোস্কারের প্রতিষ্ঠান কৃষিগত সরঞ্জাম তৈরী করার কাজ শুরু করেছিল।[৫৭] এ সত্ত্বেও, কৃষি সম্পর্কিত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প দুর্বলভাবে বিকশিত অবস্থায় রইল।

ইক্ষু

পাট বা তুলা শিল্পের মত বৈদেশিক বাণিজ্যের দিক থেকে উদ্দীপনা চিনি শিল্প খুব কমই পেয়েছিল। ভারতীয় চিনি শিল্পের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুচাষ প্রসারিত হয়েছিল। ১৯৩০ এর দশকগুলিতে চিনি শিল্পে ভারতীয় পুঁজির বিনিয়োগ ছিল বৃহৎ ও ক্রমবর্দ্ধমান এবং যুক্ত প্রদেশ চিনি শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। চিনি শিল্প (সংরক্ষণ আইন) ১৯৩২ এ পাশ হল। বিড়লা, সিংহানিয়া, হীরাচাঁদ ও ডালমিয়ারা চিনি শিল্পে প্রবেশ করল। চিনি কলের সংখ্যা ১৯৩০-৩১ এ ২৯ থেকে ১৯৩১-৩২ বেড়ে হল ৫৭ টি এবং ১৯৩৯-৪০ এ ১৪৫ টি; চিনির উৎপাদন ১৯৩১-৩২ এ ১,৫৮,০০০ টন থেকে ১৯৩৯-৪০ এ দাঁড়িয়েছিল ১,২৪২,০০০ টনে।[৫৮] ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইক্ষুচাষের লক্ষ্যণীয় প্রসার দেখা গিয়েছিল। বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে ভারতের প্রধান শিল্পগুলি যখন মার খাচ্ছিল তখন চিনি শিল্প ও ইক্ষু চাষ দ্রুত উন্নতি লাভ করছিল।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে যুক্তপ্রদেশে ইক্ষুচাষ বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং দোয়াব অঞ্চলের খালসেচ এবং অযোধ্যায় ও রোহিলখণ্ডের রেলপথ

নির্মাণ এর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বেরেলীতে ১৮৬৮তে ৫০,০৭৮ একর জমিতে ইক্ষুচাষ করা হত। ১৯৪২ এ এই এলাকা ৯৪,২৭৬ একরে (অথবা কর্ষিত জমির ১৩ শতাংশ) প্রসারিত হয়।[৫৯] ফৈজাবাদে ইক্ষুচাষের অধীন এলাকা "সবচেয়ে মূল্যবান খারিফ শস্য" ১৯৪০ এর দশকে ৩৬,০০০ থেকে ৪৬,০০০ একরে ওঠানামা করছিল।[৬০] ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় এরূপ চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৫,৭১৬ একর। ১৯২০র দশকে এই জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং ১৯৩৯-৪০ এ ৩,৫৮২ ও ১৯৪৮-৪৯ এ ১৬,৯৩৩ একরে বৃদ্ধি পায়।[৬১] ১৯০১ থেকে ১৯০৬ এর মধ্যে মথুরাতে ইক্ষুচাষের এলাকা ছিল ২,৪৩২ একর, ১৯৪৬-৪৭ এই চাষের এলাকার পরিমাণ ছিল ২৮,৬০২ একর।[৬২] মোরাদাবাদে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর উৎপাদন হয়েছিল এবং ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে এই চাষের এলাকা ছিল ৯৫,৪৩৮ একর (অথবা কর্ষিত জমির ৮৭ শতাংশ); মীরাটে ইক্ষু ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খারিফ ফসল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ২২,০০০ বিঘাতে এই ফসলের চাষ হত।[৬৩] খালসেচের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুচাষের জমির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল, ১৯০২ এ ১১৫,৪১১ একর জমি এই চাষের আওতাধীন ছিল।[৬৪] পরবর্তী সারণী থেকে দেখা যাবে যে ১৯৩০ থেকে ইক্ষুচাষের এলাকাধীন জমি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪২ এ সরকার অধিক-খাদ্য ফলাও" আন্দোলন শুরু করে এবং ইক্ষুচাষের জমির পরিমাণ কমে যায়।

২১ নং সারণী

যুক্ত প্রদেশে ইক্ষুচাষের এলাকা (১৯০৬-৪৫) (হাজার একরে)

১৯০৫-৬	১৯১০-১১	১৯১৫-১৬	১৯২০-২১	১৯২৫-২৬
১,১৮১	১,২০৭	১,৩২২	১,৩৮৬	১,৩৫১
(২-৭৩)	(২'৮৩)	(৩'০৫)	(৩'২৬)	(৩'১১)

১৯৩০-৩১	১৯৩৫-৩৬	১৯৪০-৪১	১৯৪৫-৪৬
১,৪৭৬	১,৮১৮	২,১৩৩	১,৯৬৯
(৩'৪৬)	(৪'২১)	(৪'৭৯)	(৪'৩৪)

উৎস: সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, উত্তর প্রদেশ, ১৯৫১, পার্ট ওয়ান এ।

যুক্তপ্রদেশের মতই বিহারে উনিশ শতকের প্রথম দিকেই ইক্ষুচাষ

বিস্তৃতিলাভ করেছিল ; চম্পারণে এই চাষ প্রবর্তন করেছিল আজমগড়-গোরখপুর থেকে আসা বহিরাগতগণ। ১৮৫০ এর দশকে ইউরোপীয় বাগিচা মালিকরা নীল উৎপাদনে মূলধন নিয়োগ করলে ইক্ষুচাষ হ্রাস পেতে শুরু করল। এরপর বাজারে কৃত্রিম রঙ আসবার সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে নীলকররা চিনি উৎপাদন এবং ইক্ষু চাষ শুরু করে। মজঃফরপুরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৮,৭০৫ একর ইক্ষু চাষের অধীন জমি ১৯০৪-৫ এ ১০,০০০ একরে বৃদ্ধি পায়।[৬৫] সাহাবাদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ছিল ইক্ষু ; ১৯০৬ এ ইক্ষুচাষের অধীন জমি ছিল ৩৬,০০০ একর এই ফসলের জন্য "প্রদেশ জমি ছিল ৩৬,০০০ একর, এব ফসলের জন্য" প্রয়োজন বিশেষ যত্ন এবং ৭/৮ বার জলে সিঞ্চন করা চাই।[৬৬] চম্পারণে নীলকররা চিনিকল স্থাপন করেছিল এবং তাদের তালুকে (এষ্টেটে) ইক্ষু উৎপাদন করত ; ইক্ষু চাষ হত প্রধানত বেতিয়া মহকুমায় এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই চাষের এলাকাধীন জমি ছিল ১৩,০০০ একর।[৬৭] উনিশ শতকের শেষদিকে সারণ জেলার বৃহত্তর অংশে ইক্ষুর চাষ জোরালোভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং ১৯০৮ এর মধ্যে এই চাষের এলাকাধীন জমি ছিল ৪৪,৭৫০ একর, প্রকৃত ফসল চাষের এলাকার ৩.৫ শতাংশ।[৬৮] গয়াতে পপি চাষের এলাকাধীন জমি ইক্ষু চাষে রূপান্তরিত হয়েছিল ; শোন ক্যানাল ব্যবস্থার পর এই চাষ বলিষ্ঠ গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।[৬৯] একমাত্র দক্ষিণ ব্যতীত পূর্ণিয়া জেলার সর্বত্র ইক্ষু উৎপাদিত হত। মুঙ্গেরে এই চাষ হত প্রধানত দক্ষিণাঞ্চলে এবং এই চাষের এলাকাধীন জমি ছিল মাত্র ৬,৮০০ একর।[৭০] ইক্ষুচাষ পালামৌ উপত্যকাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইক্ষু থেকে রস নিঙড়ানোর জন্য ব্যবহৃত লোহার মিলের কদর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যদিও পুরানো পদ্ধতির প্রয়োগও হচ্ছিল।[৭১] দ্বারভাঙ্গা জেলার মধ্যবনী মহকুমায় ইক্ষু চাষ হত, সাধারণভাবে চাষীরা জমির মালিকের কাছ থেকে দাদন বা অগ্রিম পেত।[৭২]

১৯৩০ এর দশকে উত্তর বিহারে যখন বিড়লা, জৈন ও সিংহানিয়ারা চিনি কল প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে ইক্ষুচাষের লক্ষ্যণীয় বিস্তৃতি দেখা গিয়েছিল। ২২ নং সারণীতে দেখা যায়, ইক্ষু চাষের উৎপাদন বোম্বাই ও মাদ্রাজের তুলনায় বিহারে অল্প ছিল যদিও একর প্রতি উৎপাদন কম ছিল। লক্ষ্যণীয় যে বিহারের তুলনায় মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে জলসেচ ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত ছিল।

২২ নং সারণী

ইক্ষুচাষ (উত্তর বিহারে, ১৯৩১)

	উত্তর বিহার	ইউ পি	বোম্বাই	মাদ্রাজ
টনের হিসাবে একর প্রতি উৎপাদন	১১	১৩	২৪·৭	২৮
একর প্রতি ইক্ষু চাষের খরচ	৯১·৩০ টাঃ	৯৭·৫০ টাঃ	৪৯৫ টাঃ	৪৯০ টাঃ
শস্য চাষের সময়	৯ থেকে ১১ মাস	•৯ থেকে ১১ মাস	১২ থেকে ১৪ মাস	১০ থেকে ১২ মাস

উৎস ঃ রিপোর্ট অব ট্যারিফ বোর্ড ঃ সুগার, ১৯৩১।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে ১১ টি চিনিকল ছিল ; ১৯৩০ এর দশকে এখানে ইক্ষু চাষের সুদৃঢ় অগ্রগতি ঘটেছিল যখন এই চাষ পাঞ্জাবে বদ্ধাবস্থায় পরিণত হয়েছিল। পাঞ্জাবে গম ও তুলা চাষের অধিকতর বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্য চাষীরা উক্ত ফসল দুটির চাষ সুবিধাজনক মনে করেছিল। কোয়েম্বাটুর গবেষণা কেন্দ্রে উচ্চ ফলনশীল বীজ নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল ; প্রকৃতপক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোয়েম্বাটুরে গবেষণা জাত বিভিন্ন ধরনের উন্নত ইক্ষুচাষের প্রবর্তন চিনি শিল্পের বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান এনে দিয়েছিল। ১৯৪০ এ মাদ্রাজে পাঁচটি পবেষণা কেন্দ্র ছিল ; সেখানে বিশেষ কয়েক ধরণের ইক্ষু বীজ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হত। সামাল কোট খামারে একর প্রতি উৎপাদন ছিল ৫৯ টন এবং কালামপাডিতে ছিল-৩৫·২ টন।[৭৩] মনে হয়, মাদ্রাজে ইক্ষু চাষ জল সেচ ব্যবস্থার দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল। ইক্ষু চাষের জমি ১৯৩৯-৪০ এ ১৫৪,৬৫৪ একর থেকে ১৯৪৪-৪৫ এ ১৫৫,৫৯৬ পরিণত হয়েছিল। এর বৃহৎ অংশ ছিল উন্নত মানের ইক্ষুচাষের আওতায়। ১৯৪৪-৪৫ এ ১,০৩৯,২৩৫ টি সেট উন্নত মানের বীজ রায়তদের সরবরাহ করা হয়েছিল। ইক্ষু পেষাইয়ের ২৮ টি উন্নত কারখানা বিক্রী হয়েছিল ; ৩,৩৫৩ টি উন্নত উনুন গঠিত হয়েছিল।[৭৪] পরবর্তী সারণীতে দেখা যায়, যুক্ত প্রদেশের চেয়ে মাদ্রাজে একর প্রতি উৎপাদন বেশী ছিল।

২৩ নং সারণী

একর প্রতি ইক্ষু উৎপাদন (১৯১৯-২০ থেকে ১৯৩৮-৩৯)

(পাউণ্ডের হিসাবে)

বার্ষিক গড়	যুক্তপ্রদেশ	মাদ্রাজ
১৯১৯-২০ থেকে ১৯২৩-২৪	২,১৭২	৬,০৫৪'২
১৯২৪-২৫ থেকে ১৯২৮-২৯	২,১১১	৬,১৫১'৪
১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৩-৩৪	২,৮৪৮	৬,২৯৬'০
১৯৩৪-৩৫ থেকে ১৯৩৮-৩৯	৩,০৫৮'৮	৬,৩৪০'০

উৎস ঃ এস্টিমেট্স্ অফ এরিয়া অ্যান্ড ইল্ড্, কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিক্স্ ডিপার্টমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া।

বছরের পর বছর একর প্রতি ইক্ষু উৎপাদনে একটা উধর্বগতির ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল, ১৯৩০ এর দশকে উন্নত মানের ইক্ষু চাষের এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার রিপোর্ট করেন যে ১৯২৭ এ ইক্ষু চাষের এলাকার ৭'২ শতাংশ জমিতে উন্নত মানের ইক্ষু চাষ করা হত। কিন্তু জলসেচ ও গবেষণায় সরকার যে খরচ করেছিলেন তার ফলে ইক্ষু চাষে মৌলিক উন্নতি ঘটেছিল। মনে হয় সরকারের পক্ষে ক্রমবর্দ্ধমান চিনি শিল্পেরই তাগিদ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৯ এ প্রতিষ্ঠিত দি কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছিল।[৭৫] জলসেচের ব্যাপারটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৫ এ লালচাঁদ হীরাচাঁদ লক্ষ্য করেছিলেন "দাক্ষিণাত্যে চিনিকলের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে জলসেচ মূল উপাদান হয়েছে।[৭৬]"

২৪ নং সারণী

ইক্ষুচাষের এলাকা ও একর প্রতি উৎপাদন

(১৯৩০-৪০)

	(১০০০ একর)	উন্নত ধরণ (১০০০ একর)	একর প্রতি উৎপাদন (টন)
১	২	৩	৪
১৯৩০-৩১	২,৯০৫	৮১৭	১২'৩

	(১000 একর)	উন্নত ধরণ (১000 একর)	একর প্রতি উৎপাদন (টন)
১	২	৩	৪
১৯৩১-৩২	৩,০৭৭	১১৭০	১৪.১
১৯৩২-৩৩	৩,৪২৫	১৮৪৬	১৪.৬
১৯৩৩-৩৪	৩,৪২২	২২৯৫	১৫.১
১৯৩৪-৩৫	৩,৬০২	২৪৪৬	১৫.১
১৯৩৫-৩৬	৪,১৫৪	৩০৭১	১৫.১
১৯৩৬-৩৭	৪,৫৮৪	৩৪৫২	১৪.৭
১৯৩৭-৩৮	৩,৯৯৭	২৯৬৮	১৪.০
১৯৩৮-৩৯	৩,২৭০	২৬৭৩	১১.০
১৯৩৯-৪০	৩,৭৬৭	২৮৯৩	১২.৮

উৎস : রিপোর্ট অন সুগার, ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড, ১৯৩৮, এছাড়াও ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৩২৮, ১৯৪৪,

২৪ নং সারণীতে একর প্রতি উৎপাদন ও উন্নত মানের ইক্ষু চাষের এলাকা দেখানো হয়েছে। তথাপি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্ধিত দক্ষতার সমস্যাগুলি অমীমাংসিত ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সুগার কমিটি ব্যবসায়ী সংগঠন, গবেষণা, সার প্রয়োগ ও জলসেচের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[৭৭] অধিকাংশ চিনি কলেরই অধিকাংশ যন্ত্রপাতি ছিল না; কারখানাগুলিতে উৎপাদন হত প্রায় আট মাস যার ফলে শ্রমিক নিয়োগ ছিল অনিশ্চিত[৭৮]। ইক্ষুচাষীরা লাভজনক দর পেত না, যদিও উৎপাদনের খরচ বেড়ে গিয়েছিল।

উৎপাদনের অবস্থা

ইক্ষুচাষের জন্য প্রয়োজন ছিল একর প্রতি উচু হারে শ্রম বিনিয়োগ। ইক্ষু রোপণ, কাটা পেষাই কবার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হত। প্রকৃত পক্ষে ইক্ষুচাষের জন্য অন্য যে কোনও ফসলের চাষের থেকে বেশী সময় প্রয়োজন হত। গ্রীষ্মের প্রথম দিকে (মার্চ-এপ্রিল) অন্তত ৭ বার জমিতে লাঙল দেওয়া হত, বর্ষার আগমনে আবার এই জমিতে লাঙল দেওয়া হত; পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মার্চে ইক্ষু রোপণ করা হত এবং শীতের মাসগুলিতে আখ পেকে উঠত। এরপর চলত আখ কাটা ও পেষাইয়ের কাজ।

আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করার জন্য কৃষকরা সময় নিত।[৭৯] হুইটকম্ব আমাদের বলেছেন যে আখ রোপণ থেকে কাটা ও পেষাই পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কৃষকদের বিপজ্জনক অবস্থার কারণ। তাদের মহাজন বা ভূস্বামীদের কাছ থেকে অগ্রিম নিতে হত এবং বাজারদরের চেয়ে কম দামে উৎপন্ন ফসলকে তাদের খারিফ ফসলের সময়কার খাজনা শোধ করতে সাহায্য করত; "খাজনা শোধের জন্য চিনি উৎপাদনে দাদন গ্রহণের লোভ সামলানো দুঃসাধ্য ছিল।"[৮০] গুড় এবং খান্দের কারবার বাণিজ্যিক দালালদের ব্যবসা ছিল। যে সকল উৎপাদকের খান্দেসারী (ক্ষুদ্রায়তন পরিশোধক কারখানা") ছিল তারা তাদের উৎপাদনকে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করত কেবলমাত্র কৃষকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিজেরাই গুড় তৈরী করত এবং তা কিছু সংখ্যক ব্যাপারী বা ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করত।[৮১] এইভাবে আখ উৎপাদনকারীরা ব্যবসায়ী ও জমিদারদের কৃপার অধীন ছিল; বাজার দরের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম দামে তাদের ফসলকে বিক্রী করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না।

যখন হুইটকম্ব কৃষকদের প্রসঙ্গ তোলেন কৃষকদের একটি সমগোত্রীয় শ্রেণী বলে ধরে নেওয়া হয়। নিশ্চয়ই বৃহৎ আকারের ভূসম্পত্তি সম্পন্ন ধনী কৃষক এবং গ্রামীণ মহাজনরা সীমিত ভূসম্পত্তির মালিক ক্ষুদ্র কৃষকদের থেকে ভিন্ন ছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বলেছি যে দরবৃদ্ধির ফলে ধনী কৃষকরা উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হয়েছিল এবং ইক্ষুচাষের প্রসার ও একর প্রতি উৎপাদন বাড়ানোর পক্ষে সব যুক্তিই ছিল। ক্ষুদ্র চাষীর তুলনায় অনেক বেশী সম্পদশালী হওয়ায় ধনী কৃষকদের উন্নতবীজ সংগ্রহ ও চাষাবাদ করার জন্য যথেষ্ট মূলধন ছিল, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বিহারের ইক্ষুচাষের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অনুধাবন করতে হলে এই শ্রেণীর আচরণের ধরণ মনে রাখা উচিত।

অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থাটি রায়তের খাজনা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যুক্ত—এই বক্তব্যে এক চিলতে সত্য রয়েছে।[৮২] খাজনা দেওয়ার জন্য রায়তের নগদ টাকার প্রয়োজন হত যেহেতু সে চাল বিক্রী করতে চাইত না। তাই খাজনা শোধ করা ও অগ্রিম নেওয়ার জন্য তাকে ইক্ষুর ওপর নির্ভর করতে হত। ১৮৭০ এ আজমগড়ের সেটেলমেণ্ট অফিসার লিখেছিলেন:

"তার খাজনার ১ম ও ২য় কিস্তি পরিশোধের জন্য সে নগদ টাকার প্রয়োজন অনুভব করে এবং এটাই সে ধার করে। যখন চাল তৈরী হয়ে

হয়ে যায় তখন সম্ভবত সে তার ধার করা ফসল ও টাকর একটা অংশ পরিশোধ করে। কিন্তু চাল একটি প্রিয় খাদ্যশস্য এবং সাধারণতঃ ফসল কাটার সময় তা সস্তায় বিক্রী হয়ে যায়। তাছাড়া এই ফসল অন্ততপক্ষে তিন বা চারমাসের জন্য তার এবং তার পরিবারের খোরাক্ যোগায়। সুতরাং কৃষকরা যথাসম্ভব কম এই ফসল বিক্রয় করে। এর পরই আসে ইক্ষুচাষের মরশুম। গুড়ের জন্য যে দাম সে পায় তাই দিয়ে রবি ফসলের সময়ের দেবার ১ম কিস্তি পরিশোধ করে।...রবি ফসলকেও সে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ বাচাঁতে চেষ্টা করে কিন্তু শেষ কিস্তি পরিশোধের জন্য এর থেকেও ফসল তাকে বিক্রী করতে হত।"[৮৩]

অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থাটি ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত চলছিল যখন বহু সংখ্যক চিনিকল স্থাপিত হয়েছিল। যদিও ব্যবস্থাটি ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল কি না তা খুব পরিষ্কার নয়। কল মালিকের প্রধান লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব সর্বনিম্নদামে নিয়মিত আখের যোগান পাওয়া। তাৎপর্যের বিষয় হল, যে সব জায়গায় গুড় তৈরী করার ব্যাপারটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যেখানে কৃষকদের দর কষাকষির ব্যাপারটাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কৃষকরা মিলের দালালদের কাছে থেকে অগ্রিম পাচ্ছিল যারা প্রায়ই ছিল ব্যবসায়ী বা ভূস্বামী এবং তাদের নিজস্ব উৎপাদনের একটি বড়ো অংশ দিয়ে দিতে হত। ১৯৩৬ থেকে ইক্ষু সরবরাহের একটি নিয়মিত ব্যবস্থায় চালু হয়। পাটোয়ারী ও কামদাররা ইক্ষুর পরিমাণ এবং সরবরাহের তারিখ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করার জন্য পারজি বা ছাড়পত্রের প্রচলন করেছিল, এই ছাড়পত্রের অধিকারী কৃষকরাই মিলগুলিতে ইক্ষু সরবরাহ করতে পারত। কিন্তু এই ব্যবস্থা কৃষকদের অবস্থার সরবরাহ উন্নতি করতে পেরেছিল, কারণ অধিকতর প্রভাবশালী জমিদার ও মহাজনরা প্রায়ই কর্মচারীদের নিজের হাতের মুঠোয় এনে ফেলত এবং যে অতিরিক্ত ছাড়পত্র পেত...তা খাজনা ও অন্যান্য পাওনা আদানের জন্য তাদের দুর্বল প্রজাদের ইক্ষু নিজস্ব হিসেবে বিক্রী করত।"[৮৪] মনে হয়, ধারের জন্য যাদের ওপর নির্ভর করতে হত সেই জমিদারদের কাছে ছোট কৃষকরা বাঁধা থাকত যাতে তারা উৎপাদনের উর্ধমুখী খরচকে সামলাতে পারে ও খাজনা দিতে পারে। কৃষকদের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার প্রতি সাকসেনা মনযোগ আকর্ষণ করেছেন ঃ "খাজনা দেওয়া, চাষবাসের খরচ যোগানো এবং পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের টাকার

প্রয়োজন হত···তাদের টাকার প্রয়োজন ছিল এবং তাদের ঋণদাতা ভূস্বামীর করিন্দ ও মুনিমদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা করার মতো অবস্থায় তারা ছিল না···যে পরিমাণ ইক্ষু সরবরাহ করতে হত প্রায়ই তা তাদের সরবরাহ করার ক্ষমতার অধিক ছিল। টাকা ধার করার সময় তারা শার্ত মেনে নিত, কেননা তারা ইক্ষুর সরবরাহের পরিমাণ অনুসারে টাকা পেত।"[৮৫]

নিম্নতম দাম

ইক্ষুর সর্বনিম্ন দাম স্থির করাই ছিল কৃষকদের কাছে চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্যাটি ছিল জটিল কারণ ইক্ষু উৎপাদনকারীদের বড়ো অংশ ছিল ছোট চাষী এবং বাজার নিয়ন্ত্রিত হত মিল মালিকদের দ্বারা। ১৯৩৩ এ সরকারের দ্বারা আহূত সম্মেলনে এ বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছিল যে চিনিকলগুলির সংরক্ষণ লাভ করা সত্ত্বেও ইক্ষু উৎপাদন কারীরা লাভজনক দাম পাচ্ছেনা। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের সরকার ইক্ষুর নিম্নতম দাম স্থির করে মন প্রতি পাঁচ আনা এবং খান্দেমারীর দাম স্থির করে ৩ আনা ৬ পাই। আখের দাম যাতে চিনির চলতি বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে। সেজন্য একটি ওঠ-নামা দরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৮৬] কৃষকরা লাভজনক দামের জন্য জোর গলায় দাবী জানালেও খুব কম ক্ষেত্রেই সরকারের দ্বারা স্থিরকৃত নিম্নতম দাম তারা পেত। কারণ অনুসন্দানের জন্য বেশীদূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ১৯৩৭ এ গঠিত ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট ইক্ষুর নিম্নতম দাম নির্দিষ্ট করণকে বাধা দেয়; সিণ্ডিকেটের প্রধান যুক্তি ছিল, ইক্ষুর চড়া দাম উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে তুলবে। দ্বিতীয়তঃ ইক্ষুর দাম নির্ভর করে বাজারে ইক্ষুর চাহিদা ও যোগানের ওপর। ১৯৩৫-৩৬ এ ইক্ষু উৎপাদন কমে যায় ও দাম বেড়ে যায়। ১৯৩৬-৩৭ এ খুব ভাল ইক্ষু উৎপাদন হয়েছিল এবং সরকারের বাধা দামের নীচে দর পড়ে গিয়েছিল। ১৯৩৭ এ রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার যে আবগারী শুল্ক ধার্য করেছিলেন, চিনিকল মালিকরা তার বিরুদ্ধে একটি চাপ সৃষ্টিকারী আন্দোলন শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুর নিম্নতম দাম যুক্ত প্রদেশে ৩ আনা ৬ পাইতে নেমে যায় এবং ১৯৩৭ এর গ্রীষ্মকালে বিহারে এই দাম হয় ৩ আনা। ইক্ষু উৎপাদকের মধ্যে গভীর অসন্তোষ ছিল এবং ইক্ষু চাষের এলাকা কমে গিয়েছিল।[৮৭]

নিম্নতম দামের প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া গেল না এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিমলাতে সরকার কর্তৃক আহূত সম্মেলনে এটি পুনরায় আলোচিত হল। স্পষ্টতই "অতি উচ্চহারে" ইক্ষুর দাম বেঁধে দেওয়ায় যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের চিনিকল মালিকরা সরকারকে এই বলে দোষী সাব্যস্ত করে যে এর ফলে চিনির দাম বেড়ে গিয়েছিল এবং চিনির বিক্রী কমে গিয়েছিল। সিণ্ডিকেটের পক্ষ থেকে বি এম বিড়লা সুপারিশ করেন যে "যতদূর সম্ভব নিম্নতম স্তরে আখের নিম্নতম দাম কমিয়ে রাখতে হবে এবং আবগারী শুল্ককেও কমাতে হবে"। দাক্ষিণাত্যের চিনিকলগুলির প্রতিনিধি লালচাঁদ হীরাচাঁদ বলেছিলেন যে কারখানাগুলি নিজেদের চাষের এলাকাতেই ইক্ষু উৎপাদন করে এবং কিভাবে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের চিনিকলগুলি সরকারী আনুকূল্য লাভ করে, তাও তিনি নির্দেশ করেন। সরকারী প্রতিনিধিরা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে ইক্ষু উৎপাদনকারী চাষীদের ভাল দাম পাওয়া উচিত ; ইক্ষুর চড়া দাম "চিনির চড়া দামের ফল।" অধিকাংশই পরিবর্তনশীল মাপকাঠিকে অগ্রাহ্য করে "সারা বছরের জন্য একটা সর্বনিম্ন দামের" সুপারিশ করেছিল।[৮৮]

স্বাধীনতা লাভের পর সরকার সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করলেন। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইক্ষুর দাম বিহারে মন প্রতি ১ টাকা ১৩ আনা এবং উত্তরপ্রদেশে ১ টাকা ১০ আনা ধার্য হল। ১৯৪৯-৫০ এ বিহার এই দাম কমিয়ে ১ টাকা ১০ আনা ৯ পাই করেছিল। কৃষকরা লাভজনক দামের জন্য হৈচৈ শুরু করল এবং একর প্রতি আখের উৎপাদন কমিয়ে দিল।[৮৯] নিম্নতম দাম নির্দিষ্ট করার সরকারী পরিকল্পনা চিনি কল মালিকদের প্রতিরোধের মুখে ভেসে গেল যারা "অতিরিক্ত উৎপাদনের" অভিযোগ করতে ছাড়েনি এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইক্ষু চাষীরা একটি শক্তিশালী সংগঠনের অভাবে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু চিনি শিল্পের সমস্যাটি কঠিন হয়ে উঠছিল। কেন্দ্রীয় ইক্ষু কমিটি দেখিয়েছিল যে চিনির দাম বিশ্বের অন্যান্য জায়গার দামের সমস্তরে নয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার তুলনায় একর প্রতি উৎপাদন কম।[৯০] অধিকাংশ চিনি কলগুলিতে বহু ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত এবং চিনিকল মালিকরা যারা মূলধন বাড়িয়ে তুলছিল, চিনি শিল্পের আধুনিকীকরণে তাদের খুব কমই আগ্রহ ছিল। তাৎপর্যের বিষয় হল যে মিলমালিকদের কয়েকজন ধনতান্ত্রিক কৃষির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

রাভালগাঁও চিনি খামার

ছোট খামারগুলির অটল প্রতিরোধ সত্ত্বেও বড়ো খামার গড়ে উঠল। যা আমরা লক্ষ্য করি তা হল কৃষি মজুরদের নিয়োগের ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক কৃষির উদ্ভব। চিনিকল মালিকরা বিশাল বিশাল খামার তৈরী করেছিল যেখানে শ্রমিকদের ব্যাপক সহযোগিতা ছিল।

১৯৩৪ এ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ পরিবার রাভালগাঁও চিনিখামার প্রতিষ্ঠা করে। ওয়ালচাঁদ এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত হয়। সুগার ফার্ম কোম্পানী বোম্বাইয়ের নাসিকে একটি চিনির কারখানা ও একটি চিনির খামার প্রতিষ্ঠা করে।[৯১] ধনবাদী কৃষির প্রতিমূর্তি স্বরূপ একটি চিনির খামারের ওপর আমরা এবার আলোকপাত করব। এটা লক্ষ্য করা উচিত যে দাক্ষিণাত্যের চিনিকলগুলির অধিকাংশ খাল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারা নিজস্ব বাগিচাতেই ইক্ষু উৎপাদন করত যার পরিমাণ ছিল ১২,০০০ একর। চিনিকলগুলি খাল অঞ্চলে কুড়ি বছরের জন্য জমি লীজ নিত এবং কৃষকদের সম্পত্তিচ্যুত করত। বাগিচাতে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য কৃষি মজুরদের ভাড়া করা হত।[৯২]

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য রাভালগাঁও খামারের পত্তন হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী ১৭৯০ একর জমি ক্রয় করেন যা ৯০,৯৩৫ টাকায় লীজের ভিত্তিতে ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ ক্রয় করেছিলেন।[৯৩] প্রত্যেক বছর কোম্পানী জমির একটা বড়ো অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে নিত। নীচের সারণীতে এটা স্পষ্ট যে কোম্পানীর অধিকৃত এলাকার আয়তন বছরের পর বছর বেড়েই যাচ্ছিল।

যদিও কোম্পানীর অধিকারে কয়েক হাজার একর জমি ছিল তবুও ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ এর মধ্যে ইক্ষু চাষের এলাকাধীন জমি ছিল গড়ে প্রায় ১৪,০০০ একর। ঠিকা ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি মজুররা নিযুক্ত হত এবং তাদের দৈনিক ৭ আনা মজুরী দেওয়া হত। এরা ছিল প্রাধানত সাময়িক মজুর যারা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ভাড়া হিসেবে খাটত। শ্রমিকদের তুলা উৎপাদনকারী জমিতে ঘন ঘন নিযুক্ত করা হলেও কোম্পানী মজুর ঘাটতির জন্য কখনও অভিযোগ করত না।[৯৪] একথা জানা নেই যে শ্রমিকরা ভূমিহীন ছিল কিংবা তারা ছোট এক টুকরো জমির মালিক ছিল।

২৫ নং সারণী

রাভালগাঁও খামারের এস্টেট (১৯৪০-৪৭)

বছর	লীজের অন্তর্ভুক্ত জমি (একর)	খাস জমি (একর)
১৯৪০	৩,৭৯০	৪,৬২৪
১৯৪১	৩,১৫০	৫,২৯১
১৯৪২	৩,৪০৪	৫,৪৮৪
১৯৪৩	৩,৪৮৬	৬,১৫০
১৯৪৪	৩,০৭৮	৬,৫০৭
১৯৪৫-৪৬	এন. এ	এন. এ
১৯৪৭	৩,৩৫০	৬,৫২৭

উৎস ঃ অ্যানুয়াল রিপোর্টস অফ রাভালগাঁও ফার্ম, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৫১২

সমগ্র এলাকার "সেচের জল ভালভাবে সরবরাহ করা হত।" প্রকৃত পক্ষে খাল অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়েছিল। মাঠগুলিতে "সাধারণত জলসেচ করা হত এবং সবুজ সার ব্যবহার করা হত।" রোপণ করার সময় থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মাঠে তৈরি সার প্রয়োগ করা হত। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আগে রাসায়নিক সারও ব্যবহার করা হত। কমিটির একটি গবেষণা কেন্দ্র ছিল যেখানে উচ্চফলনশীল বীজ সম্পর্কে গবেষণা করা হত। সমস্ত ফসলই চিনিকলে ব্যবহার করা হত। খামারটি কৃষিবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত যারা জাভা বা কোয়েম্বাটুর জাতের বীজ সরবরাহ করত, তবে লালচাঁদ মনে করতো যে উপস্থিত কর্ম-চারীদের খুব কম "ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা" আছে। প্রধানত কোয়েম্বাটুর জাতের বীজ সরবরাহ করা হত, একর প্রতি সর্বোচ্চ ফলন ছিল ৫২'৭ টন। ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে তা কমে গিয়ে ৩৬ টনে দাঁড়িয়েছিল। উৎপাদনের এই পড়তি অবস্থা হয়েছিল প্রধানত জলসেচের ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য; তাছাড়া "সাংঘাতিক রকমের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার অভাবও" ছিল। লালচাঁদ হীরাচাঁদ নিশ্চিতরূপে বলেছিলেন যে জলসেচের সুবিধা "বছর বছর প্রকৃতির খেয়ালীপনাকে কাটাতে সাহায্য করবে।"[২৫]

১৯৪০ এ কোম্পানী দুটি নোতুন দায়িত্ব গ্রহণ করল, দুগ্ধ কেন্দ্র এবং

তেল কল। দুগ্ধ কেন্দ্রে সবচেয়ে ভাল বংশজাত গবাদি পশু ছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে দৈনিক ১৫০০ পাউণ্ড দুধ উৎপাদন হত; ১৯৪১ এ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩,৩০০ পাউণ্ডে। পরিবহন সমস্যা সত্ত্বেও দৈনিক প্রায় ২৫ মণ দুধ বোম্বাইতে বিক্রী হত। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে যে বাদাম উৎপন্ন হত তেলের কলগুলি তা থেকে তেল নিস্কাশন করত। উৎপন্ন তেলের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১,০০০ মণ; বাদামের খোসা সার হিসেবে ব্যবহৃত হত। কোম্পানী উল্লেখযোগ্য খরচ করলেও ডেয়ারী ফার্ম ও তেলকলগুলি প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত কোনও মুনাফা করতে পারেনি।[৯৬]

সমবায় খামার সম্পর্কে লালচাঁদ হীরাচাঁদ যথেষ্ট সুস্পষ্ট মনোভাব পোষণ করতেন। স্থানীয় লোকজনদের ঈর্ষা এবং কৃষকদের ছোট জমির মালিকানাকে ধরে রাখা বিরাট বাধা হিসেবে মনে করা হয়েছিল। একটি কৃষি খামারকে টিঁকে থাকার জন্য "শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার এবং ছোট জমির মালিকানাকে উচ্ছেদ করে বড়ো বড়ো ভূখণ্ডের" প্রয়োজন ছিল।[৯৭] বস্তুত ছোট খামারগুলি ছিল সাংঘাতিক ভাবে ভঙ্গুর এবং এরা কৃষি আধুনিকীকরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছোট খামারগুলি উৎপাদনশীল শক্তিগুলিকে কিভাবে ব্যাহত করত মার্কস তা দেখিয়েছেন:

"ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তি তার নিজস্ব প্রকৃতিতেই শ্রমিকের সামাজিক উৎপাদনশীল শক্তির বিকাশ শ্রমের সামাজিক রূপ মূলধনের সামাজিক সংহতি বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিজ্ঞানের প্রগতিশীল প্রয়োগকে ব্যহত করে। মহাজনী ও করব্যবস্থা নিশ্চিত ভাবেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে এদের ধ্বংস করে।"[৯৮]

বাদাম

অর্থকারী ফসলের মধ্যে বাদাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যে ফসলের উৎপাদন বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে বর্তমান শতাব্দীতে বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে। বাদামের বড়ো রপ্তানী বাজার ছিল ফ্রান্সে; সারের জন্য ব্যবহৃত চীনে বাদাম জাত খোল ইংলণ্ড, জার্মানী এবং সিংহলে রপ্তানী হত। যে বাদাম তেল বিপুল পরিমাণে দেশেই ব্যবহৃত হত তার রপ্তানী বাজার ছিল ইউরোপ, সিংহল এবং মরিসাসে। ১৮৮০র দশকে এই ফসলের চাষের এলাকা ছিল মাত্র ১১২,০০০ একর এবং এর ৭০,০০০ একর জমি ছিল বোম্বাইতে ও ৩৪,০০০ একর ছিল মাদ্রাজে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মাদ্রাজ বাদাম উৎপাদনের প্রধান রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্লিন দেখিয়েছেন যে মাদ্রাজের উৎপাদন "খাদ্যশস্য নয় এমন ফসলের প্রায় অর্ধেক পরিমাণে পেঁছেছিল", এই বিপুল পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষের আওতাধীন বর্দ্ধিত এলাকাই স্বীকৃতিযোগ্য। এটা সম্ভবপর যে "চাষের এলাকার যত প্রসার ঘটল ক্রমশঃ নিকৃষ্টতর জমিও তত ব্যবহার করা হল।" এবং একর প্রতি ফলন কমে আসতে লাগল।[৯৯]

উনিশ শতকের শেষ দিকে চীনে বাদামের বাণিজ্য সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সংকট কাটিয়ে উঠতে শুরু করে যখন কৃষিবিভাগ সাফল্যের সঙ্গে সেনেগাল ও মোজাম্বিক থেকে অধিক তৈলাক্ত পদার্থ সম্পন্ন রোগ প্রতিরোধক বীজ ব্যবহার শুরু করে।[১০০] যদিও বাদাম প্রধানত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে (প্রধানত সোলাপুর ও সাঁতারায়) উৎপন্ন হত কিন্তু ১৯২৩ থেকে মাদ্রাজেও বাদামের উৎপাদনে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি দেখা গিয়েছিল। ১৯২৫-৩০ এর মধ্যে বৈদেশিক বাজারে গড়ে প্রায় ১৩ কোটি টাকার বাদাম রপ্তানী হত। আকস্মিক সমৃদ্ধির বছর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫৮৪,২৪১ টন বাদাম রপ্তানী করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হওয়ার পর রপ্তানী বাজার ভেঙ্গে পড়েছিল এবং সাংঘাতিকভাবে দাম কমে গিয়েছিল। এ সত্ত্বেও উৎপাদনের এলাকা প্রচণ্ডভাবে কমে যায়নি।

১৯৩৪ থেকে '৩৯ এর মধ্যবর্তী সময়ে মাদ্রাজে ও বোম্বাইতে কেন্দ্রীভূত চীনে বাদামের উৎপাদন ছিল গড়ে ২·১ মিলিয়ন টন। বিশ্বে চীনে বাদামের মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশী উৎপন্ন করত ভারত। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের দ্বারা মাদ্রাজ সরকার গবেষণা কেন্দ্র সমূহ স্থাপন করে, এই গবেষণা কেন্দ্রগুলি গবেষণা প্রদশনী এবং বাদামের উন্নত বীজ সরবরাহে নিযুক্ত ছিল। উন্নত বীজের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা ছিল, এদের মধ্যে কিছু বিশেষতঃ এ এইচ ২৫ এবং এ এইচ ৩২ বরোদা ও ঝাসিতে খুব ভালই কাজ করেছিল। ১৯৪৪-৪৫ এ মোট ৪৪,৫০০ পাউণ্ড বীজ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলন শুরু হলে চাষের আওতাধীন এলাকা কমে গেল। প্রকৃতপক্ষে কর্ষণযোগ্য এলাকা ১৯৩৯ এবং ৪৪ এর মধ্যে ১·৯ শতাংশ কমে গিয়েছিল। তথাপি বাদাম উৎপাদনে ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পূর্ববর্তী বছরের ৩·৫ মিলিয়ন একরের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫

এ বাদাম চাষের এলাকা বেড়ে ৩'৯ মিলিয়ন একরে পরিণত হয়েছিল।[১০০]

২৬ নং সারণী

মাদ্রাজে বাদাম চাষের জমির একর ও উৎপন্ন ফসলের হিসাব
(১৯১৫—৩১)

বছর	মোট এলাকা (000 একর)	একর প্রতি উৎপাদন (পাউণ্ডে)	রপ্তানী (০০০ টন)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯১৫—১৬	১,১৩৬	এন. এ	এন.এ
১৯১৬—১৭	১,৭৯৬	এন. এ	৬৭
১৯১৭—১৮	১,৪১৫	১,০৮৮	৬৩
১৯১৮—১৯	১,০০১	৯০০	৮
১৯১৯—২০	১,১৪৪	১,১২০	৫০
১৯২০—২১	১,৬০০	১,০৫০	৮৬
১৯২১—২২	১,৪৫৯	১,০৫০	২১
১৯২২—২৩	১,৭৫৪	১,০৫০	২২৫
১৯২৩—২৪	১,৮১২	৯২৩	২২৪
১৯২৪—২৫	১,৯০৪	১,১১৫	৩৫০
১৯২৫—২৬	২,৫০০	১০৮৯	৩৭০
১৯২৬—২৭	২,৬৮০	১০২৩	৩১৮
১৯২৭—২৮	৩,৩৩৭	১১১৮	৪৭২
১৯২৮—২৯	৩,৬৭৯	১১১৪	৫৮৪
১৯২৯—৩০	৩,২০৯	১,০৬২	৫৮৩
১৯৩০—৩১	৩,৫৭২	এন,এ	৪৫৭

উৎস : ভারতের জনগণনার রিপোর্ট, মাদ্রাজ, ১৯৩১, পৃ—২৩৯।

সেচ

এই প্রসঙ্গে কৃষিগত বিকাশের ওপর সেচের প্রভাবের দিকে তাকানো যাক। সেচের দ্বারা কিভাবে বাণিজ্যিক কৃষি উদ্দীপিত হয়ে থাকে তা পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি। এটা খুব সাধারণ কথা যে অন্যান্য সরবরাহ একই রকম থাকলেও জল সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থা

উৎপাদনকে বাড়ায়। উন্নত বীজ, সার এবং নোতুন কৃষিপদ্ধতির সহযোগে একর প্রতি উৎপাদন বাড়ে। প্রশ্ন হল সেচনীতির কী মূল লক্ষ্য ছিল। মনে হয়, খরার হাত থেকে রক্ষা ও নগদ ফসলের উৎপাদনের জন্য খালসেচ ব্যবস্থার স্বরূপ পরিকল্পিত হয়েছিল। আমরা দেখতে পাব সরকারের কাজের ফলে সেচভুক্ত এলাকায় অসম বণ্টন দেখা গিয়েছিল, সেচভুক্ত এলাকার অধিকাংশ ছিল পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও সিন্ধুতে।

ডালহৌসীর শাসনের সময় পূর্ত বিভাগ তৈরী হয় এবং জলসেচ বাবদ সরকারী ব্যয় কয়েকটি রাজ্যে শুরু হয়, বিশেষত যুক্তপ্রদেশ মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে। ১৮৫৩ এ জলসেচ ব্যবস্থার প্রবর্তক আর্থার কটন কৃষ্ণা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করেন। এর ফলে ১৮৬৪—৬৫ তে প্রায় ৩৫,০০০ একর জমিতে জলসেচ করা হয়। ১৮৬৪-৬৫র মধ্যে খালের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৬৪৮'৫ মাইল এবং এই খালের দ্বারা প্রধানত দোয়াব জেলাগুলিতে জলসেচ করা হত। ১৮৩০ সালে উন্মুক্ত পূর্ব যমুনা খাল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪৮ মাইল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নিম্ন গঙ্গা খাল তৈরী আরম্ভ হল। ১৮৭৪ এ আগ্রা খাল খুলে দেওয়া হল। এই খালের দ্বারা মথুরা ও আগ্রার জমিতে জলসেচ করা হত। প্রায় ৪৫০ মাইল দীর্ঘ বারি দোয়াব খাল ১৮৫৬ এ পাঞ্জাবে তৈরী হয়েছিল এবং সিরহিন্দ খাল তৈরী হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।[১০২]

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেশ বড়ো কয়েকটি দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়ে সরকার এদেশে জলসেচের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয়ে পারেনি। ১৯০১ এ সেচ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় যা শেষ পর্যন্ত সেচ সংক্রান্ত নীতি স্থির করে। মনে হয় খরার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশন "রাজ্যের জলসেচ ব্যবস্থার নির্মাণের ওপর" প্রধান জোর দিয়েছিলেন। এটাও দেখানো হয়েছিল যে "বে সরকারী কাজের মাধ্যমে জলসেচের প্রসারকে" উৎসাহিত করা উচিত।[১০৩] ডঃ থাভারাজ দেখিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত সেচ বাবদ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল যদিও এই ব্যয় ছিল রেল ও দেশ রক্ষা বাবদ বিপুল ব্যয়ের সামান্য অংশ মাত্র।[১০৪] ১৯৩০ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রধান কাজ শুরু বা শেষ হয়েছিল তা হল পাঞ্জাব ও সিন্ধু ক্যানাল কলোনী ওয়ার্কস, দি ট্রিপল ক্যানাল প্রজেক্ট, উত্তর প্রদেশে সারদা ক্যানাল, সিন্ধুতে সুক্কুর ব্যারেজ এণ্ড ক্যানাল, মাদ্রাজে

কাবেরী মেট্টুর জলাধার। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সরকারী নীতির প্রধান সুর ছিল সরকারী আয় ব্যয় সঙ্কোচন এবং ব্যয়ের সমস্ত দপ্তরগুলি প্রচণ্ডভাবে খরচ কমিয়ে দিয়েছিল। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে জলসেচভুক্ত মোট এলাকা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩২'৫ মিলিয়ন একর থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮১ মিলিয়ন একরে দাঁড়িয়েছিল।[১০৫] ব্লিন বলেছেন যে 'অতিরিক্ত জলসেচভুক্ত এলাকার" বেশীর ভাগই ছিল পাঞ্জাব, বোম্বাই এবং সিন্ধুতে। পাঞ্জাবের শুষ্ক জমিতে "প্রায় অকর্ষিত জমি" জলসেচের ফলে চাষের উপযুক্ত হয়েছিল।

সরকারী রিপোর্টগুলিতে এ বিষয়ে ক্রমাগত লেখা হত যে জলসেচের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে বাড়াতে হবে। যে সব বিষয়ে প্রায় কোন গুরুত্ব দেওয়া হত না তা হল নলকূপ ও খননকূপের প্রসার, ভূমি সংরক্ষণ ও জমি সমতল করার জন্য প্রয়োজন মূলধনী সরঞ্জাম এবং সেটা সংগ্রহের জন্য ঋণ। তথাপি মনে হয়, ভূস্বামীরা ও ধনী কৃষকরা কয়েকটি অঞ্চলে কুয়ো এবং জলাশয় নির্মাণে মূলধন প্রয়োগ করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাঞ্জাবের কুয়ো নির্মিত হয়েছিল জমিদার বা জমিদার গোষ্ঠীর দ্বারা। ১৯২০-৩০ এর দশকে ইঁদারার সংখ্যা ২৬৫,৮৭৯ থেকে ২৯২,১০২ এ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১০৬] বেয়ার্ড স্মিথ হিসেব করেছিলেন যে ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশের দোয়াব অঞ্চলে ১'৪ মিলিয়ন একর জমি কুয়ো দ্বারা জলসেচ করা হত; কুয়োর দ্বারা জলসেচের ক্ষেত্রে "সেচ খালের দ্বারা জলসেচের তুলনায় সন্দেহের অবকাশ কম।"[১০৭] দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশন রিপোর্ট করেন যে রায়তরা "ধার করা মূলধন" নিয়ে কুয়ো খুঁড়ত এবং আমেদাবাদে লাখ ক্যানালের জল ব্যবহার করার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিল না।[১০৮] আপাতভাবে ধনীকৃষকরা জলসরবরাহের একটি নিশ্চিত ব্যবস্থার বিশেষত শুষ্ক অঞ্চলের সুবিধাসমূহ বুঝতে পেরেছিল, যদিও এটা পরিষ্কার নয় ঠিক কিভাবে পাকা কুয়ো খননের খরচ বহন করা হয়েছিল।

একর প্রতি উৎপাদন ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অঞ্চলগত বৈষম্যের বিষয়টি পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্লিন কতকগুলি আলোকপাতকারী মন্তব্য করেন। বৃহত্তর বাঙলায় একর প্রতি ধান উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে কমে যাবার বিষয়টি ধান উৎপাদন থেকে পাট উৎপাদনে চলে যাওয়া অথবা পদ্মা, ভাগীরথী এবং গঙ্গা নদীর মধ্যেকার মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চলের বন্যার প্লাবন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। পাট চাষের আওতাধীন

এলাকা ছিল মাত্র ৩ মিলিয়ন একর অথচ ধান চাষের এলাকা ছিল প্রায় ৩৫ মিলিয়ন একর। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর এবং অংশত খুলনা বন্যার প্লাবনে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু এই সব জেলা গুলিতে প্রকৃত চাষের এলাকা ছিল প্রায় ৩ মিলিয়ন একর মাত্র। আশ্চর্যের বিষয় কৃষক উন্নত বীজ খুব কমই ব্যবহার করত। সমগ্র ধান চাষের এলাকার মাত্র ৭ শতাংশ উন্নত জাতের ধান চাষ করা হত। সেখানে জল-সেচ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল সেই পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে একর প্রতি গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা উর্ধগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উন্নত জাতের গম চাষের এলাকা ১৯২২-২৩ এ ১৯৩৮-৩৯ এ ৩০ শতাংশে পৌঁছেছিল। ইক্ষু ও তুলার একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত। জলসেচ ব্যবস্থা একর প্রতি উৎপাদনে অতিরিক্ত উৎসাহ যুগিয়েছিল। চীনে বাদামের ক্ষেত্রে উন্নত বীজের ব্যবহার ছিল সীমিত, সে কারণে একর প্রতি উৎপাদন ছিল কম।"১০৯

সেচ ব্যবস্থা চাষের আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি এবং একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অবদানমূলক উপাদান, কিন্তু প্রধানত উন্নত বীজ ব্যবহারের ফলেই একর প্রতি উচ্চফলন সম্ভবপর হয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন জাতের উন্নত বীজ সম্পর্কে গবেষণা বিলম্বিত ও দুর্বল অবস্থায় ছিল।

সমগ্র দেশ জুড়ে ছোট কৃষকের খামার ছিল উৎপাদনের চিরাচরিত রূপ এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছিল ভ্রূণাবস্থায়, বিশেষত পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার সত্ত্বেও ছোট কৃষকরা দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। নোতুন উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে আমরা যে কারিগরী পরিবর্তনগুলি যুক্ত করে থাকি, তার সূচনা হয়নি বললেই চলে। কৃষির বদ্ধাবস্থার জন্য যে কারণ দায়ী, একেই তার প্রধান উপাদান বলে মনে হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশের জন্য ধনী কৃষকদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে হত, যাতে সে উদ্যোগপতির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এবার গ্রামীণ ঋণের সমস্যাগুলির দিকে তাকানো যাক।

নির্দেশিকা

১। রিপোর্ট অফ দি বম্বে চেম্বার অফ কমার্স (১৮৩৬-৩৭)। ব্রিটিশ ফার্মগুলির অধিকাংশ বোম্বাই থেকে তুলা রপ্তানী করত।

২। সেন, দি হাউস অফ টাটা (১৮৩৯-১৯৩৯) পৃ—৭-১০।

৩। কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১২২।

৪। জে ফরবস্ রয়লে রিভিউ অফ দি মেজারস্ অ্যাডোপ্টেড ফর দি ইমপ্রুভড্ কালচার অফ কটন, ১৮৫৭।

৫। বোম্বে কমার্শিয়াল রিপোর্টস, ১৮৫৩-৫৮।

৬। রিপোর্ট অফ বম্বে চেম্বার অফ কমার্স, ১৮৬০-৬১, ১৮৬৪-৬৫।

৭। অ্যালেন, এ সর্ট ইকনমিক হিস্ট্রি অফ মডার্ণ জাপান, ১৯৭২, পৃ-৭৩। ১৮৯০ এর দশকে ভারতীয় তুলা জাপানের বাজার থেকে চীনা তুলাকে হটিয়ে দিয়েছিল।

৮। কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৩৫।

৯। পিটার হারনেট্টি, 'কটন একসপোর্টস অ্যান্ড ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার (১৮৬১-৭০), দি ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ, আগস্ট ১৮৭১। হারনেট্টির বক্তব্য, তুলোর দাম বৃদ্ধির ফলে কৃষক সমাজ উপকৃত হয়েছিল।

১০। লেটার অফ বম্বে চেম্বার (২১ শে জানুয়ারী, ১৮৪১), রিপোর্ট অফ বম্বে চেম্বার অফ কমার্স (১৮৪১) এ উল্লিখিত।

১১। ফরবস্ রোয়লে, পূর্বোল্লিখিত।

১২। ঐ।

১৩। এস স্মিথ, দি এক্সটেন্ট অফ কটন প্রোডাকসন ইন ইন্ডিয়া, ১৮৬৩। তুলো চাষের এলাকাগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল গুজরাট, দাক্ষিণাত্য (বেরার ও খান্দেশ), দক্ষিণ মারাঠা রাজ্য (ধারওয়াড়)।

১৪। রিপোর্ট অফ দি ইন্ডিয়ান কটন কমিটি (১৯১৯), কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ-১২২।

১৫। লেটার অফ প্রাইস টু দি কালেকটর অফ খান্দেশ, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৪৯, ট্র্যাক্টস, সংখ্যা ৩৬৬।

১৬। সেন, ইকনমিক পলিসি, পৃ—১১৯-২৪।

১৭। ফরবস্ রোয়লে, পূর্বোল্লিখিত, কটন পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১২৪।
১৮। কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১২৪-২৫।
১৯। সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব, ১৯৩১।
২০। ঐ
২১। ব্লিন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৬৭-৬৮, ২০১।
২২। সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব, ১৯৩১, রিপোর্ট অফ কে. এ. এইচ খান।
২৩। হুইটকম্ব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৭৮-৭৯।
২৪। কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১২৮।
২৫। ঐ, পৃ—১২৬-২৭।
২৬। সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ, ১৯৩১, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে চাষের অন্তর্ভুক্ত এলাকার ৯০ শতাংশ জমি ১৯৩১ এ সেচের আওতায় ছিল।
২৭। ঐ।
২৮। এ চ্যাটারটন, ইনডাষ্ট্রিয়াল ইভোলিউসন ইন ইণ্ডিয়া, ১৯১২, এ ছাড়াও সেন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৮৫।
২৯। সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ, ১৯৩১।
৩০। রিপোর্ট অফ রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার (১৯২৭), ৩য় খণ্ড, পৃ—৪১-৪৩।
৩১। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার (১৯৩০), পৃ—৬৭।
৩২। মিলমালিকদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে হোমি মোদী ঠাকুরদাসকে লেখেন "সংগ্রাম অব্যাহত থাকলে বাণিজ্যিক ও শিল্পপতি সমাজের" "বিপর্যয় আসবে। বল্লভভাই প্যাটেল তাদের বলেছিলেন যে বিদেশী বস্ত্র বর্জন মিলগুলিকে তাদের কিছু পণ্য বিক্রী করতে সাহায্য করা উচিত।" ঠাকুরদাস পেপারস, ফাইল নং ১০০/১৯৩০।
৩৩। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩।
৩৪। ঐ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩।
৩৫। ঐ, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৩।
৩৬। ঐ, ২রা এপ্রিল, ১৯৩৩।
৩৭। ঐ, ২০শে এপ্রিল, ১৯৩৩।

৩৮। ঐ, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৩।

৩৯। ঐ, ১লা মে ১৯৩৩।

৪০। ঐ, ৩রা মে, ১৯৩৩।

৪১। ঐ, ১৭ই জুন, ১৯৩৩। সুতাকলগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪০৭, ১৮৯ জন। এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪০২,৭৬০ জন। সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া টুডে, দি ইকনমিষ্ট, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬।

৪২। মরাল অ্যাণ্ড মেটেরিয়াল প্রগ্রেস রিপোর্ট (১৯৩২-৩৩)।

৪৩। স্টেটসম্যান, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২।

৪৪। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২৯শে মার্চ, ১৯৩৪। চেম্বারলেন হাউস অফ কমনস-এ বিবৃতি দেন যে ভারতীয় তুলা ক্রয় করার বিষয়টি সরকার প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না।

৪৫। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চেম্বার, (১৯৩৭)। চেয়ারম্যান লেখেন যে টাকার মূল্য বৃদ্ধির জন্য কৃষিজীবীরা তাদের রপ্তানীর জন্য কম দাম পাচ্ছে। তৈলবীজের দাম ৫০ শতাংশ কমে গেছে। তুলার দামের হ্রাস সম্পর্কে অনুসরণের জন্য এ. আই. সি. সি. ভুলাভাই দেশাই ও বাজাজকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন।

৪৬। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার, (১৯৪২, ১৯৪৩)।

৪৭। রিপোর্ট অন দি অপারেশনস অফ দি ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচার, মাদ্রাজ, (১৯৪৪-৪৫) পৃ—৮।

৪৮। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার (১৯৪৩)।

৪৯। রিপোর্ট, ১৯৪৪।

৫০। ডারলিং, দি পাঞ্জাব পেজেণ্ট ইন প্রসপারিটি অ্যাণ্ড ডেট্, ১৯২৫, পৃ—২০৮-১১।

৫১। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ. ১৯০৮ পৃ—৪৮-৪৯।

৫২। রিপোর্ট অফ ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি (১৯২৯-৩০), মাদ্রাজ, পৃ—২৯৮।

৫৩। ঐ, পৃ—৬৬৪।

৫৪। এই কারখানাগুলি বছরে ৫,৫০০ টন খড় কাটার যন্ত্র এবং ৩,০০০ টন অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরী করত, উন্নত যন্ত্রপাতি অনী

রাজ্যেও রপ্তানী করা হত। লুধিয়ানাতে জলসেচের ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার সঙ্গে ট্রাকটরের সাহায্যে চাষ জনপ্রিয় হচ্ছিল। সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব, জলন্ধর জেলা, লুধিয়ানা জেলা, ১৯৫১।

৫৫। রিপোর্ট অন দি অপারেশনস অফ দি ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচার, মাদ্রাজ, ১৯৪৪-৪৫, পৃ—৩, ৩১, ৫০—৫১। উন্নত যন্ত্রপাতি জনপ্রিয় কারবার জন্য কৃষি বিভাগ ব্যবস্থা নিয়েছিল।

৫৬। রিপোর্ট অফ সেণ্ট্রাল কটন কমিটি (১৯৪০), পৃ—৭৫-৭৭।

৫৭। সেন, দি হাউস অফ টাটা, পৃ—৬৫, এ ছাড়াও নবম পরিচ্ছেদ।

৫৮। রিপোর্ট অফ সেণ্ট্রাল সুগারকেন কমিটি (১৯৪৮-৪৯), পৃ-৪৮। ১৯৪৭-৪৮ এ ৬৩টি চিনিকল ছিল ইউ পি তে, ২৯ টি বিহারে, ১১টি মাদ্রাজে, ১০টি বোম্বাইতে, ১টি পূর্ব পাঞ্জাবে, ৩টি পশ্চিম বাঙলায় ; এই চিনিকলগুলিতে প্রায় ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল, ১'৫ লক্ষ শ্রমিক কলগুলিতে নিযুক্ত ছিল।

৫৯। গেজেটিয়ার, বেরেলী (১৯৬৮)।

৬০। গেজেটিয়ার, ফৈজাবাদ, (১৯৬৮)।

৬১। গেজেটিয়ার, আগ্রা, ১৯৬৫।

৬২। গেজেটিয়ার, মথুরা, (১৯৬৫)।

৬৩। গেজেটিয়ার, মোরাদাবাদ, (১৯৬৮)।

৬৪। মীরাট ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯০৪)।

৬৫। ও ম্যালি, মজঃফরপুর ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার ১৯০৭। ও ম্যালি লিখেছেন যে ইক্ষুচাষের জন্য দরকার বিস্তর শ্রম ও অর্থ ; সাত আটবার জল দিতে হয় ইক্ষুর ক্ষেতে।

৬৬। সাহাবাদ ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯০৬)।

৬৭। চম্পারণ ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯০৭)।

৬৮। সারাণ ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯০৮)।

৬৯। গয়া ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯১৯)।

৭০। মুঙ্গের ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯০৯)।

৭১। পালামৌ ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার (১৯০৭)।

৭২। দ্বারভাঙ্গা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯০৭)।
৭৩। গ্রীণের বক্তৃতা, সিমলা সম্মেলনের (১৯৪০) বিবরণী, ওয়াল-চাঁদ হীরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৪৯৪।
৭৪। রিপোর্ট অন দি অপারেশনস অফ দি ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচার, মাদ্রাজ, ১৯৪৪-৪৫।
৭৫। টি, এম ভেঙ্কটরামন টু লালচাঁদ, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৩২৮।
৭৬। লালচাঁদ হীরাচাঁদের বক্তৃতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, ওয়াল-চাঁদ হীরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৩২৮।
৭৭। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান সুগার কমিটি (১৯২০)।
৭৮। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বার অফ কমার্স (১৯৩৭)।
৭৯। হুইটকম্ব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২২, ২৩।
৮০। ঐ, পৃ—১৭৬।
৮১। ঐ, পৃ—১৭৭-৭৮।
৮২। এস আমিন, ডিপেণ্ডেণ্ট পেজেণ্ট্রি অ্যাণ্ড দি কমোডিটি সার্কিট: এ কেস স্টাডি অফ সুগারকেন ইন ইস্টার্ণ ইউ পি (১৮০০-১৮৪০)।
৮৩। হুইটকম্ব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৬৯।
৮৪। সাক্সেনা রিপোর্ট (১৯৪০) আমিন এর লেখায় উল্লিখিত, আমিন লিখেছেন যে পুঁজির মাধ্যমে ঋণ দেবার ব্যবস্থাটি চালু হয়ে পড়ে, যার ফলে ফসলের দাম কার্যত নিয়ন্ত্রিত হয় মালিকের দ্বারা।
৮৫। আমিন পূর্বোল্লিখিত।
৮৬। ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড, রিপোর্ট অব সুগার (১৯৩৮)।
৮৭। জে, কার্জির ইমিডিয়েট প্রবলেমস অফ বিহার পেজেণ্ট্রি, অমৃত-বাজার পত্রিকা, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৭ দ্রষ্টব্য। ইক্ষু চাষের মন প্রতি উৎপাদন খরচ গড়ে প্রায় ৭ আনা হয়েছিল।
৮৮। সিমলা সম্মেলনের বিবরণী (জুন, ১৯৪০)। ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৪৯৪। ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিনিধিত্ব করেন লালা শ্রীরাম, সুগার সিণ্ডিকেটের পক্ষে বি এম বিড়লা এবং ডেকান সুগার ফ্যাক্টরিস অ্যাসোসিয়েসন এর পক্ষে লালচাঁদ হীরাচাঁদ।

আপাতদৃষ্টিতে মিল মালিকরা ছিল বিভক্ত। সুগার সিন্ডিকেট চিনিকলের অনিয়ন্ত্রিত প্রসারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; তারা যুক্তপ্রদেশ চিনিকলগুলির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল।

৮৯। অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দি ওয়ার্কিং অফ দি সুগারকেন ডিপার্টমেন্ট, বিহার (১৯৫০-৫১), পৃ-২৩।

৯০। রিপোর্ট অফ সেন্ট্রাল সুগারকেন কমিটি (১৯৪৮-৪৯)।

৯১। অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ রাভালগাঁও সুগার ফার্ম (১৯৩৪). ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ পেপারস্, ফাইল নং ৫১০।

৯২। ১৯৩৮ এর ১৫ই আগস্ট বোম্বে সেন্টিনেল রিপোর্ট করেন যে জমি পুনরুদ্ধারের জন্য ভি বি কার্নিকের নেতৃত্বে জমিচ্যুত কৃষকরা সত্যাগ্রহ শুরু করেন। ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ পেপারস, ফাইল নং ৫০০।

৯৩। ঐ ফাইল নং ৫১২

৯৪। ঐ, ফাইল নং ৫১০।

৯৫। লালচাঁদ টু ভেঙ্কটরামন, ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩, ঐ, ফাইল নং ৫২১।

৯৬। ঐ, ফাইল নং ৫১০।

৯৭। লালচাঁদ টু ভেঙ্কটরামন, ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ; ঐ, ফাইল নং ৫২১।

৯৮। মার্কস, ক্যাপিটাল, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, এ ছাড়াও লেনিন, ডেভেলপমেণ্ট অফ ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া, ১৯৫৬, পৃ—৩৫০। লেনিন কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশকে প্রগতিশীল মনে করতেন ; ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তি হল স্বাধীন শ্রমিকের নিয়োগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, "অট্রাবটকির" (otrabotki) বিলোপ। রাশিয়ার "অট্রাবটকির" সঙ্গে বাঙলার "বর্গা" প্রথার পারিবারিক সাদৃশ্য আছে।

৯৯। ব্রিন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১১১, ১৬৪।

১০০। কটন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৭।

১০১। রিপোর্ট অন দি অপারেশনস অফ দি ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচার, মাদ্রাজ, ১৯৪৪-৪৫, পৃ—২৭। ১৯৪১-৫১ এর দশকে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল, যার ফলে কৃষকরা লাভবান

হয়েছিল। সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৫১, পৃ—১৩।

১০২। দত্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৬৮-৭৩ ; হুইটকম্ব পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৬৪-৬৭। ১৮৬৭-৬৮ তে লরেন্স ফলপ্রসূ সেচ গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন ; অবশ্য সেচে সরকারী ব্যয় ছিল স্বল্প।

১০৩। রিপোর্ট অফ ইরিগেশন কমিশন (১৯০১-০৩), পার্ট-১, পৃ—১২৫-৩০, কমিশন লক্ষ্য করেছিল যে শুধুমাত্র সেচের দ্বারা দেশকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না, কিন্তু জলসেচ "দুর্ভিক্ষের তীব্রতাকে হ্রাস করতে পারে।"

১০৪। থবরাজ, রেট অফ পাবলিক ইনভেস্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া (১৮৯৮-১৯৩৮)।

১০৫। ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, পৃ—৩৩৬।

১০৬। সেনসাস অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব, ১৯৩১।

১০৭। হুইটকম্ব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৬৮-৭৪। ভালভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচের ওপর হুইটকম্ব গুরুত্ব আরোপ করেছেন, জাঠ কৃষকরা এর উপরই নির্ভর করত ; সেচ অর্থকরী ফসল উৎপাদনের সূচনা করেছিল যদিও বেশীর ভাগ কৃষককে জীবন ধারণের জন্য জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন করতে হত।

১০৮। রিপোর্ট অফ ডেকান রায়টস কমিশন, ১ম খণ্ড, ১৮৭৬, পৃ—৪১। মহাজনরা ভাল সেচের জন্য খুব কমই মূলধন বিনিয়োগ করত।

১০৯। ব্লিন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৫৮-৬০, ১৬৩, ১৬৪, ২৩৯।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কৃষিগত দেনা ও ঋণ

ছোট কৃষক ও খাজনা দাতা প্রজার দারিদ্র্য, কৃষি দেনার বিপুল বোঝা, সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের মহাজনদের কাজ থেকে চড়া সুদে ঋণ সংগ্রহ করা ছিল ব্রিটিশ রাজত্বে কৃষিগত কাঠামোর একটি সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য। বেঁচে থাকার জন্য এবং ঊর্ধ্বমুখী খরচ মেটাবার জন্য ছোট কৃষকদের ধার করতে হত, কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার পথে তাদের প্রধান বাধা ছিল হাতে নগদ টাকার অভাব। কৃষকের দারিদ্র্যই ছিল সেই জমি যার ওপর মহাজনী গড়ে উঠেছিল। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখার পক্ষে ছিল মহাজনদের স্বার্থ। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ছোট কৃষক ও প্রজাদের স্বার্থ পূরণের উপযোগী ছিল না এবং সমবায় সমিতির আন্দোলন বিশেষ কিছু এগোতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে ঋণদান সমিতিগুলি অনির্দেশ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, কৃষি উৎপাদন প্রসারের পথে ঋণদান সংস্থার অভাব বা অনুপযুক্ততা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারী রিপোর্টে কৃষি দেনা ও কৃষকদের ঋণদানের সংখ্যাগত হিসেব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা আছে কিন্তু কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনের জন্য ঋণদানের উপযোগী বিশেষ কিছু করা হয়নি। বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঋণের সমস্যাটি সব শ্রেণীর কৃষকের কাছে তীব্র হয়ে দাঁড়াল এবং ব্যবসায়ী ও মহাজনী মূলধনের বিষয়টি অগ্রবর্তী হয়ে দাঁড়াল।

গ্রামীণ ঋণের সমস্যা সম্পর্কে একটা ধারণা করার জন্য আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিগত দেনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে দেখব। দেখা যাবে, কৃষি অর্থনীতিতে তেজারতি বা সুদের কারবার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলছিল। গ্রামের অর্থনীতিতে টাকা পয়সার চল যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রাক ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক কেন এত জোরের সঙ্গে এদেশে টিঁকে ছিল তা বোঝার জন্য এ বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য

কিভাবে উত্তর বাংলার দিনাজপুরের জেলায় বর্গাদার ও ছোট কৃষকরা ধান কর্জ করার জন্য বড়ো ভূস্বামীদের উপর নির্ভর করত, তা উনিশ শতকের প্রথম দিকে বুকানান হ্যামিলটন বর্ণনা করেছেন। বর্গাদার ও

কৃষকদের অধিকাংশ "তাদের নিজস্ব মজুদ শস্যের মূল্যের চেয়েও বেশী ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকত এবং ধনী কৃষকরা তাদের খাদ্যের জন্য অগ্রিম শস্য না দিলে বছরে ছ মাস উপবাসে থাকতে হত।" বড়ো চাষীরা "তাদের অগ্রিম দেওয়ার সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে প্রচুর মুনাফা আদায় করত।" "খড় থেকে শস্য ঝাড়াই করার মুহূর্তেই চাষীদের দেনা শোধ করার কথা বলা হত।" ভূস্বামীদের দ্বারা শোষিত হওয়ার জন্যই যে কেবল কৃষকরা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ত তা নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অভাব সৃষ্টি হত বিবাহ ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে খরচের অভ্যাসের দরুন।[১]

ধান কর্জ দেওয়ার ব্যবস্থা বছরের পর বছর চলছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সেটেলমেণ্ট অফিসার এফ ও বেল দিনাজপুর জেলায় এই ব্যবস্থাকে বর্ণনা করেছেন: "জেলার পশ্চিমভাগের পাঁচটি থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল যে ৫০৪ টি পরিবারের মধ্যে ১৫৬ টি পরিবার দেড়া সুদে শস্য [ধান] কর্জ নিয়েছিল, সুতরাং প্রায় ৩০ শতাংশ পরিবার এইভাবে সাহায্য পেয়েছিল। ঋণ গ্রহীতাদের বড়ো অংশ ছিল আধিয়ার, এবং ঋণগ্রস্ত পরিবারদের ৪২ শতাংশ প্রজাস্বত্বের চেয়ে আধি ব্যবস্থাতেই বেশী জমি চাষ করত। মোটের ওপর, ঋণগ্রস্ত পরিবারের ২৯ শতাংশ প্রজাস্বত্বের অধিকারী হিসেবে এক একরেরও কম জমির মালিক ছিল। ১৩৪৪ সালের শুরুতেই যেমন বৈশাখে সামান্য পরিমাণে কর্জ করা হয়েছিল কিন্তু সবচেয়ে বেশী ধার করার মাস হল আষাঢ়…মাঘ এবং ফাল্গুন ছিল প্রধানত ধার শোধ করার মাস। ১৫৬ টি পরিবার ৯৯টি ভিন্ন ঋণ-দাতার কাছে ঋণী ছিল, ৩ জন ব্যতীত যারা সকলেই ছিল জোতদার… সাধারণ চুক্তির শর্ত ছিল যে প্রতি মন কর্জের জন্য দেড়মন শোধ দিতে হবে…কখনও কখনও দ্বিগুণও দাবী করা হয়…সম্ভবত এই ফসল কর্জ দেওয়ার মধ্যে কিছুটা দয়া দাক্ষিণ্যের উপাদান আছে। এই কর্জ নেওয়া হত চাষের খরচ খরচা মেটাবার জন্য নয়, ঋণ গ্রহীতার বেঁচে থাকার নিম্নতম প্রয়োজন মেটাবার জন্য।"[২]

বেল যা লক্ষ্য করেন নি তা হল, যখন ধান ও চালের দাম বেড়ে গেল, তখন কর্জ দেওয়ার ব্যবস্থাটি লাভজনক হয়েছিল। ভূস্বামীরা দেড়া সুদের কর্জের ফসল আদায় করত, ফসল মাড়াই করার সময়ই তা সংগ্রহ করা হত, এই ব্যবস্থাগুলি ক্রমপ্রসারমান মহাজনী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

মহাজনী কারবার ভূস্বামীদের পক্ষে লাভজনক ছিল বলে উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তনের কোনও আগ্রহ তাদের ছিল না। মহাজনী কারবারের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন ঃ

"যেখানে উৎপাদনের উপাদানগুলি ছড়ানো থাকে সেখানে মহাজনী কারবার আর্থিক সম্পত্তিকে কেন্দ্রীভূত করে। এই প্রথা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন সংগঠিত করে না বরং তাকে আরো দুর্বল করে। এটা এর রক্ত শুষে নেয়, একে আরো পঙ্গু করে এবং পুনরুৎপাদনকে আরো নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে চলতে বাধ্য করে।[৩]"

বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি কৃষি ঋণের একটি চমৎকার পর্যালোচনা করেছেন, যে বিষয়টি আমরা ব্যবহার করব। কৃষকরা "খুবই কঠোর শর্তে" কর্জ ধানের বোঝা বহন করত, কর্জা দাতা সাধারণত ফসল কাটার কাছাকাছি সময়ে একজন ব্যক্তিকে পাঠায় এবং সে প্রাপ্য ফসল নিয়ে নেয়। প্রধানত ব্যবসায়ী এমন মহাজন উৎপন্ন ফসল আত্মসাৎ করার জন্য নগদ টাকা কর্জ দিত। পূর্বের একটি অংশে পাটচাষের প্রসঙ্গে আমরা দাদন ব্যবস্থা বর্ণনা করেছি। ১৯২৯ এ ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল ঃ "যে সমস্ত কৃষকরা দাদন নিত, তাদের চলতি বাজার দরের থেকে অনেক কম দামে সেই নির্দিষ্ট ফসল দিয়ে দিতে হত। বিক্রী না করে ফসল মজুদ করে রাখার ক্ষমতা ঋণদাতার ছিল ; তাই সে চড়া দামে পাট বেচতে পারত এবং এই কারণেই তারপক্ষে দাদন ব্যবস্থাকে আঁকড়ে রাখার পক্ষে প্রতিটি যুক্তি ছিল। ঋণের শর্তগুলি কৃষকের দারিদ্র্যকেই প্রতিফলিত করত, কৃষকদের আয়ের একটি বড়ো অংশ ঋণ এবং অন্যান্য খরচ খেয়ে নেয়, যা ঋণ পরিশোধকে খুব কঠিন করে তোলে।" প্রায়ই অতিরিক্ত ধার করে ঋণ শোধ করা হত। ব্যবসায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের নিরক্ষরতা ও ব্যবসা সম্পর্কে অজ্ঞতাকে কখনও কখনও "ঋণদাতা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে।" কোনও রকম বন্ধক না রেখেই দাদন বা অগ্রিম দেওয়া হত ; কিছু পরিমাণ ধার লিখিত দলিলের ভিত্তিতে মঞ্জুর করা হত।[৪]

প্রায়ই বন্ধক দিয়ে ঋণ সংগ্রহ করতে হত। বন্ধকের চলতি রীতি ছিল "সাধারণ বন্ধক কিন্তু শর্তাধীন বিক্রীর (কট কবালা) ভিত্তিতে বন্ধক এবং 'ইংলিশ মর্টগেজ ও অজানা ছিল না।" মহাজনরা যথা সময়ে সুদ দেওয়ার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করত যা তাদের আয়ের প্রধান উৎস গড়ে তুলত। ঋণের সংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ ছিল জামিনবিহীন এবং ২০

শতাংশ ছিল জামিন সাপেক্ষ। জামিনের প্রকৃতি ও ঋণের পরিমাণ অনুসারে সুদের হারের পার্থক্য হত ; ভাল জামিন না থাকলে চড়া সুদ ধার্য করা হত, এবং অল্প পরিমাণ ঋণও 'চড়া সুদের ব্যাপার" ছিল। সুদের হারে একটি "অসাধারণ বৈচিত্র্য" ছিল। নীচের সারণীতে দেখা যায়, এই ধরণের সুদ পূর্ব ও উত্তর বাঙলার চেয়ে পশ্চিম এবং মধ্য বাঙলায় কম ছিল।[৫]

২৭নং **সারণী**

বাঙলার জেলাগুলিতে মহাজনদের সুদের হার

(১৯২৯)

জেলা	বার্ষিক শতাংশের হিসাব
বর্দ্ধমান	১৫ থেকে ১৭৫
বাঁকুড়া	১৫ ,, ৩৭½
মেদিনীপুর	১৫ ,, ২৫
২৪ পরগণা	১৫ ,, ১৫০
ঢাকা	১২ ,, ১৯২
ময়মনসিংহ	২৪ ,, ২২৫
বাখরগঞ্জ	২৪ ,, ১০০
ফরিদপুর	১৫ ,, ১৫০
রাজশাহী	১৮ ,, ৭৫
দিনাজপুর	২৪ ,, ৭৫
রংপুর	৩৭ ,, ৬৬
দার্জিলিং	৩০ ,, ৬০
হাওড়া	১২ ,, ১৭৫
হুগলী	১২ ,, ৩৭

উৎস : বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট (১৯২৯-৩০), প্রথম খণ্ড, পৃ ১৯৮।

১৯২১ এর জনগণনার বিবরণীতে দেখা যায়, কৃষিগত ঋণ বিগত দশকগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা হল বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তার, মূল্যবৃদ্ধি এবং খাজনা বৃদ্ধির জন্য ভূস্বামীদের চেষ্টার ফল। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার ফরিদপুরে বাড়ী

বাড়ী অনুসন্ধান চালিয়ে জ্যাক দেখেছিলেন যে গড়ে প্রতি কৃষক পরিবারের ঋণ ছিল ৫৫ টাকা, কিন্তু ৫৫ শতাংশ চাষী ঋণ থেকে মুক্ত ছিল। ১৯২৯ এ বেঙ্গল ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি কৃষিগত ঋণের একটা হিসেব করেছিলেন। গড়ে প্রতি পরিবারের কৃষিঋণ ছিল ১৬০ টাকা; মাথাপিছু ঋণ ৩১ টাকা, এবং ঋণের মোট পরিমাণ হয়েছিল ৯৩ কোটি টাকা। কিন্তু কৃষক ঋণ হিসেবে ধানও পেয়েছিল যা মোট ঋণের প্রায় ৫ শতাংশ ছিল। সুতরাং মোট কৃষিঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মোটামুটি ১০০ কোটি টাকা।[৬]

কৃষিঋণের সঙ্গে মূল্যের সম্পর্ক ছিল কি-না এ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এটা সাধারণ ব্যাপার যে ছোট কৃষকরা কৃষিপণ্যের দরবৃদ্ধিতে সামান্যই উপকৃত হত, কারণ অপরিবর্তনীয়ভাবেই তারা ফসল কাটার মরশুমে অল্প দামে সমস্ত ফসল বিক্রী করত; আবশ্যকীয় পণ্যের দাম বেড়ে গেলে তারা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। তা সত্ত্বেও সমস্ত শ্রেণীর কৃষকরাই খাদ্যশস্য এবং ভোজ্য নয় এমন শস্যের লাভজনক দরবৃদ্ধিকে স্বাগত জানাত যাতে তারা তাদের খাজনা দিতে পারে এবং সামাজিক দায়গুলির ব্যয়ভার বহন করতে পারে। ১৮৯৫ থেকে ১৯০৯ এর মধ্যে দামের একটা উর্ধ্বমুখী ঝোঁক দেখা গিয়েছিল কিন্তু "জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি বরাবরই কৃষিগত আয়ের থেকে বেশী থেকেছে।" ছোট ভূখণ্ডের মালিকানা সম্পন্ন চাষীদের ক্ষেত্রে কৃষিগত ঋণ বেড়েই যাচ্ছিল, অপরপক্ষে বড়ো চাষীরা অবস্থার উন্নতি করেছে; এরা টাকা ধার করার পরিবর্তে প্রায়ই সঙ্গী সাথীদের টাকা ধার দিয়ে থাকে।"[৭] এভাবে যে ধনী কৃষকরা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন করত, তারা দরবৃদ্ধির ফলে উপকৃত হয়েছিল। ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট করেন যে "দাম এবং রেজিস্ট্রীভুক্ত বন্ধকের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।" এ ব্যাপারটি ঠিক পরিষ্কার নয় যে ১৯২৫ থেকে দাম কমে গেলেও কেন বন্ধকী ব্যবস্থার একটা উর্ধ্বমুখী ঝোঁক দেখা গিয়েছিল।

২৮ নং সারণী

রেজিস্ট্রীভুক্ত বন্ধক এবং মূল্য (১৯১৭-২৮)

বছর	রেজিস্ট্রীভুক্ত বন্ধকের মূল্য টাকায়	দামের সূচক সংখ্যা ১৯১৪ = ১০০ (সমস্ত রকম পণ্য)
১৯১৭	৯৭,১৯৬,৮০৫	১৪৫
১৯১৮	৮২,৯০৪,৮৮২	১৭৮
১৯১৯	১১৭,৬৫৩,১৩০	১৯৬
১৯২০	১৪৯,৯৪২,১০৪	২০১
১৯২১	১৮১,০৮২,৪৩৭	১৭৮
১৯২২	১৮২,৭৩১,০১৪	১৭৬
১৯২৩	১৪৮,৩৬১,০৪৪	১৭২
১৯২৪	১৪৭,৭৫১,৬৯৪	১৭৩
১৯২৫	১৭১,৩০৫,২৫৮	১৫৯
১৯২৬	১৯,০২০,৩৮০	১৪৮
১৯২৭	১৫৪,২৮১,৪৯৩	১৪৮
১৯২৮	১৬৪,০৫৮,৯০১	১৪৫

উৎস ঃ বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং এনকোয়্যারি কমিটির রিপোর্ট (১৯২৯-৩০) পৃ—৬৫।

ধনী কৃষক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে মহাজনদের আবির্ভাব সম্পর্কে ডঃ চৌধুরী যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন।[৮] দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্দ্ধমানের কমিশনার তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে বাঙলার অনেক অঞ্চলে একজন মহাজন এবং একজন সাধারণ রায়তের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন···প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন রায়তই একজন মহাজন।[৯] বস্তুতপক্ষে রায়ত মহাজন বাঙলার গ্রামের একটি পরিচিত বর্গ। তথাপি অন্যান্য গোষ্ঠীর মহাজনদের অগ্রাহ্য করা ভুল হবে। সাহাদের পেশাদার মহাজন বলে গণ্য করা যায়। এদের ব্যবসা ছিল বাঙলার সর্বত্র। প্রমথ চৌধুরী ও বেল আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে সাহারা খাই খালাসীর সাহায্যে রায়তদের জমি গ্রাস করত। পাটের ব্যবসার কয়েকটি কেন্দ্রে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা ছিল সক্রিয় মহাজন যারা কৃষকদের ঋণ দিত। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পাটের কারবার

করে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, মহাজনী কারবারে তিনি ১ লক্ষ টাকা লগ্নী করেছিলেন এবং ১২ থেকে ২৪ শতাংশ সুদ ধার্য করতেন। তিনি ধান কর্জ দিতেন এবং ধান রাখার জন্য বেশ কয়েকটি গোলা রেখেছিলেন।[১০] ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি ১৯২৯ এর রিপোর্টে বলেন যে পেশাদারী মহজনরা একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী রূপে গড়ে উঠেছিল। যদিও মহাজনদের অধিকাংশ ছিলেন বাঙালী, তথাপি অনেক মারোয়াড়ী এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই এই পেশাকে গ্রহণ করেছিল। মহাজনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল জমিদার, ছোট দোকানদার এবং "অনেক কৃষিজীবী যারা উদ্বৃত্তের মালিক।" মহাজনদের কয়েকজন "ধনী ব্যক্তি এবং ভূসম্পত্তি অর্জন করেছে"; কিন্তু অধিকাংশ "ক্ষুদ্র পুঁজি সম্পন্ন ক্ষুদ্র মালিক" রা ছিল "প্রধানত হিন্দু,"[১১]। ১৯৩০ থেকে উত্তরোত্তর যা আমরা লক্ষ্য করি তা হল কয়েকটি জেলায় "রায়ত—মহাজনদের" ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব। রংপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার লক্ষ্য করেন যে রায়ত বা জোতদার-মহাজন সামনে এগিয়ে এসেছিল, অথচ, সাহা এবং মারোয়াড়ীরা "নিজেদের আরও জড়িয়ে ফেলতে" দ্বিধা বোধ করছিল।[১২]

এবার আমরা অন্যান্য অঞ্চলের কৃষিঋণের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে তাকাই। এটা দেখা যাবে যে মহাজনী মূলধনের প্রভাবশালী অবস্থান, সুদের চড়া হার, অগ্রিম দানের ব্যবস্থা এবং রায়ত-মহাজনদের আবির্ভাব ছিল দেশের কয়েকটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। যুক্ত প্রদেশের ঋণগ্রস্ততার সমস্যা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে হুইটকম্ব লক্ষ্য করেন যে উনিশ শতকের শেষার্ধে মহজনী কারবার ছিল "স্থানীয় পুঁজি বিনিয়োগের সবচেয়ে লাভজনক ক্ষেত্র।" এর আংশিক কারণ এই যে রাজস্ব ব্যবস্থা "ধার করার জন্য বাড়তি উদ্দীপক" তৈরী করেছিল, ঋণ সরবরাহের জন্য সরকার স্থাপিত কোন বিকল্প সংস্থা না থাকায় বেসরকারী ঋণদাতারা এগিয়ে এসেছিলেন।[১৩] বীজ ও খাবার ফসল ধার করা ছাড়াও গবাদি পশু কেনা অথবা সামাজিক দায়দায়িত্ব পূরণের জন্য চাষীরা নগদ টাকা ধার করত। যে চাষীরা ফসল কর্জ করত, তাদের ধার করার সময়ের নগদ দামে পৌঁছুবার জন্যে মোট কর্জ-র দু তিন গুণ ফসল ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল।[১৪] পেশাদার গ্রামীণ ব্যাংকার এবং বানিয়া ছাড়া মহাজনরা এসেছিল ভূস্বামী এবং "সম্পন্ন কৃষকদের" মধ্য থেকে। জমিদার,

ঋণদাতারা একটা গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী তৈরী করেছিল, যাদের দেনাদারদের নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত রকম উপায় ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বেরেলীর কৃষকরা "কম বা বেশি রকম তাদের মহাজন অথবা তাদের জমিদার অথবা মকুদ্দমদের কাছে ঋণগ্রস্ত ছিল"।[১৫] জেলায় জেলায় সুদের হারে পার্থক্য হত; ভূসম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার ক্ষেত্রে সীতাপুরে সুদের হার ছিল ৩৭ শতাংশ; অন্যান্য ধারের ওপর কৃষকদের ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ সুদ দিতে হত।[১৬] পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বলেছি কৃষকরা ইক্ষু উৎপাদনের জন্য অগ্রিম নিত এবং তাদের উৎপাদনের একটা অংশ ঋণদাতাদের দিয়ে দিতে হত।

১৯২৯ এ ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি রিপোর্টে বলে যে যুক্ত প্রদেশে মোট কৃষিঋণ ছিল ১২৪ কোটি টাকা। নীচের সারণী থেকে দেখা যায় কর্জের ৪০ শতাংশ পাওয়া যেত ভূস্বামীদের কাছ থেকে, সমবায় সমিতিগুলি ঋণের মাত্র ৬ শতাংশ অগ্রিম দিত; বছরের পর বছর জমিদাররা গ্রামীণ ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যে মহাজনরা কর্জের ২৯ শতাংশ সরবরাহ করত, ধনী কৃষকরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়।

২৯নং সারণী

যুক্ত প্রদেশে ঋণের উৎস (১৯২৯-৩০)

	শতাংশ
সরকার	২·০
গ্রামীণ মহাজন	৫·৩
মহাজন	২৮·৩
ভূস্বামী	৩৯·৯
প্রজা	১৩·০
সমবায়	৫·৩

উৎস: ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট (১৯২৯-৩১)।

বোম্বাইতে মহাজনী কারবার ছিল যারা মারাঠী নয় তাদের হাতে, মুখ্যত গুজরাটি এবং মারোয়াড়ীদের হাতে; ১৮৪৩ ও ১৮৭৩ এর মধ্যে কিছু সংখ্যক মারোয়াড়ী বোম্বাইতে বসতি স্থাপন করেছিল। সমসাময়িক একজন লেখক মারোয়াড়ী মহাজনদের ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "মারোয়াড়ী

মহাজনদের চরিত্র বিশ্লেষণ খুব সুখকর নয় ; তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল লাভ করার আসক্তি এবং প্রতিবেশীর অনুভূতি বা মতামত সম্পর্কে অনাসক্তি…ভূস্বামী হিসেবে সে একজন সুদখোরের সহজাত প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে এবং প্রজাদের উপর সবচেয়ে কঠিন শর্ত আরোপ করে…তারা বীজ ও খাবার ফসল দাদন দেয় এবং প্রতিশ্রুতি ও ভাল বন্ধকীর ভিত্তিতে টাকা অগ্রিম দেয়।"[১৭]

দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশন ঋণের সমস্যাবলীর একটি ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছিল। রিপোর্টে যা প্রকাশিত হয়েছে তা হল ছোট কৃষকের দারিদ্র্য যারা খারাপ ফসলের সময় সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং মহাজনদের কাছে তাদের ধার করতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে মহাজনদের সুদের বিরাট হার ছিল সাধারণ ব্যাপার। ফসল কর্জের ক্ষেত্রে একমন ধানের জন্য দেড়মন শোধ দিতে হত। জমির বন্ধকীর ওপর ধার দেওয়া হত ; সাধারণ রীতি ছিল, জমিতে ঋণগ্রহীতাকে এই শর্তে পুনর্বাসিত করা যে সে মোট উৎপাদনের অর্ধেক খাজনা হিসেবে দেবে।[১৮] যুক্তপ্রদেশে মহাজনরা জমির দখল পেতে চেয়েছিল, বোম্বাইতে মহাজনরা স্বত্বহীন প্রজা রূপে "ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে জমির উৎপন্ন ফসল পেতে পছন্দ করে।"[১৯] মারোয়াড়ী মহাজনরা জলসেচের জন্য খুব কমই অর্থ বিনিয়োগ করত এবং জমি চাষের জন্য কুনবিদের ওপর নির্ভর করত, সাধারণতঃ চাষের খরচ বহন না করেই উৎপন্ন ফসলের অংশ পাওয়ার ব্যাপারেই সে আগ্রহী ছিল। পুণা এবং আহমেদনগরে বিক্রী ও বন্ধকী উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জমির বন্ধকী শুরু হওয়ার আগে ছিল ষাঁড়, ফসল এবং গাড়ি বন্ধক দেওয়ার ব্যবস্থা।[২০] ১৮৭৩ এ বোম্বাই আদালত প্রায় চার লক্ষ মামলা নিষ্পত্তি করে। সাহুকারদের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাইত না বলে কৃষকরা খুব কম মামলায় বিরোধী পক্ষ হিসেবে দাঁড়াত। আহ্মেদনগরে দখলীস্বত্বের প্রায় অষ্টমাংশ "গড়ে সাহুকারদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল।"[২১] ১৮৫২ তে উইনগেট মহাজনী কারবারের বৃদ্ধির ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: ঋণ আদায়ের জন্য আইন মারফৎ পাওয়া সুবিধাগুলো সবচেয়ে ক্ষতিকরভাবে ঋণদান ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করেছে, একদল ছোট মহাজন দ্রুত বেড়ে উঠছিল যারা অস্বাভাবিক সুদের হারে স্বল্প সময়ের জন্য স্বল্প পরিমাণ টাকা ধার দিত।[২২]

১৮৫৪ থেকে ১৮৭৪ পর্যন্ত সময়ে পুণা ও আহ্মেদনগরে অনেক জমি সাহুকারদের হাতে চলে গিয়েছিল। নীচের সারণী থেকে বোঝা যায়,

খাতার সংখ্যার অনুপাতে মারোয়াড়ী মহাজনদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। সাহুকারদের মালিকানার বৃদ্ধির অর্থই হল কৃষকদের জমিচ্যুত হওয়া, খাজনার হার বৃদ্ধির অর্থ, সাহুকারদের হাতে ভাল জমি কেন্দ্রীভূত হওয়া।

৩০ নং সারণী

পুণাতে মহাজনদের ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি (১৮৫৪-৭৪)

বছর	খাতার সংখ্যা	একরের হিসেবে জমি	টাকায় রাজস্বের হিসেব
১৮৫৪	১৬৪	৪০০১	১৯১৪
১৮৬৪	২০৩	৫২৯২	৩৭২১
১৮৭৪	২৭২	১০,০৭৫	৭১৩৪

উৎস : দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশনের রিপোর্ট, ১৮৭৫, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৩।

কৃষকদের হাত থেকে অকৃষকদের জমি হস্তান্তর রোধ করার জন্যই ১৮৭৯ এ ডেকান এগ্রিকালচারিস্টস্ রিলিফ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। আদালত সুদের হার কমিয়ে দিতে পারত এবং কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের আদেশ দিতে পারত। রিলিফ অ্যাক্ট ঋণগ্রস্ততার ক্ষেত্রে খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল বলে মনে হয়না। যদিও গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে সাময়িক ঘাটতি ছিল, 'ঋণ দানের উপযুক্ত' বড়ো ভূসম্পত্তির মালিক যারা ছিল, তারা তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারত, অশুভ ব্যাপারটি এই যে আইনকে ফাঁকি দেওয়া হয়েছিল এবং 'কৃত্রিম বিক্রীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।[২৩] কৃষি-জীবী মহাজনদের উদ্ভব এবং ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্বও দেখা গিয়েছিল, যারা ছিল প্রধানত মারাঠা। আইরিশ জমিদার ল্যাংসডাউন লক্ষ্য করেছিলেন : "...যদি অমঙ্গলকে ঠেকাতে হয়, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের প্রতিষেধক অপরিহার্য।[২৪] ১৯০১ এর দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্ট করেছিলেন যে কৃষকদের এক চতুর্থাংশ অকৃষিজীবীদের কাছে জমি হারিয়েছে, এবং ঋণ থেকে মুক্ত কৃষকরা এক পঞ্চমাংশেরও কম।" এই পটভূমিকাতেই সমবায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল। পরে এই বিষয়টির প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করব। ঋণগ্রস্ততার সমস্যাটিকে যে দুর্ভিক্ষ কমিশন অতিরঞ্জিত করে দেখায় নি তা ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন

করেছিলেন। ১৯২৯এ ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি টাকা, ভূসম্পত্তির মালিকানা সম্পন্ন পরিবারগুলির গড় ঋণ ছিল ৫৭০ কোটি টাকা; ঋণমুক্ত পরিবারের হার ছিল উত্তর গুজরাটে ২১ শতাংশ, দক্ষিণ গুজরাটে ২৩ শতাংশ, কোঙ্কনে ২৯ শতাংশ।[২৫]

এবার তাকানো যাক পাঞ্জাবের দিকে যেখানে জোত তুলনামূলকভাবে বড়ো ছিল। ১৮৭০ এর দশকে জমির দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে এটা অর্থ বিনিয়োগের একটি ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল এবং জমি হস্তান্তরের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। জমি কৃষকদের হাত থেকে অকৃষিজীবী মহাজনদের হাতে চলে গেল। ১৯০০ এর মধ্যে ছোট মালিকদের দখলচ্যুত করা 'রাজনৈতিক বিপদের উৎস হয়ে দাঁড়াল এবং জমি হস্তান্তর আইন পাশ হল। বন্ধক ও বিক্রীর নিয়ন্ত্রণ করে এই আইন ছোট মালিকদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। এটা ঠিক হয়েছিল, যে মহাজনী বা বন্ধকী কারবারে কুড়ি বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর জমি 'বন্ধকদাতার কাছে প্রত্যর্পণ করতে হবে।"[২৬] এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে জমি কৃষিজীবী মহাজনদের কাছে হস্তান্তরিত হবে, অকৃষিজীবীদের হাতে নয়। গ্রামে "অর্থবান শ্রেণীসমূহের" বৃদ্ধি সম্পর্কে কার্জন পরিষ্কার ধারণা করেছিলেন: "অর্থবান শ্রেণীসমূহ হঠাৎ ধনী হওয়া ব্যক্তিদের জমি লাভ করার সুযোগ থাকবে···দুর্বল চিত্ত এবং অমিতব্যয়ী ব্যক্তিরা তাদের পদতলে পড়ে থাকবে এবং তার সম্পত্তি তার চেয়ে শক্তিশালী ভ্রাতৃপ্রতিমের দখলে চলে যাবে।" এই হল বিশেষ ঘটনা যা ঘটেছিল। রাজপুত ও গুজারদের হাত থেকে জমি চলে গিয়েছিল ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, হিসার এবং লাহোরের জাঠদের হাতে। সবচেয়ে উন্নতিশীল গোষ্ঠী হিসেবে জাঠদের বর্ণনা করা হয়েছিল।[২৭]

পাঞ্জাবের কৃষকদের সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান করেছেন ডার্লিং। তাঁর প্রধান সিদ্ধান্তটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। মালিক চাষীর ঋণ ৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল এবং মোট কৃষিঋণ (এর অন্তর্ভুক্ত ছিল দখলী স্বত্বের প্রজা স্বত্বহীন প্রজা এবং কৃষি মজুরদের ঋণ) ছিল ৯০ কোটি টাকা. ঋণগ্রস্ত মালিকের মাথাপিছু গড় ঋণ ছিল ৪৬৩ টাকা। মাত্র ১৭ শতাংশ মালিকের কোন ঋণ ছিল না। বন্ধকী ঋণ সবচেয়ে বেশী ছিল জলন্ধর ও হোশিয়ারপুর জেলায় যেখানে এটা ছিল মোট ঋণের ৬০ শতাংশ, রাওয়ালপিণ্ডি, ঝিলম, আটক, রোটক, কারনাল এবং হিসার জেলায় বন্ধকী ঋণ ৩৭ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে থাকত। এইভাবে মোট ঋণের অর্ধেক

ছিল জমিনবিহীন। অকৃষিজীবী মহাজনরা কৃষকের জমির চেয়ে উৎপন্ন ফসলের প্রতি বেশী আগ্রহী ছিল। যেহেতু সে দলিলপত্র ছাড়াই ঋণ দিত তাই সুদের হারও ছিল বেশী।[২৮] ৩১ নং সারণী থেকে মালিক কৃষকদের ঋণের বৃদ্ধি প্রতিভাত, যদিও জোতের গড় আয়তন ছিল বৃহৎ।

৩১ নং সারণী

পাঞ্জাবের জমির মালিকদের ঋণগ্রস্ততা (১৯২৫)

জমির মালিক (পরিবারসমূহ)	১,৫00,000 টাকা
জমির মালিক পিছু গড় ঋণ	৪৬৩ টাকা
ঋণ থেকে মুক্ত	১৭ শতাংশ
গড় মালিকানা	৮ একর

উৎস: এম এল ডার্লিং, দি পাঞ্জাব পেজেন্ট ইন প্রসপারীটি অ্যান্ড ডেট, ১৯২৫, পৃ-১১।

ডার্লিং বলেছেন যে পাঞ্জাবে ঋণগ্রস্ততার সমস্যা "প্রধানত ছোট মালিকদের সমস্যা।" মালিকদের শতকরা ৪০ ভাগ ৮ একর বা তার কম জমির মালিক ছিল। বন্ধকীদের মধ্যে বড়ো মালিকরাই ছিল সংখ্যায় প্রধান কিন্তু ছোট মালিকরা আরও গভীরভাবে জড়িত ছিল। সামরিক চাকুরীর মতো বাড়তি কোন আয়ের উৎস না থাকলে ছোট মালিকদের পক্ষে স্বচ্ছল থাকা কঠিন ছিল। ছোট মালিকরা ছাড়া আরও গোষ্ঠী ছিল যাদের ধার করতে হত, যেমন, দখলী স্বত্বের প্রজা, স্বত্বহীন প্রজা, এবং ক্ষেত মজুর। দখলী স্বত্ব প্রজাদের ২০ শতাংশ ঋণমুক্ত ছিল এবং ঋণ-গ্রস্ত প্রজাদের গড় ঋণ ছিল ২৯০ টাকা। স্বত্বহীন প্রজা ও ক্ষেত মজুরদের মধ্যে প্রায় ২২ শতাংশ ঋণমুক্ত ছিল।[২৯] ছোট মালিকদের গড় ঋণ ছিল ৩১০ টাকা, দখলী স্বত্বের প্রজাদের ২৯০ টাকা এবং স্বত্বহীন প্রজাদের ১৩৫ টাকা। ডার্লিং লিখেছেন যে স্বত্বহীন প্রজা এবং ক্ষেত মজুররা "কম ধার করে, কারণ ঋণ সংগ্রহের জন্য কোন কিছু বন্ধক দেবার ক্ষমতা এদের ছিল না।[৩০] যা বিশেষভাবে বলা দরকার তা হল, এই শ্রেণীর মানুষের কাছে ঋণের দরজা বাস্তবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধারের জন্য ভূস্বামীদের উপর নির্ভর করায় তাদের ভূমিদাস বা সার্ফ হিসেবে জীবন যাপন করতে হত। ১৯২১ এর সেনসাস রিপোর্টের ভিত্তিতে ডার্লিং লেখেন যে প্রজা এবং ক্ষেত মজুরদের অর্থাৎ যারা মালিক নয়, তাদের সংখ্যা ছিল ১ মিলিয়ন পরিবার, এবং তাদের মোট ঋণ ছিল ১৫ কোটি

টাকা।[৩১] আপাতদৃষ্টিতে প্রধানত বাতাইদার এমন প্রজাদের ঋণলাভের সুযোগ ছিল কম এবং ফলত তাদের কাছ থেকে চাষবাসের উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তনের আশা করা হত না।

রয়াল কমিশন অব এগ্রিকালচার এর কাছে সাক্ষ্যে ডার্লিং ফসলের চড়া দাম এবং জমির মূল্য স্ফীত হবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ল্যাণ্ড অ্যালিয়েনেশন অ্যাক্ট সত্ত্বেও কৃষকদের দখলচ্যুত করা পুনরায় বড়ো আকারে শুরু হতে পারে, বিশেষতঃ পশ্চিম পাঞ্জাবে যেখানে বড়ো ভূস্বামীরা জমির উপর জমি জড়ো করছিল।[৩২] ১৯৩৫ এ পাঞ্জাব ল্যাণ্ড রেভিনিউ এর কর্তৃপক্ষ রিপোর্টে বলেন যে "আপাতদৃষ্টিতে গ্রাম দেশে কৃষিজীবী মহাজনরা শক্তি লাভ করেছে।"[৩৩]

সেণ্ট্রাল ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি কর্তৃক অনুমিত ঋণের পরিমাণ ৯০০ কোটি টাকা, সর্বসম্মত অভিমত ছিল এই যে "গত শতাব্দী থেকে ঋণের বহর বেড়ে যাচ্ছে"।[৩৪] ১৯৩১এ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে এবং তার পরে ঋণের আরও চড়া বৃদ্ধি ঘটেছিল। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে কৃষিপণ্যের দাম পড়ে গিয়েছিল এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার বছরগুলিতে বন্ধক ও বিক্রীর পরিমাণ বেড়েছিল। ছোট কৃষকদের দখলচ্যুত করে নিজের জমির পরিমাণ বাড়ানো কৃষিজীবী মহাজনদের একটা ঝোঁক ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কৃষিজ পণ্যের মূল্যস্তরে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে কৃষিগত ঋণের হ্রাস দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এটা একটা রঙ ফলানো ছবি। যা লক্ষ্য করা দরকার তা হল যে কেবলমাত্র ভূস্বামী এবং ধনী কৃষকরা দাম বৃদ্ধির থেকে লাভবান হয়েছিল এবং ফলত এই অংশের ঋণের পরিমাণ হ্রাস হয়েছিল।[৩৫] মাদ্রাজে নাইডুর অনুসন্ধানে দেখা যায়, বড়ো ভূস্বামীদের ঋণ ১৯৩৯ এ ১৪'৪ শতাংশ থেকে ১৯৪৫ এ ১০'৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। মাঝারি ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে ২'৫ শতাংশ ঋণ হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু প্রজা ও কৃষিজীবী শ্রমিকদের ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩৬] কৃষিগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে সরকার ১৯৩০ এর দশকে ঋণ সালিশী বোর্ডগুলি স্থাপন করে এবং কৃষকদের ঋণ আনুপাতিক হারে কমানো হয়েছিল। কিন্তু ঋণসালিশী বোর্ডগুলি সীমিত সাফল্য অর্জন করেছিল। সালিশী ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার এবং কৃষকদের ঋণ থেকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না।[৩৭] যদিও কৃষি শ্রমিকদের ঋণের ক্রমবর্ধমান ভারী বোঝা বহন করতে হত

তথাপি তাদের সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত করা অথবা তাদের ঋণকে আনুপাতিক হারে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা খুব কমই করা হয়েছিল।[৩৮] মাদ্রাজে "স্বাধীন মজুরী শ্রম" এর মন্থর বিকাশ অংশত এর দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়; অন্যদিকে বাঁধা ক্ষেত মজুরের যোগান ছিল প্রচুর এবং জমির মালিকরা এদের ওপর নির্ভর করত।

ঋণগ্রস্ততার প্রবণতা

সংক্ষেপে আমরা ১৯৫১-৫২তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত রুরাল ক্রেডিট সার্ভের গৃহীত তথ্য আলোচনা করব। এই তথ্য ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ পর্যায়ে ঋণগ্রস্ততার ঝোঁককে নির্দেশ করে।[৩৯] ১৯৩০ এর দশক জুড়ে ঋণের মান ছিল উঁচু। অনেক পর্যবেক্ষক বলেছেন, কৃষকরা পুরোনো ঋণের আসল শোধ করতে পারেনি এবং সুদ মেটাতে অক্ষম হয়েছিল; নোতুন ধার বা ঋণ অতি সামান্য পরিমাণে পর্যবসিত হয়েছিল। কোন কোন রাজ্যে যেমন পাঞ্জাব ও বাঙলায় সরকারী ব্যবস্থাবলী ঋণহ্রাসের সহায়ক হয়েছিল। যদিও অনেক প্রদেশে জমি বিক্রী এবং ক্রোক থেকে সংগৃহীত ঋণের পরিমাণ আইন করে কমানো হয়েছিল তবু কৃষকদের ঋণ বিলুপ্ত হয়নি, মহাজনরা ঋণ আদায়ের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল।[৪০]

কিভাবে মূল্যের ঊর্ধ্বগতি লক্ষণীয়রূপে কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? খাদ্যশস্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন কাপড়, জ্বালানী, গবাদি পশুর খাদ্য, কৃষিগত সরঞ্জাম ইত্যাদির চড়া দামের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক, প্রজা এবং কৃষি মজুরদের মার খেতে হয়েছিল এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য ধার করতে হয়েছিল। কৃষিজীবী শ্রমিকরা মজুরীর হার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তাদের "অপ্রচুর ও অনিশ্চিত" আয়ের ফলে দুর্ভোগে ভুগত! কেবলমাত্র ৭ একর থেকে ৩০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানার কৃষকদের উদ্বৃত্ত থাকত; তারা ফসলের কিছু অংশ বাজারে বিক্রী করত এবং তারাই ফসলের দাম বৃদ্ধি থেকে লাভবান হয়েছিল। "অধিকতর দরিদ্র রায়ত" শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য ফসল উৎপন্ন করত এবং কৃষিগত পণ্যের চড়া দাম থেকে আয় খুব কমই করত। যাদের মুনাফা করার সুযোগ সুবিধা ছিল, সেই বড়ো ভূস্বামী এবং ব্যবসায়ীরা যুদ্ধে মুনাফা লুটছিল এবং তাদের সমস্ত ঋণ অথবা সেই ঋণের একাংশ পরিশোধ করেছিল।[৪১]

কৃষক ও অকৃষকদের ধার করার উদ্দেশ্যগুলির দিকে তাকালে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ধারের স্তরের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রুরাল ক্রেডিট সার্ভের প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, অকৃষকরা অকৃষিসংক্রান্ত ব্যবসা এবং পারিবারিক খরচের জন্য প্রচুর ধার করত, অকৃষকদের ক্ষেত্রে মোট ধারের ৭০ শতাংশ ছিল পারিবারিক খরচ। কৃষকদের ক্ষেত্রে এটা ছিল ৪৭ শতাংশ। কিন্তু কৃষকরা একটি সমগোত্রীয় শ্রেণী ছিল না। পরবর্তী সারণী থেকে দেখা যায়, বড়ো এবং মাঝারি চাষীরা গরীব কৃষকদের চেয়ে বেশী পরিমাণে কৃষি বাবদে খরচ করত; বড়ো চাষীরা তাদের উৎপন্নের একটি বড়ো অংশ বাজারে বিক্রী করত এবং কৃষির উন্নতির জন্য পুঁজি নিয়োগ করত। বড়ো চাষীদের কৃষির ক্ষেত্রে চলতি খরচের জন্য ধার সেই জায়গার তুলনায় বেশী ছিল যেখানে বাণিজ্যিক কৃষি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। পারিবারিক খরচের জন্য ছোট চাষীরা খুব বেশী ধার করত। প্রকৃতপক্ষে ছোট চাষীরা ও বর্গাদাররা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার তাগিদে ফসল ধার করার জন্য ভূস্বামীদের কাছে যেত।

৩২ নং সারণী

কৃষকদের ঋণের উদ্দেশ্য (১৯৫১)

	মোট ঋণের মধ্যে উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋণ (শতাংশের হিসেব)			
	বৃহৎ চাষী	বড়ো চাষী	মাঝারি চাষী	ছোট চাষী
কৃষি বাবদে মূলধনী ব্যয়	৩৫.৫	৩৪.৭	৩০.৫	২৩.২
কৃষিবাবদে চলতি ব্যয়	১৩.৩	১২.১	১০.১	৬.৮
পারিবারিক খরচ	৩৭.২	৪১.২	৪৯.৫	৫৯.৮
অকৃষি ব্যবসার খরচ	৬.৪	৪.৯	৩.৩	৬.০
অন্যান্য খরচ	৭.২	৬.৬	৬.০	৩.৯
একটার বেশী উদ্দেশ্যে	০.৪	০.৫	০.৬	০.৩

উৎস: অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে রিপোর্ট, ১ খণ্ড পৃ—২৯২—৯৩।

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়ের "তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধি" ভোগ করত কেবলমাত্র "বিশেষ স্তরের কৃষকরা।" আপাতদৃষ্টিতে তারা ছিল

ধনী কৃষকদের প্রতিনিধিস্বরূপ যারা চড়া দামের ফলে লাভবান হত। লক্ষণীয় ব্যাপার বলে যা মনে হয় তা, হল "সম্প্রসারিত উন্নয়ন ব্যয়ের একটি ছক।" ঝোঁকটা কেবলমাত্র "নিজস্ব সম্পদ সমূহের" ব্যবহারের দিকে ছিলনা, উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাবদ ঋণ করার দিকেও ছিল। এই প্রসঙ্গে "সম্পদ ঋণ গ্রহণ করার শর্ত ও ঐ সম্পদ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিদানের সম্পর্ক" উল্লেখযোগ্য। "বিনিয়োগ ব্যয়ের আপেক্ষিক খরচ এবং কৃষিজ উৎপন্নের দাম" এর দ্বারা কৃষকদের আচরণ নির্ধারিত হত। অর্থকরী ফসলের দাম হ্রাস পাওয়ার ফল ছিল "কৃষকদের নীট আয় এবং নগদ অর্থের সংকোচন।"[৪২]

প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকিং এনকোয়ারি দেখিয়েছে, পাঞ্জাব এবং বোম্বাই ছিল "ক্রমাগত বেশী রকম ঋণ গ্রস্ততার রাজ্য।" গ্রামীণ ঋণ সম্পর্কে রুরাল ক্রেডিট সার্ভে যে প্রধান পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল তা হল মাদ্রাজের অবস্থা সম্পর্কে যা পরিবার পিছু ঋণের দিক থেকে প্রথম স্থানে উঠে গিয়েছিল। উত্তর প্রদেশেও "ঋণের সুস্পষ্ট বৃদ্ধি" ঘটে। ১৯২৯-৩০ এ এই রাজ্যের অবস্থান ছিল মাদ্রাজ ও বাঙলার নীচে কিন্তু ১৯৫১ তে বোম্বাইয়ের পরেই স্থান দখল করে।[৪৩] এটা লক্ষ্য করা উচিত যে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে বাণিজ্যিক কৃষির যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছিল এবং এই অঞ্চলগুলিতে পরিবার পিছু ঋণ আপাতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা দৈবাৎ ঘটনা নয়। মিরডাল বলেন, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে নোতুন পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। অর্থকরী ফসলের চাষের জন্য মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায় কৃষকদের নগদ টাকার প্রয়োজন আগের থেকেও বেশী হয়েছিল এবং তাকে ধার করতে হত। যখন জমির দাম বৃদ্ধি পেল, তখন মহাজনরা "অস্বাভাবিক চড়া সুদ ধার্য করে অথবা সামলানো অসাধ্য এমন ধার নেওয়াতে কৃষকদের প্ররোচিত করে" জমি দখল করার ব্যাপারে উৎসাহী হল।[৪৪] মিরডাল যা আমাদের বলেন নি তা হল কৃষকের উৎপন্ন ফসলের একাংশ গ্রাস করার একটা ঝোঁক মহাজনদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। যেখানে বাণিজ্যিক কৃষির মোট এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল, সে সব অঞ্চলে দাদন প্রথা ব্যাপক রূপ গ্রহণ করেছিল।

গ্রামীণ ঋণ

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সরকারী নীতিতে একটি পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা গেল ; কৃষির উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী কার্য-

কলাপের গুরুত্ব সম্পর্কে সদ্যোজাত চেতনা দেখা গেল। নিশ্চিতভাবেই শাসক শ্রেণীর লক্ষ্য ছিল উন্নতিশীল ও তুষ্ট একটি কৃষকশ্রেণী তৈরী করা। ১৯০০ এর ২৬ শে ডিসেম্বর হ্যামিলটন কার্জনকে লিখেছিলেন ; ''ভারতবর্ষে সম্পদ হল প্রধানত কৃষিভিত্তিক। আমরা কি ভারতের কৃষিজ ফসলের বিকাশ সাধন ও উন্নতি বিধান করতে পারিনা ?[৪৫] ১৯০২ এর ২৯ শে মে তে হ্যামিলটন তাঁর চিঠিতে এ বিষয়ে নিশ্চিত বলে মনে করেন যে অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি ''আমাদের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে।"[৪৬] ১৯০১ এর ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন ''কৃষিগত অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা" এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যাতে ''সহজ শর্তে" কৃষকরা ঋণ পেতে পারে।[৪৭] ঐ কমিশন একটি পারস্পরিক ঋণদান সমিতি গঠনের সুপারিশ করেছিলেন।[৪৮] ১৯০৩ এ পুসা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় গবেষণা ও ''উপযুক্ত কৃষিসংক্রান্ত শিক্ষার" জন্য।[৪৮] ঐ একই বছরে ইরিগেসন কমিশন বা জলসেচ কমিশন নিযুক্ত হয়। ১৯০৪ এর ২৫ শে মার্চ কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস অ্যাকট বা সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ হয়। এই সমিতিগুলি ''উৎপাদন গত উদ্দেশ্যে" কৃষিঋণ সরবরাহ করার পরিকল্পনা করেছিল। এই আইনে ছিল, একটি গ্রামীণ সমিতিতে [সমবায়] সদস্যদের মধ্যে পাঁচ-ভাগের চারভাগকে কৃষিজীবী হতে হবে। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ওপরের দিক থেকে আন্দোলনকে বিকশিত করতে হবে, ''কোন প্রদেশ অথবা তার যে কোন অংশের জন্য" সরকার সমবায় সমিতিগুলির একজন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করবেন।[৪৯] অবশেষে সমবায় আন্দোলন শাসক শ্রেণীর আশীর্বাদ লাভ করল।

কৃষির বদ্ধাবস্থা ও দুর্ভিক্ষের তীব্রতার সম্মুখীন হয়ে শাসকশ্রেণী ঋণগ্রস্ততার সমস্যাগুলিকে অবহেলা করতে পারেনি। ১৮৯৯-১৯০০ তে এক বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। জমি হস্তান্তর চলছিল। মহাজনী সুদের হার কৃষকদের ওপর ঋণগ্রস্ততার যে বোঝা চাপিয়েছিল তা তারা বহন করতে পারছিল না। সরকারি ''টাকাভি" ঋণ কৃষকদের প্রয়োজনের ক্ষুদ্র অংশ মেটাতে পেরেছিল এবং সরকার জানত যে তারা একটি জেলার কৃষকদের আর্থিক সাহায্য সামান্যই করতে পারবে। সুতরাং তারা রাইফিসেন ব্যবস্থায় সমবায় ঋণদান সমিতি, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গঠন ও প্রসার পছন্দ করত। সরকারী নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষিজীবী মহাজনদের দূরে সরিয়ে না রেখে ধনী কৃষকদের তোষণ করা। ভারতীয় জাতীয়তা-

বাদীরা, যাদের মহাজন ও ধনী কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তারা মহাজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চায়নি। তা সত্ত্বেও সমবায় আন্দোলনের দিকে তারা তাদের সমর্থন প্রসারিত করেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গোখেল ঋণের বিকল্প উৎস সৃষ্টি করার জন্য জমির কর হ্রাস এবং গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন।[৫০] যা হোক, সরকার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ে সমবায় সমিতিগুলির প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

পশ্চিম ভারতের গ্রামীণ ঋণ সম্পর্কে ক্যাটানাকের নিবিড় আলোচনা থেকে মনে হয়, সমবায় আন্দোলন কৃষিজীবী মহাজনদের দূরে সরিয়ে না রেখে কিছু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বিশেষত ম্যাকনীল, ক্যাম্পবেল এওব্যাঙ্ক এর কাছ থেকে গঠনমূলক সাহায্য লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এঁরা অসংগঠিত নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। ১৯০৬ র মার্চে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মাত্র ৩১ টি সমবায় ঋণদান সমিতি ছিল, পাঞ্জাবে ৬৫ টি সমিতি রেজিস্ট্রীভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯২২ মধ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৩৬৮ টি সমবায় সমিতি ছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯১৪র মধ্যে এই সংখ্যা ৫১৫ থেকে ৬৯৮তে দাঁড়িয়েছিল।[৫১] সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির আংশিক কারণ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অফ বোম্বে'র প্রতিষ্ঠা। এখানে গুজরাটি ব্যবসায়ী বিঠলদাস থ্যাকারসে, লালুভাই সামাল দাস এবং তার পুত্র বৈকুন্ঠ মেহতার মতো লক্ষপতিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯১১ তে ৭ লক্ষ চলতি মূলধন নিয়ে এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৯১১-১২ তে বোম্বাই সমবায় সমিতিগুলির চলতি মূলধন ৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষতে দাঁড়িয়েছিল। এই মূলধনের প্রায় ৬ লক্ষ এসেছিল সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ সমবায় সমিতি-গুলির উন্নতির জন্য এই ব্যাংক নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করেছিল।[৫২]

তথাপি সমবায় আন্দোলনকে প্রায়ই দুর্লক্ষ্য সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হত। আমরা দেখব, এই সমস্যাবলীকে কৃষির কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। কয়েক বছরের মধ্যে অনেক সমবায় সমিতি মুমূর্ষু অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ক্যাটানাক আমাদের বলেছেন যে "সমৃদ্ধ কৃষকদের" মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছিল, যাদের কাছে অসীম দায় (unlimited liability) একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল না।[৫৩]

সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিমের ৪৩ শতাংশ দেওয়া হয়েছিল জমিবন্ধক রেখে এবং জমিকে যখন বন্ধক রাখা হত, ছোট কৃষক ও স্বত্বহীন প্রজাদের সমবায় সমিতি থেকে লাভবান হওয়ার প্রায় কিছুই থাকত না। কোলাবা, রত্নগিরি এবং উত্তর কানাড়াতে "কৃষক মালিকের' চেয়ে প্রজাদের সংখ্যা বেশী ছিল। উত্তর গুজরাটে তালুকদারদের সঙ্গে বাঙলার জমিদারদের পারিবারিক সাদৃশ্য ছিল; সেই তালুকদাররাই গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত, তাদের জমি প্রধানত স্বত্বহীন প্রজারা চাষ করত। প্রকৃতপক্ষে আমেদাবাদ, খয়রা এবং পাঁচমহল ইত্যাদি স্থানের যে অংশে তালুকদারি ব্যবস্থা বজায় ছিল সেখানে সমবায় আন্দোলন খুব কমই মাথা গলাতে পেরেছিল।[৫৪]

১৯১৪ তে সমবায় সমিতিগুলির রেজিস্ট্রার হেইগ (Haigh) জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে অর্থনীতিক জোত সম্পন্ন কৃষকদের সমবায় সমিতিতে আকৃষ্ট করা সহজ। অনিবার্য ভাবেই মাঝারি ও ধনী কৃষকরা সমবায় সমিতিগুলির প্রধান সুবিধাভোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, গরীব কৃষকদের চেয়ে তারা বেশী উদ্যোগী ছিল এবং তারা ঋণ পরিশোধ করার আশা রাখত। সাঁতারায় গরীব কৃষকদের সমবায় সমিতি গঠনের চেষ্টায় আশাহত হয়ে ক্যাম্পবেল মনে করেছিলেন যে "অনিশ্চিত ফলাফলের আশায় না থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল কেন্দ্রগুলিতে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা" বুদ্ধিমানের কাজ। ক্যাম্পবেল লক্ষ্য করেছিলেন যে সরকারী ঋণের যে শর্তসমূহ আছে তা আপাতদৃষ্টিতে কয়েকজন ধনী কৃষকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত "অভিজাত সমিতি" গড়ে তোলায় উৎসাহিত করবে।[৫৬]

সমবায় আন্দোলনের অর্থসংস্থান এবং সাংগঠনিক সমস্যাকে চূড়ান্ত বলে মনে হয়েছিল। যেখানে কিছু সংখ্যক মহাজনদের বিপুল সম্পদ ছিল এবং তারা সব সময় কৃষকদের ঋণ দিতে পারত সেখানে ঋণদান সমিতিগুলির চলতি মূলধন সীমিত হয়ে পড়েছিল। কৃষকদের মধ্যে একটা ঝোঁক ছিল "যত বেশী সম্ভব পাওয়া এবং যত কম সম্ভব ধার পরিশোধ করা।" ১৯২০-২১ এ অনাদায় ঋণ ৮ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষতে দাঁড়িয়েছিল এবং ১৯২৩ এ এটি ৩১ লক্ষতে পরিণত হয়েছিল।[৫৭] যখন অনাদায়ী ঋণের টাকা উদ্ধার করার জন্য সমবায় সমিতিগুলি দেওয়ানী আদালতে যেত, তখন তাদের একটি বিরাট আর্থিক বোঝা বহন করতে হত। এটা আশা করা হয়েছিল যে "অবৈতনিক সংগঠক" হিসেবে বেসরকারী কর্মচারীদের সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বোম্বাইতে

ঐ আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, জি, কে দেবধর, মহাদেব দেশাই, বৈকুণ্ঠ মেহ্‌তা, এবং এন, এম যোশী ইত্যাদি জননেতারা ঐ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৫৮] কিন্তু বেসরকারী কর্মচারীদের মিশ্র উদ্দেশ্য ছিল। কিছু কিছু ব্যক্তি খেতাব ও সরকারী স্বীকৃতির অনসন্ধানে রত ছিল। উকিলরা প্রায়ই শাঁসালো মক্কেল ধরার জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে ব্যবহার করত। সংগঠকদের কয়েকজন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সমিতিগুলিকে খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করত। ব্যর্থতার ব্যাপার হল, "অল্প কয়েকজন গ্রামীণ নেতাকে" এই আন্দোলনের মধ্যে থেকে পাওয়া গিয়েছিল।[৫৯] রাজনীতিক ক্ষেত্রের মতোই সমবায় আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন। এই সংগঠকরা প্রায়ই "দল" তৈরী করত। অব্রাহ্মণদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল কারণ, এটা লক্ষ্য করতে তাদের ত্রুটি হয়নি যে সংগঠকদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ। সরকারী পদস্থ কর্মচারীরাই আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, যদিও শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুভব করেছিল যে তারা আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য ছিল; ব্যাপারটি অনিবার্য ছিল, সুতরাং তাই ঘটেছিল। প্রশ্ন হল, বেসরকারী ব্যক্তিরা জনগণের অনুভূতির দ্বারা উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত ছিল কি-না। এটা সম্ভব যে, আইনব্যবসায়ীরা প্রায়ই সমবায় ব্যাঙ্কের কাজকর্মে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করত; এরা ছিল সুযোগসন্ধানী। মহাদেব দেশাই জোরের সঙ্গে বলেছেন, বেসরকারী সংগঠকদের "জনগণের সেবার" জন্য সযত্ন প্রয়াস চালানো উচিত; যেহেতু এ ধরণের ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছিল না তাই বিকল্প উপায় ছিল এমন বেতনভুক পরিদর্শক নিয়োগ করা যারা "খুঁটিনাটি বিষয় খুবই খতিয়ে পরীক্ষা" করে দেখবেন।[৬০] প্রায় ষাট বছর আগে সমবায় পরিচালনার বিষয়ে দেশাই যা লিখেছিলেন, তা বর্তমান পরিস্থিতিতেও প্রাসঙ্গিক।

১৯১৪ তে নিযুক্ত ম্যাকলাগান কমিটি সমবায় আন্দোলনের আর্থিক কাঠামো সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিল। শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির খুদে নেতাদের নিয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্রই "গ্যারান্টিং ইউনিয়ন" গঠন করা উচিত। আগামী বছরে যে মেয়াদী আমানত পাওনা হবে, তা মেটানোর মত অর্থ নগদে রাখার জন্য জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বলা হয়েছিল। প্রাথমিক সমিতিগুলিরও উচিত হল অনুরূপ নগদ তহবিল রাখা। স্বল্পমেয়াদী ঋণ বণ্টনের দায়িত্ব সমিতিগুলিকেই দেওয়া

উচিত—কারণ কৃষকেরা এই সমিতিগুলি থেকে ঋণ নিতে পছন্দ করবে।[৬১] বাস্তবিকপক্ষে সমবায় আন্দোলনের বিকাশ বা প্রসার ঋণদান সমিতিগুলির আর্থিক স্থিতিশীলতার উপরে অনেকাংশেই নির্ভরশীল ছিল। ১৯২৮ এর এগ্রিকালচারাল কমিশন বলে যে ঃ

"যেখানে পরিশোধে সমর্থ, সেখানেও সমিতির সদস্যরা পরিশোধ করতে দেরী করে। সমবায়ের নীতিগুলির উপলব্ধি এবং গ্রামীণ ঋণের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, যথা সময়ে পরিশোধে অপারগদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার থেকে পদস্থ কর্মচারীরা বিরত থাকে …যেখানে ত্রুটিগুলি খুব স্পষ্ট এবং স্বীকৃত, সেখানেও যে সব সমিতি সংশোধনের অতীত, সেগুলোকেও আইনত গুটিয়ে ফেলতে অনিচ্ছা দেখতে পাওয়া যায়।[৬২]

তথাপি সমবায় আন্দোলনে যে সম্ভাবনা রয়েছে তাকে অবজ্ঞা করা হবে বোকামি। এগ্রিকালচারাল কমিশনের কাছে সাক্ষ্যে ডারলিং বলেছিলেন কিভাবে ঋণের বোঝা হাল্কা করার সর্বোত্তম প্রত্যক্ষ উপায় রূপে পাঞ্জাবে সমবায় সমিতি প্রমাণিত হয়েছিল। পাঞ্জাবে ৬৯,০০০ জন সভ্য সম্বলিত ২,০৯৩ টি গ্রামীণ ব্যাংক ছিল ; ১২৮ লক্ষ টাকার ঋণ (৮৫০,০০০ পাউন্ড) পরিশোধ করা হয়েছিল, ৩৮,০০০ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। সভ্যদের প্রায় ৩৫ শতাংশ ছিল "সম্পূর্ণভাবে ঋণ মুক্ত।" পাঞ্জাবে ৩০০,০০০ এরও বেশী গ্রামীণ ব্যাংক ছিল এবং ডারলিং হিসেব করেছিলেন যে এরা দশ বছরে প্রায় ছয় কোটি টাকা হারে ঋণ হ্রাস করছিল।[৬৩] ভিদে তার ১৯২৮-২৯ এর রিপোর্টে দাবী করেছিলেন যে সমবায় আন্দোলনের কাঠামো হল "যথেষ্ট মজবুত"। ৪,৩১৭ টি ঋণদান সমিতির মধ্যে, ১,৪৬৭ টির কোন পুরোনো বকেয়া ছিল না ; ৪৯০ টি সমিতির অনুমোদিত বকেয়া ছিল চাহিদার দশ শতাংশেরও কম।[৬৪] আহমেদাবাদ, খয়রা, পুণা, আহ্‌মদনগর, শোলাপুর, বিজাপুর, রত্নগিরি এবং কোলাবার কয়েকটি অঞ্চলে আন্দোলন ছিল দুর্বল। আগের একটি অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, রত্নগিরি, কোলাবা এবং আহ্‌মেদাবাদে স্বত্বহীন প্রজারা ছিল কৃষকদের একটি বড়ো অংশ ; পুণা, আহ্‌মদনগর, শোলাপুর এবং বিজাপুর ছিল "দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনাময় জেলা।" মনে হয়, "অর্থনীতিক জোত"-এর মালিক কৃষকদের মধ্যে সমবায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট কৃষকদের চেয়ে এই অংশকে বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়েছিল।[৬৫] বিশ্বব্যাপি মন্দার সময়

আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু মনে হয় যে প্রধানত দুর্বল সমিতি-গুলিকে গুটিয়ে ফেলা হয়েছিল।[৬৬] ১৯৩৫ এ কে, এল পাঞ্জাবী রিপোর্টে বলেন যে "যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারীর অভাবই গ্রামীণ ঋণ আন্দোলনের উন্নতির একমাত্র বাধা।"[৬৭]

যদিও সমবায় আন্দোলনের বিশেষ সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না, তথাপি এর একটি আদর্শ রঞ্জিত চিত্র আঁকা ভুল হবে। রুরাল ক্রেডিট সার্ভের রিপোর্টে দেখা যায়, মহাজন বিশেষত পেশাদার মহাজন গ্রামীণ ঋণকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করত। কৃষকদের ঋণের মোট পরিমাণের ৪৫ শতাংশ সরবরাহ করত পেশাদার মহাজন এবং ২৫ শতাংশ সরবরাহ করত কৃষিজীবী মহাজন। কৃষকদের ঋণের ৬ শতাংশ ব্যবসায়ী ও "কমিশন এজেন্টদের" কাছ থেকে আসতো যারা 'অধিকতর বাণিজ্যিক জেলা-গুলির" কয়েকটিতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। সরকার এবং সমবায় সমিতিগুলির অবদান ছিল মোট ঋণের ৬ শতাংশ মাত্র। কৃষককে অর্থসংস্থান করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি খুব গৌণ ভূমিকা পালন করেছিল। গ্রামীণ ঋণ সরবরাহের জন্য কোন প্রতিযোগী সংস্থার অনুপস্থিতিতে মহাজনদের প্রভাবশালী ভূমিকা ৩৩ নং সারণীতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

৩৩ নং সারণী

ভারতে বে সরকারী ঋণ সরবরাহের ধরণ (১৯৫১-৫২)

ঋণদান সংস্থা	মোট ঋণের মধ্যে প্রতিটি ঋণদান সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণের অনুপাত (শতাংশের হিসাব)
সরকার	৩.৩
সমবায় সমূহ	৩˙১
আত্মীয় স্বজন	১৪˙২
জমিদার	১˙৫
কৃষিজীবী মহাজন	২২˙৯
পেশাদার মহাজন	৪৪˙৮
ব্যবসায়ী এবং এজেন্ট	৫˙৫
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক	০˙৯
অন্যান্য	১˙৮

উৎস : গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা, জেনারাল রিপোর্ট, ১৯৫৪।

আপাতদৃষ্টিতে যে আইনের উদ্দেশ্য ছিল মহাজনদের নিয়ন্ত্রণ করা, তা ছিল "শুধু কাগজ পত্রেই বিদ্যমান।" স্থানীয় কৃষকদের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে মহাজনদের বিশেষ জ্ঞান ছিল। সে অনেক সময় জমিকে জামিন হিসেবে না রেখেও ঋণ দিত। ঋণ দেওয়ার ব্যাপারটিকে বাস্তবে কার্যকরী করার সময় সে একটি লক্ষণীয় পদ্ধতি গ্রহণ করত, কোন কৃষকের জরুরী প্রয়োজন হলে সে তৎক্ষণাৎ ধার দিত। গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে মহাজনদের প্রকৃত একচেটিয়া অবস্থানকে এই তথ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে সে ছিল কৃষকদের একমাত্র ঋণদান সংস্থা। গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার বিবরণ থেকে জানা গিয়েছিল যে, পেশাদার মহাজন "হচ্ছে সেই সব মুষ্টিমেয় ঋণ দাতাদের একজন যে ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত জামিনের ভিত্তিতে ঋণ দেয়, যার সঙ্গে স্থাবর সম্পত্তির জামিনের বিশেষ পার্থক্য আছে।" কিন্তু পেশাদারই হোক কিংবা কৃষিজীবী হোক, সব মহাজনদেরই সুদের হার ছিল চড়া।[৬৮] এর থেকে বোঝা যায়, মহাজনী সংক্রান্ত আইন মহাজনী প্রথার ওপর সামান্যই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বছরের পর বছর ধরে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির কাঠামো দুর্বলই থেকে গেল, যা কৃষকদের দারিদ্র্যকে প্রতিফলিত করছিল। জমে ওঠা বকেয়ার বোঝা বৃদ্ধি পেল। কয়েক বছর পর বেশ কিছু রেজিস্ট্রীকৃত সমিতি নির্জীব হয়ে পড়ল। সমবায় সমিতিগুলি পরিচালনা করার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারীর অভাব ছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাবেই কেবলমাত্র সমবায় আন্দোলন খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছিল। এ ব্যাপারে মাদ্রাজের চেয়ে বোম্বাইয়ের অগ্রগতি দ্রুত হয়েছিল এবং এর কারণ প্রধানত ফসলে ঋণের ব্যবস্থা। ১৯৩৯ থেকে ফসলে ঋণের ব্যবস্থা দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছিল ; ১৯৪৭ এ সমগ্র রাজ্যে বম্বে এগ্রিকালচারাল ডেটরস রিলিফ অ্যাকট প্রয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৪৮-৪৯ এ ফসলবীমার ব্যবস্থা নোতুন তাৎপর্য গ্রহণ করেছিল। জমি জামিন রেখে ঋণ নির্দিষ্ট করার পরিবর্তে চাষের এলাকাধীন জমির ভিত্তিতে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়া হত এবং ঋণ পরিশোধের সময় ফসলকাটার সময়ের ওপর নির্ভর করত।[৬৯] নিম্নলিখিত সারণী থেকে দেখা যায়, বোম্বাইয়ের প্রাথমিক ঋণদান সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত দাদন বা অগ্রিম ১৯৪৬-৪৭ এর ১.৭০ কোটি থেকে ১৯৫১-৫২ তে ৮.১২ কোটিতে দাঁড়িয়েছিল। দাদন বা অগ্রিমের একটা বড়ো অংশ দিয়েছিল বোম্বাই এবং মাদ্রাজের ঋণদান সমিতি।

৩৪ নং সারণী

প্রাথমিক ঋণদান সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম (১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৫১-৫২)

কোটি টাকায়

বছর	বোম্বাই	মাদ্রাজ	সারা ভারত
১৯৪৬-৪৭	১'৭০	৩'৪৭	৯'০৩
১৯৪৭-৪৮	২'২২	৪'৪০	১০'৪৫
১৯৪৮-৪৯	৩'২৯	৪'৪৬	১৪'০১
১৯৪৯-৫০	৫'২৯	৬'৪৪	১৭'৯৯
১৯৫০-৫১	৬'৯০	৭'৬৫	২২'৯০
১৯৫১-৫২	৮'১২	৭'৩৩	২৪'২১

উৎস : রুরাল ক্রেডিট সার্ভে : জেনারেল রিপোর্ট, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ২য় খণ্ড, পৃ-৯৮।

গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার তথ্য সমবায় ঋণের ব্যবস্থার কয়েকটি ঝোঁককে নির্দেশ করে। ১০৭,৯২৫টি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি ছিল ১৯৫১-৫২ তে যার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪,৭৭৬,৮১৯ জন ; ব্যবসায়ী সংস্থা হিসেবে এই সব সমিতির অধিকাংশই ছিল অলাভজনক। কৃষক পরিবার-গুলির সামান্য একটা অংশ এই সমিতিগুলির থেকে ঋণ বা ধার সংগ্রহ করত। সমস্ত শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কৃষকদের হিসেবের মধ্যে ধরেও মোট সদস্যের মাত্র ৫৯ শতাংশ ঋণদান সংস্থাগুলির থেকে ঋণ গ্রহণ করত। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক। তুলনামূলকভাবে সমবায় আন্দোলন যেখানে বেশী শক্তিশালী ছিল, সেই বোম্বাইতে ৮.৩ শতাংশ পরিবার সমবায় থেকে ঋণ সংগ্রহ করত ; উত্তর প্রদেশে এই ঋণ সংগ্রহের পরিমাণ ৪.৯ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৩.৭ শতাংশ, এবং মাদ্রাজে ৩.২ শতাংশ। বোম্বাইয়ের একটি পরিবার গড়ে ২৮ টাকা সমবায় সমিতি থেকে পেত, এ ক্ষেত্রে অন্য কোনও রাজ্য ৯ টাকাতেও পৌঁছুতে পারত না। মোট ধারের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির ঋণদানের অনুপাত অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে বোম্বাইতে বেশী ছিল : বোম্বাইতে এই ঋণদানের অনুপাত ছিল (মোট ধারের) ১৬.২ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৪.২ শতাংশ, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশে ২.২ শতাংশ ; [৭০] ক্যাটানাকের বক্তব্য কিছুটা সত্য ছিল যে বোম্বাইতে সমবায় আন্দোলন শক্ত ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত

ছিল। লালুভাই সামালদাস, মহাদেব দেশাই ও বৈকুন্ঠ মেহ্‌তা সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিশ্চিতভাবেই এটা ছিল দুরূহ কাজ।

সমবায় আন্দোলন থেকে কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কৃষকরা উপকৃত হয়েছিল? গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার তথ্য পূর্ববর্তী অংশে যা বলা হয়েছে তাকেই সমর্থন করে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, "সমবায় কর্তৃক অর্থ সংস্থান বিপুলভাবে বড়ো কৃষকদের পক্ষে।" বড়ো চাষী কর্তৃক সমবায় সমিতি থেকে পরিবার পিছু গড় ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২১ টাকা; মধ্য চাষী ও ছোট চাষীদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ছিল ৫ টাকা এবং ২ টাকা।[৭১] জমিই জামিনের প্রধান বিষয় বা উপাদান ছিল বলে ধনী কৃষকদেরই ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা ছিল। মধ্য ও ছোট চাষীদের প্রয়োজন ছিল "ভোগের বাবদে ঋণ", কিন্তু ঋণদান সমিতিগুলির মুখ্য কাজ ছিল "উৎপাদনশীল অর্থসংস্থান" এর ব্যবস্থা করা।[৭২] মনে হয়, সরকার ধনীকৃষকদের দ্বারা প্রভাবিত নীতিকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিল: ধনী কৃষকরা ছিল গ্রামের অভিজাত সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ী মূলধনের সঙ্গে তাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সরকার ধনী কৃষকদের ওপর কেন নির্ভর করতে চাইত তা যে কোন ব্যক্তিই বুঝতে পারে। ছোট কৃষক ও স্বত্বহীন প্রজারা চলে গেলে সমবায় আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং মহাজনী কারবার অব্যাহতভাবে চলতে থাকল।

উপরোক্ত বিষয়টি কৃষির পুনর্গঠনের মৌলিক প্রশ্নটি উত্থাপিত করে। আমরা ছোট কৃষক ও খাজনা দাতা প্রজাদের চরম দারিদ্র্যের বিষয় উল্লেখ করেছি। জ্যাকবি আমাদের বলেছেন যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ঋণদান সমিতিগুলি প্রজা-কৃষকের সুপরিচিত সমস্যার সম্মুখীন: "সমবায় সমিতিগুলি…অনেক বেশী জরুরী প্রয়োজনের স্তরকে—জমিদার দোকানদার বা চালের ব্যবসায়ীর কাছে জামিন বিহীন ঋণে আবদ্ধ এবং ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট সঞ্চয় করতে অক্ষম প্রজা-কৃষকের স্তরকে—অতি সামান্যই স্পর্শ করেছিল।"[৭৩] মধ্য কৃষকও ছিল সহজেই ভেঙ্গে পড়া গোষ্ঠী; প্রত্যেকবারের ফসলহানি মধ্য কৃষকের একটি বিরাট অংশকে জমিচ্যুত কৃষকে পরিণত করেছিল। কোন সঞ্চয় ছিল না, তাই সঞ্চয় জড়ো করা ছিল অসম্ভব। পূর্ববর্তী অংশে আমরা দেখেছি, বাণিজ্যিক কৃষি ছোট কৃষকদের অবস্থার সামান্যই উন্নতি ঘটিয়েছিল, সমবায় সমিতিগুলির সাফল্যজনক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল

বিশ্বের বাজারে নগদ ফসলের দামের ওঠাপড়ার ঝুঁকি। বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ঋণের সমস্যাটি তীব্র হয়ে উঠল। সমবায় সমিতিগুলির প্রশাসনিক ত্রুটিগুলিকে নির্দেশ করা আনুষ্ঠানিক রীতিতে পরিণত হয়েছিল। যা প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয়, তা হল, যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের থেকে ভোগ স্থায়ীভাবে বেশী হওয়ার ঝোঁক দেখা যায় ততক্ষণ প্রশাসনিক পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। যে সমস্ত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ জোতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং খাজনা ও করের বোঝাকে লাঘব করে, সেই সব ব্যবস্থার দ্বারাই দারিদ্র্য, ঋণ এবং চড়া সুদের দুষ্ট চক্র ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে।[৭৪] এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা ভূমিস্বত্বের ব্যবস্থার ওপরে খুব কমই মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে।[৭৫] বর্গাদার বা ভাগচাষীদের মোট ফসলের ৫০ শতাংশ খাজনা হিসেবে দিতে হত, ছোট কৃষকের পক্ষে খাজনার বোঝা ছিল ভারী, এবং তারা জমিচ্যুত হচ্ছিল। প্রায়শই ঋণই ছিল এই ধরণের জমিচ্যুত হওয়ার মাধ্যম।

নির্দেশিকা

১। বুকানন হ্যামিলটন, দিনাজপুর, ১৮৩৩।

২। বেল, ফাইনাল রিপোর্ট (১৯৩৪-৪০), ১৯৪২।

৩। মার্কস, ক্যাপিটাল, তৃতীয় খণ্ড, পৃ—৫৮৩-৮৭, ১৯৫৯। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে মার্কস মহাজনী এবং বণিক পুঁজির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, মহাজনী প্রথার আবশ্যিক শর্ত হল ক্ষুদ্রায়তন জমিতে চাষবাস; মহাজনী উৎপাদন ব্যবস্থায় বিকাশ ব্যাহত করে।

৪। রিপোর্ট অফ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি (১৯২৯-৩০), ১ম খণ্ড, ১৯৩০, পৃ—৬৯-৭০।

৫। ঐ, পৃ—৭৩-৭৪।

৬। ঐ, পৃ—৬৯-৭০।

৭। কে এল দত্ত, রিপোর্ট অন রাইজ অফ প্রাইসেস অ্যান্ড ওয়েজেস (১৯১৪), প্যারা ৩৮৯।

৮। চৌধুরী, অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেসনস, সিনহা, পূর্বোল্লিখিত,

পৃ—২৬৬-৬৮। চৌধুরী লিখেছেন যে কৃষি অর্থনীতিকে অব্যাহত রাখতে মহাজন ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

৯। ঐ, পৃ—২৬৭।

১০। পালিত, টেনসনস ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি (১৮৩০-৬০), ১৯৭৫, পৃ—২১-২২।

১১। ব্যাংকিং এনকোয়ারি (১৯২৯-৩০) চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, পৃ—৪০৪-৮।

১২। রঙ্গপুর সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট (১৯৩১-৩৮), অনুচ্ছেদ ৩১।

১৩। হুইটকম্ব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৬১।

১৪। ঐ, পৃ—১৬৫।

১৫। ঐ, পৃ—১৬৭-৬৮। প্রকৃতপক্ষে কৃষকরা ''ভূস্বামীদের চেয়ে মহাজনদের বেশী পছন্দ করত।''

১৬। ঐ, ১৬৯।

১৭। দাক্ষিণাত্যে দাঙ্গা কমিশনের রিপোর্ট, ১৮৭৫ ১ম খণ্ড, ১৯৭৬, পৃ ২৪। মারোয়াড়ী, গুজরাটি, কুনবি, ব্রাহ্মণ এবং বানিয়াদের মধ্য থেকে মহাজনরা আসত।

১৮। ঐ, পৃ—৫৫, ৬১।

১৯। ঐ, পৃ—৮৩।

২০। ঐ, পৃ—৫৩-৫৫।

২১। ঐ, পৃ—৫৬। এ কোলভিন লিখেছেন "...সাবজজ এবং জজেরা মারোয়াড়ীদের হাতের পুতুল ছিল।"

২২। ঐ, পৃ—৩১।

২৩। ক্যাটানাক, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২৪-২৬। মনে হয়, সরকার ছোট মালিকের জমিকে কৃষিজীবী মহাজনের কাছে হস্তান্তরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এই হস্তান্তরের কোন ''রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না'' এবং এর ফলে উন্নত চাষের সম্ভাবনা ছিল।

২৪। ঐ, পৃ—৩৬। ল্যান্সডাউন এ বিষয়েও নির্দেশ করেছিলেন যে কৃষকদের ঋণগ্রস্ত তা সম্পর্কে জনমত অগ্রাহ্য করা যায়না।

২৫। রিপোর্ট অফ বম্বে প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি (১৯২৯-৩০), ১ম খণ্ড, ১৯৩০। কৃষিজীবীদের হাত থেকে

অকৃষিজীবীদের কাছে ধারাবাহিক জমি হস্তান্তর কমিটি লক্ষ্য করেছিল।

২৬। ফিলিপস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৬৪৯-৫০।

২৭। আইন পরিষদে কার্জনের বক্তৃতা, ফিলিপ্‌স্‌, পূর্বোল্লিখিত, ৬৪৭-৪৮। হরনাম সিং যুক্তি দেখান যে "কৃষিজীবী সমাজে বড়ো মাছেরা ছোট মাছদের খেয়ে ফেলবে" ; সরকার জানতেন ভবিষ্যতে জমি বন্ধকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া হিমাদ্রি ব্যানার্জি, আগ্রেরিয়ান সোসাইটি ইন পাঞ্জাব" দ্রষ্টব্য।

২৮। ডার্লিং পূর্বোল্লিখিত পৃ—২৭-২৮। অনুন্নত জেলাগুলিতে মহাজনরা উঁচু হারে সুদের বিনিময়ে ব্যাপক ঋণ দিত আর উন্নত জেলায় জমি বন্ধকের সংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান।

২৯। ঐ, পৃ—১২-১৪। বৃহৎ মালিকদের ঋণের পরিমাণ ছিল ভূমি রাজস্বের দশ গুণ ; ক্ষুদ্র মালিকদের ঋণ বৃহৎ মালিকদের তুলনায় কম ছিল, কিন্তু তা ছিল ভূমি রাজস্বের ২৭ গুণ।

৩০। ঐ, পৃ—১৫-১৬।

৩১। ঐ, পৃ-২০-২১। মহাজনদের মধ্যে হিন্দু এবং শিখরাও ছিল, আর যারা ঋণের জন্য মহাজনদের কাছে যেত তাদের ৫৬ শতাংশ ছিল মুসলমান।

৩২। এভিডেন্স অফ ডারলিং, রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিস, রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার, ৮ম খণ্ড, পৃ—৫৮৩-৮৫। ঋণগ্রস্ততার কারণ কৃষকের মালিকানার ক্ষুদ্র আয়তন, খরা ও ব্যাধির জন্য গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতি, সামাজিক উৎসবে খরচ ; মামলা মোকদ্দমা ছিল ঋণগ্রস্ততার বিরল কারণ।

৩৩। রিপোর্ট অফ পাঞ্জাব ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেসন (১৯৩৫), পৃ—৬।

৩৪। রিপোর্ট অফ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটি (১৯৩১), পৃ—৫৫।

৩৫। রিপোর্ট অফ্‌ কংগ্রেস অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস কমিটি (১৯৪৯) পৃ—৯২।

৩৬। মাদ্রাজ এনকোয়ারি অফ বি. ভি. এন নাইডু (১৯৪৭), ঐ, পৃ—৮৭-৮৮।

৩৭। রিপোর্ট অফ্‌ এগ্রিকালচারাল ফিনান্স সাবকমিটি, ঐ,

পৃ—৮৮। বাংলায় মোট ঋণ ৫০১৬ লক্ষ টাকা ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ১৭৯৬ লক্ষ টাকায় এবং পাঞ্জাবে ১৯৩৯-৪০ এ ৯২ লক্ষ টাকা ঋণকে ৫৬ লক্ষ টাকায় কমিয়ে আনা হয়।

৩৮। অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস কমিটি (১৯৪৯), পৃ—৯৫।

৩৯। ১২৯,০০০ পরিবারের ৬০০টি গ্রামে সমীক্ষা করা হয়েছিল। ১ নং খণ্ডকে বলা হয় সার্ভে রিপোর্ট, ২ খণ্ডকে জেনারেল রিপোর্ট, এ ছাড়াও ২য় খণ্ড জেনারেল রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ১৯৫০—৫১ পর্বে ঋণগ্রস্ততা এবং কৃষিঋণের প্রবণতাগুলি সমীক্ষায় আলোচিত হয়েছে।

৪০। রিপোর্ট অফ অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে, ১ম খণ্ড, ১৯৫৪, পৃ—২২৫ ;

৪১। ঐ, পৃ—১৫৫-৫৬, ২২০। ১৯৪৫ থেকে ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধির একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল, এই ঝোঁক হায়দ্রাবাদ, পশ্চিম বাংলা, মহীশূর এবং বোম্বাইতে সুস্পষ্ট ছিল, এবং একে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করা যেত।

৪২। ঐ, পৃ—১৫৩। কোরিয়া যুদ্ধের ধাক্কায় মূল্যবৃদ্ধির ফলশ্রুতি ১৯৫০ এর দশকে কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ; সরকার পরিচালিত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা থেকে কৃষকরা লাভবান হবার চেষ্টা করছিল।

৪৩। ঐ, পৃ—১৭৯-৮০।

৪৪। মিরডাল, এশিয়ান ড্রামা, ২য় খণ্ড, পৃ—১০৪১-৪২।

৪৫। হ্যামিলটন টু কার্জন, ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯০০, হ্যামিলটন পেপারস।

৪৬। ঐ, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে রমেশ দত্তর বক্তৃতার বিষয় হ্যামিলটন উল্লেখ করেছেন এবং "ভবিষ্যতে ভূমিরাজস্বর বৃদ্ধিকে খর্ব করার" সুপারিশ করেছেন।

৪৭। রিপোর্ট অফ ফেমিন কমিশন (১৯০১), পার্ট—৩, পৃ—১১১-১২।

৪৮। পুসা ইনস্টিটিউট একটি পরীক্ষামূলক খামার ; এখানে গবেষণা কেন্দ্র, গবাদি পশুর খামার, একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় ছিল। ফিলিপস্, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৬৫৬-৫৭।

৪৯। কোঅপারেটিভ সোসাইটিস অ্যাক্ট (১৯০৪), ফিলিপ্স্, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৬৫৮-৫৯। সোসাইটিগুলির মাঠের ফসলের পরিবর্তে অগ্রিম দেওয়ার অনুমতি ছিলনা। স্বল্পকালীন ঋণের ভিত্তি ছিল "ব্যক্তিগত ঋণ", কিন্তু জমিনের ভিত্তিতে ঋণ অনুমোদিত ছিল।

৫০। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা মহাজনদের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হয়। ওয়াছা অনুভব করেছিলেন যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনদের প্রয়োজন ছিল; গান্ধী লিখেছিলেন যে মহাজনরা তাদের "মক্কেলদের নানাভাবে সাহায্য করে" এবং তিনি তাদের কোঅপারেটিভ আন্দোলনে নিয়ে আসার সুপারিশ করেছিলেন। ক্যাটানাক, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১২৯। এ ছাড়াও চন্দ্র, ইকনমিক ন্যাশনালিজম, পৃ—৪৮৩-৮৫।

৫১। ক্যাটানাক, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৫৮, ৯৬। ১৯১১-১২ তে ভারতে ৮১৭৭টি সমবায় সমিতি ছিল।

৫২। ঐ, পৃ—৮১, ৮২, ৯৬, ১০৪। স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই ভারতীয় পুঁজি ব্যাংকে প্রবাহিত হয়েছিল। বোম্বাইয়ের কয়েকজন পুঁজিপতি সমবায় আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন; গ্রামীণ সমিতিগুলির চলতি মূলধনের প্রায় অর্ধেক এসেছিল বোম্বাই কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে।

৫৩। ক্যাম্পবেল এর রিপোর্ট (১৯০৯-১০), ঐ।

৫৪। ঐ, পৃ—১১২-১৪।

৫৫। ঐ, পৃ—৯৭। সমবায় সমিতিগুলির সামাজিক ভিত্তি হিসেবে "মধ্য কৃষক" এর উপর ক্যাটানক উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন; বৃহৎ কৃষকের আন্দোলনে "একটি গুরুত্বপূর্ণ" ভূমিকা থাকার কথা ছিল না। সম্ভবত তিনি বৃহৎ ভূস্বামীর সঙ্গে বৃহৎ কৃষককে মিশিয়ে ফেলেছিলেন; মনে রাখতে হবে যে অর্থনীতিক জোতের মালিক এমন একজন কৃষক একটি সেচভুক্ত অঞ্চলে ধনী কৃষক হতে পারে। ক্যাটানাক "বড়ো কৃষককে" খুব কমই ব্যাখ্যা করেছেন। ধনী কৃষকদের সংজ্ঞার জন্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫৬। ক্যাম্পবেলস রিপোর্ট (১৯০৯-১০), ঐ, পৃ—৭০।

৫৭। ঐ, পৃ—১৭৭।

৫৮। যোশী এবং মেহতা বোম্বে "কো-অপারেটিভ উইকলির" সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৩৪-৩৫। একটি সমবায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য বোম্বে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৫৯। ঐ, পৃ—১০২।

৬০। ঐ, পৃ—১২৯-৩০। গান্ধীর উত্তরকালের সেক্রেটারী এবং বৈকুণ্ঠ মেহতার বন্ধু দেশাই সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাতিদার, মারাঠা এবং লিঙ্গায়তদের থেকে আসা সহকারী অবৈতনিক সংগঠকরা নির্ভরযোগ্য ছিল না বলে দেখা গিয়েছিল।

৬১। রিপোর্ট অফ দি ম্যাকলেগান কমিটি (১৯১৫), ক্যাটানাকে উল্লিখিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১২২, ১২৭, ১২৯, ১৫৭। এটা অভিযোগ করা হয়েছিল যে টাকায় (taquvi) ঋণ বণ্টনের সময় অধস্তন সরকারী কর্মচারীরা কৃষকের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করত।

৬২। রিপোর্ট অফ এগ্রিকালচারাল কমিশন (১৯২৮), পৃ—৪৯৯। ১৯২১-২৫ এ প্রায় ৫৮,০০০ সমিতি ভারতে সক্রিয় ছিল। ১৯১৯ এর আইনের দ্বারা সমবায় একটি প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

৬৩। এম এল ডার্লিং-এর সাক্ষ্য, ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃ—৫৮৩-৮৫।

৬৪। ভিদির রিপোর্ট (১৯২৭-২৮), ক্যাটানাক, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২১৫।

৬৫। ঐ, পৃ—২১৫-১৬। ক্যাটানাক আমাদের বলেছেন, মধ্য কৃষকরা তাদের ফসলের ক্ষুদ্র এক অংশ বিক্রি করে এবং বাজারের শক্তিগুলির দ্বারা ছোট ও বড় কৃষকের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬৬। ঐ, পৃ—২১৮। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ এর মধ্যে ঋণদান সমিতিগুলির সংখ্যা বোম্বাইতে ৪,৩১৭ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩,৭১৮ হয়েছিল।

৬৭। ঐ।

৬৮। রুরাল ক্রেডিট সার্ভে, জেনারেল রিপোর্ট (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ),

দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ—৬৩-৬৫। মহাজন কর্তৃক ধার্য সুদের হার উড়িষ্যায় ছিল ২৫ থেকে ৭০ শতাংশ, ত্রিপুরাতে ৪৯ শতাংশ, উত্তর প্রদেশে ২৯ শতাংশ, বিহারে ২৭ শতাংশ। কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের জন্য ব্যবসায়ীদের কাছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। যতই দিন যেতে লাগল, ততই বাণিজ্যিক পুঁজি শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

৬৯। ঐ, পৃ—১০১। বোম্বে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং সেণ্ট্রাল ব্যাংক সরকারী সাহায্য পেয়েছিল। ১৯৫৩ র ৩০ শে জুনে কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলির আংশিক মূলধনের ৪৩ শতাংশ ছিল সরকার প্রদত্ত।

৭০। ঐ, জমি বন্ধকী ব্যাংক, যারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়, মাদ্রাজ ছাড়া অন্যত্র তেমন বিকশিত হয়নি। ১৮৯ টি প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাংকের মধ্যে শুধু মাদ্রাজে ছিল ১৩০ টি।

৭১। ঐ, পৃ—৯৬।

৭২। ঐ, পৃ—৯৭।

৭৩। ই, এইচ জ্যাকবি, অ্যাগ্রেরিয়ান আনরেষ্ট ইন সাউথ ইষ্ট এশিয়া, ১৯৪৯, পৃ—২৩।

৭৪। ল্যাণ্ড রিফর্ম, ইউনাইটেড নেশনস্ ১৯৫১।

৭৫। এই সমীক্ষা রিপোর্টে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ফসলে ঋণ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ, বীজ, গবাদি পশু, সার, কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য ঋণ। সমবায় হবে মহাজনী প্রথার একটি বিকল্প ; মহাজনদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা দরকার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুর্ভিক্ষ এবং কৃষি কাঠামো

এই শতাব্দীর সূচনায় যখন রমেশ দত্ত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তখন তিনি রায়তওয়ারি এলাকায় ভূমি করের চড়া ভার এবং কৃষকদের দারিদ্র্য সম্পর্কে তীক্ষ্নতার সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বেয়ার্ড স্মিথের রিপোর্টকে ভিত্তি করে দত্ত সতর্কতার সঙ্গে ১৮৩৭ এবং ১৮৬০ এর দুর্ভিক্ষের তুলনা করেন এবং জোরের সঙ্গে বলেন যে রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত "ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে খারাপ ফলাফলের বিরুদ্ধে রক্ষা ব্যবস্থা" হতে পারে।"[১] বেয়ার্ড স্মিথ অবশ্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেনঃ খাদ্যের অভাবের জন্য দুর্ভিক্ষ হয়নি; এর কারণ হল, গ্রামীণ জন সমষ্টির নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণীর খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কিছু অসুবিধা।[২] ১৮৬০-৬১ তে তাঁতি এবং কৃষিজীবী শ্রমিকরা ত্রাণ শিবিরে ভীড় করছিল। এই শ্রেণীর মানুষকে ভূমি করের ভার সামান্যই স্পর্শ করেছিল। এবার আমরা দেখব, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ দেশে দুর্ভিক্ষগুলি কৃষি সমস্যাগুলিকে প্রতিফলিত করেছিল। কৃষি সমস্যা শুধুমাত্র রাওতওয়ারি এলাকায় বিশেষ তীব্র ছিল তা নয়।

প্রায়শই বিশেষ একটি অঞ্চলে খাদ্যপ্রাপ্তির লক্ষ্যণীয় হ্রাসকে দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী জনসংখ্যা সম্পর্কে ম্যালথাসের তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু সেই অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের জন্য জনসংখ্যাও বেড়েছে। মনে রাখা দরকার যে খাদ্যের সহজলভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক দুর্ভিক্ষের সঙ্গে কৃষিগত সমস্যার সম্পর্ক অনুধাবন করতে খুব কমই সাহায্য করে। সরকারী রিপোর্টগুলিতে আমরা কৃষি শ্রমিক ও কারিগরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস, খাজনা দাতা প্রজাদের দারিদ্র্য, ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের দ্বারা খাদ্য মজুত করা এবং দামের তীব্র ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনা দেখতে পাই। চূড়ান্ত ঘটনা হল ঊনিশ শতকে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান স্তর বিন্যাস; কৃষি শ্রমিক, খাজনা দাতা প্রজা এবং

ছোট চাষীরা জমিদারী বা রায়তওয়ারি এলাকায় দুর্ভিক্ষের সময় প্রথমেই বিপর্যস্ত হত। রেলপথ এবং রাস্তার উন্নতি এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তার কৃষি অর্থনীতিতে একটি নোতুন পরিবর্তন সূচিত করেছিল, গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবসায়ী মহাজন এবং ধনী কৃষকরা নাটকের প্রধান চরিত্রে পরিণত হয়েছিল; দুর্ভিক্ষের সময়ে তাদের আচরণ ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যদি আধুনিক দুর্ভিক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে কৃষিগত কাঠামোর ওপরে আলোকপাত করতে হবে।

দুর্ভিক্ষ

ভারতের দুর্ভিক্ষের দিকে তাকালে যা প্রত্যক্ষ করি তা হল ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি। ১৮৩৭ এর দুর্ভিক্ষ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল এবং এরপর ১৮৬০ এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ১৮৬০ থেকে ১৯০০ এর মধ্যে ষোলবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানুষের আনুমানিক হিসেব নির্ভরযোগ্য নয়। পশুসম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আনুমানিক হিসেব করা সম্ভব নয়, এ সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের ফলে মৃত্যু সংখ্যা ভয়াবহ রূপ নেয় এবং দেশের অনেক অঞ্চলের কৃষি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই সব অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ভূমি হস্তান্তর ঘটেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনটি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল; ১৯৪৩ এ বাঙলায় মহা মন্বন্তর দেখা দেয়। ইতিমধ্যেই দারিদ্র্যে দুর্বল হয়ে যাওয়া জনসংখ্যার ওপর এই দুর্ভিক্ষ ১৮৯৯-১৯০০ এর দুর্ভিক্ষের চেয়ে আরো তীব্র ও গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যখন আমরা দুর্ভিক্ষ বিশ্লেষণ করি, তখন কৃষিগত সমস্যার কয়েকটি সুপরিচিত দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের প্রয়াস হবে, কৃষিগত যে সমস্যাগুলি দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল তার ওপর আলোকপাত করা। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা অনেক প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে কয়েকটি চমৎকার সরকারী রিপোর্ট আছে, যা আমরা দেখব। বেয়ার্ড স্মিথ ১৮৬০ এর দুর্ভিক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন যে দুর্ভিক্ষ উত্তর ভারতের প্রায় ২৫,০০০ বর্গমাইল এলাকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। যে বিষয়ে স্মিথের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল, তা হল, শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকাতেই নয়, প্রতিবেশী জেলাগুলিতেও খাদ্যশস্যের চড়া মূল্যবৃদ্ধি। দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রচুর ফাটকা-

বাজের কারবার চলত। মালিক-কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে অগ্রিম পেত, কিন্তু "গরীব শ্রেণীরা" গ্রাম ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে প্রতিবেশী জেলায় গিয়েছিল।[৩] বেয়াড' স্মিথ ভূমিস্বত্বের বন্দোবস্তের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্তের সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ অথবা কেউ কেউ যেমন বলে থাকেন এ দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই—এর থেকে বড়ো ভুল ধারণা আর কিছুই হতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত দুর্ভিক্ষের মূলের সঙ্গে খুবই যুক্ত। যে ধরণের ভূমি বন্দোবস্তের আওতায় লোকে বাস করে ও জীবিকা নির্বাহ করে, তার ভাল মন্দর সঙ্গে দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়কর ফলাফল প্রতিরোধ করতে জনসাধারণের যে ক্ষমতা, তার প্রত্যক্ষ আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে।[৪]

১৮৬৫-৬৬ র দুর্ভিক্ষ উড়িষ্যাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল এবং বিহার, বাঙলা ও মাদ্রাজের কয়েকটি জেলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। খাদ্যশস্যের দাম ক্রমাগত বাড়ছিল। কিন্তু কারবারীদের জোটের ফলে "সরবরাহ কুক্ষিগত ও মজুদে পরিণত হয়েছিল," অক্টোবর এবং নভেম্বরে কটক ও পুরীতে দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৫ র মে মাসে ছোটনাগপুরে শস্য লুঠের ঘটনা ঘটেছিল। কক্‌রেল রিপোর্ট করেন যে বিহারে যখন খাদ্যের দাম আগের গড় দামের তুলনায় তিনগুণ বেড়ে গিয়েছিল, তখনও কৃষিশ্রমিকদের মজুরীর ক্ষেত্রে নামমাত্র পরিবর্তন ঘটেছিল বা কোন পরিবর্তনই ঘটেনি।[৫] বাঙলাতে খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যাওয়াতে কৃষি শ্রমিকরা তাদের "স্থিতিশীল মজুরী" নিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; গ্রামগুলিতে ১৮৬২-৬৩ তে চালের দাম মণ প্রতি ২ টাকা থেকে ১৮৬৫-৬৬ তে মণ প্রতি ৫ টাকা হয়েছিল। জমিদার ও ভূস্বামীরা টাকার থলির থেকে সাহায্য দিতে অথবা মিলিতভাবে ত্রাণ ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করেছিল।[৬] বড়ো ভূস্বামীরা মজুদ ও ফাটকাবাজীর কারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কি-না এ বিষয়ে সরকারী রিপোর্টে খুব কমই বলা আছে। মাদ্রাজ থেকে উল্লেখযোগ্য চাল রপ্তানী হত; যেখানে চড়া দাম পাওয়া যাবে, সেখানে মজুদ বিক্রী করার ঝোঁক ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিল। সরকার ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করেছিলেন; এই ব্যবস্থায় ১৮২, ৪২৫ জন ব্যক্তি কাজ পেয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে এই সব ত্রাণকার্যে কর্মপ্রার্থীদের একটি বড়ো অংশই ছিল কৃষি শ্রমিক ও কারিগর। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে

রিপোর্টে ডানিয়েল সরকারী খাতে খাদ্যশস্যের আমদানী এবং ব্যবসায়ীদের অগ্রিম দেওয়াকে সমর্থন করেন যা "দুর্গত দেশে খাদ্যশস্যের যোগান বাড়িয়ে দিতে পারত।"[৭] সরকার অবশ্য খাদ্যশস্যের কারবারে সামান্যতম হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিল এবং মনে করত যে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ীরা হল "জনহিতকারী ব্যক্তি":

"এটা খুব পরিষ্কারভাবে বলা যায় না যে চরম দুর্ভিক্ষের সময় যখন আমদানী করে খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করা অসম্ভব তখন সার্বিক অনাহারের বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষা কবচ হল খাদ্যভোগ হ্রাস করা এবং একমাত্র দাম বাড়িয়েই এটা কার্যকরীভাবে করা যেতে পারে। ফসলের কারবারী যখন দুষ্প্রাপ্যতার পরিস্থিতিতে খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়ে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা দেখে, তখন প্রকৃতপক্ষে সে দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থা থেকে সমাজকে রক্ষা করে।"[৮]

১৮৬৮ তে আরও একটি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যা রাজপুতানাকে বিপর্যস্ত করেছিল এবং পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। একটি হিসেব অনুসারে বিকানীর ও মালবের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং আজমীরের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও বহু ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। পশুখাদ্য দুর্লভ হয়ে পড়ে এবং চড়া দামে বিক্রী হয়।[৯] উত্তর পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষের ওপর রিপোর্টে হেনভি মূল্যবৃদ্ধির ফলস্বরূপ কৃষি শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; এই কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও আয়ের দিক থেকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। হেনভি লিখেছেন: "এটা সাধারণভাবে বোঝা যাবে যে যখন টাকায় ৮ সের করে গম বিক্রী হচ্ছে সেখানে যে ব্যক্তি একপক্ষ কালে একবার মাত্র ১ টাকা উপার্জন করে, তাকে নিশ্চয়ই কঠোর জীবন যাপন করতে হবে। এটাই সব নয়। যখন দাম শিখরে উঠে তখন শ্রমিকদের নিয়োগ কর্তারা ব্যয় হ্রাস করে এবং যাদের সংস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ে তাদের ছাঁটাই করে। খাদ্য যে শুধু মহার্ঘ তাই নয়। খাদ্য কেনার মতো টাকা পয়সাও ছিল না।"[১০] আপাতদৃষ্টিতে কর্ম সংস্থানের সুযোগ কমে গিয়েছিল এবং যে কৃষি শ্রমিকদের চড়া দামে খাদ্য কিনতে হত, তাদের মজুরীর স্তরে হ্রাস দেখা গিয়েছিল। দুর্গত এলাকাগুলিতে কৃষি শ্রমিক ও কারিগরদের কর্ম সংস্থানের জন্য সরকারকে ত্রাণমূলক বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ঊনিশ শতকের অন্য যে কোন দুর্ভিক্ষের তুলনায় ১৮৭৬-৭৭ এর দুভিক্ষ ছিল অধিকতর ব্যাপক এবং তীব্র। ১৮৭৬ এর খরার ফলে দক্ষিণ ভারতে সাংঘাতিক বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল, ১৮৭৭ এ খরার ফলে উত্তর ভারতের কিছু কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৮৭৭ এর মধ্যে মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। মাদ্রাজে দাম চড়ে গেল, ব্যবসায়ীরা মনে হল, অনির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য মজুদ ধরে রাখতে স্থির প্রতিজ্ঞ হল। রেল ব্যবস্থার মাধ্যমে শস্য স্থানান্তর করণের সুবিধা "দ্রুত ভাবে প্রত্যেকটি জায়গায় দাম বাড়াচ্ছিল।"[১১] তথাপি লিটন যুক্তি দেখান যে কোনভাবেই সরকারের বেসরকারী বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়ঃ

"যখন কোন ভারতীয় প্রদেশে ফসল হানি ঘটে, তখন খাদ্যের উল্লেখ যোগ্য পুরোনো মজুদ ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে থাকে, কিন্তু এই মজুদ প্রায়ই বিক্রী না করে ধরে রাখা হয়। সুতরাং দূর থেকে ফসল আমদানী করে বাজারে সরবরাহ করতে হবে···চাহিদা অনুসারে আমদানী কৃত ফসলের যোগান দেওয়ার কাজটি সবচেয়ে ভালভাবে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের দ্বারা হতে পারে···অভিজ্ঞতা এটা দেখিয়েছে যে ফসলের বাজারে সরকারী কার্যকলাপ বেসরকারী বাণিজ্যকে অসংগঠিত ও অচল করে দেয়···কোন পরিস্থিতিতেই সরকারের খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবসায়ে নিজেকে নিয়োগ করা উচিত নয়···বাঙলা এবং উত্তর ও মধ্যভারতের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলগুলির দিকে বাণিজ্যের প্রবাহ বর্তমানে সক্রিয় এবং এটা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে ভারতের মধ্যেই সরবরাহের উৎস এখনও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই চেষ্টা যদি ব্যর্থও হয় তথাপি সরকারী হস্তক্ষেপ হবে সর্বনাশা ভুল।[১২]

মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। ১৮৭৮ এ রিচার্ড স্ট্রাচির নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠিত হয়েছিল। এই কমিশন ১৮৮০ তে রিপোর্ট পেশ করে। এই বিখ্যাত দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট (১৮৮০) গুরুত্বপূর্ণ নীতিসংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ ছাড়াও দুর্ভিক্ষকে কৃষি সম্পর্কিত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এটা নির্দেশ করা হয়েছিল যে ভারতে "দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়কারী ফলাফলের প্রধান কারণ" এই বাস্তব সত্যে নিহিত যে এখানকার কৃষি জনবাহুল্যের চাপে পীড়িত এবং এর কোনও প্রতীকার নেই যতক্ষণ না "অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে কৃষিগত পেশা থেকে সরিয়ে না

আনা যায় এবং শিল্প বা ঐ জাতীয় কোন কর্মসংস্থানে জীবন নির্বাহের সন্ধান না পাওয়া যায়।[১৩] বছরের পর বছর ধরে কৃষি মজুর এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত কারিগররা কৃষিতে ভীড় করছিল ; যখন দেশের কোন অংশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তখন এই শ্রেণীর মানুষরা অনিবার্যভাবেই ঘা খেত।

সুতরাং কৃষি সমস্যা শিল্পগুলির অবনতির সঙ্গে এবং বৃহদায়তন শিল্পগুলির মন্থর বিকাশের সঙ্গে জড়িত। কৃষিগত কাঠামোই হল খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তর ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলিতে বিশেষত বাঙলায় "কৃষকদের অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছিল।" বাস্তবিকই কৃষকদের উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। দখলী স্বত্বের প্রজারা দখলচ্যুত হচ্ছিল এবং স্বত্বহীন প্রজার বাহিনী স্ফীত হচ্ছিল। "কৃষকদের অধিকার" সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে উত্তর ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলিতে এবং বিশেষত বাঙলায় কৃষকদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য আইনের ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করা সরকারের কর্তব্য···একমাত্র এই ধরণের ভূমি বন্দোবস্ত দরকার যা দখলের চিরস্থায়ীত্ব ঘোষণা করে, ইচ্ছে মতো খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করে এবং উন্নতি সমূহের নিশ্চিত ব্যবস্থা করে; সেখানে আমরা দেখি যে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হচ্ছে, ঋণ বেড়ে যাচ্ছে, চাষের পদ্ধতির উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট শ্রেণীর হ্রাস পাওয়ার চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্য দেশের পক্ষে হতে পারে না এবং এই ধরণের প্রজাদের অত্যধিক খাজনার চাপে পীড়িত স্বত্বহীন প্রজাদের সঙ্গে মিশে যেতে হয় যে প্রজাদের জমির সঙ্গে চিরস্থায়ী কোন সম্পর্ক না থাকায় মিতব্যয়িতার বা উন্নতির কোন আগ্রহ থাকে না·· ভোগ দখলের অধিকারকে সংহত করার জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত···যথার্থ অধিকার সহ স্বত্বহীন প্রজাকে রক্ষা করা এবং তার অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য বুদ্ধিমানের মতো ও নিরপেক্ষ বলে যা মনে হয় এমন যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সঙ্গত।"[১৪]

১৮৯৬ এ অনাবৃষ্টির দরুণ ১৮৯৭-৯৮ এ সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ হয় যা উত্তর ভারত, বাঙলা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইকে জনশূন্য অঞ্চলে পরিণত করে ; বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষের সময়ে প্লেগ মহামারী আরম্ভ হয়েছিল। হোল্ডারনেস রিপোর্ট করেন যে "চড়া দামের" সার্বিক প্রভাব "শহরের ও গ্রামের "গরীব শ্রেণীকে" সাংঘাতিকভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটা লক্ষ্যণীয় যে দুর্ভিক্ষের সময়ে চড়া দামে খাদ্যশস্য সহজেই কেনা যেত। খাদ্যশস্যের বেসরকারী বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ না করার সরকারী নীতিতে কোনও পরিবর্তন হয়নি।[১৫] দুর্ভিক্ষ প্রধানত মধ্য প্রদেশেই মারাত্মকভাবে দেখা গিয়েছিল যার ফলে জনগণের একটা বিরাট অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। দুর্গত এলাকায় কৃষিজীবী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য ত্রাণ ব্যবস্থামূলক কাজ শুরু হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মাদ্রাজে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৮৯৭ এর মার্চে ৮১,০০০ থেকে বেড়ে জুলাইতে ৮৩০,০০০ এ দাঁড়িয়েছিল।[১৬] প্রকৃতপক্ষে যে কোন দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে ত্রাণ ব্যবস্থার উদ্বোধন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ভিক্ষের সময় কৃষি শ্রমিক ও কারিগরদের বিপুল জনসমষ্টির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে গিয়েছিল এবং ত্রাণ ব্যবস্থা শুরু করতে হয়েছিল; কিন্তু দখলী-স্বত্বের রায়তরা ভূমিরাজস্ব স্থগিতকরণ এবং মকুব করার সোচ্চার দাবী জানায়। ভূমি হস্তান্তর ঘটেছিল উল্লেখযোগ্যভাবে। বন্ধকী জমি ৩০০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল।[১৭] মধ্যপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রমেশ দত্ত ভূমি করের ভারী বোঝার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি ঃ

"ভূমি রাজস্বকে প্রকৃত খাজনার অর্ধেক মাত্র করা উচিত ।…বাংলা এবং উত্তর ভারতে প্রজাস্বত্ব আইনের কল্যাণে যে অধিকার এবং খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিধান আছে, জমিতে অনুরূপ অধিকার কৃষকদের থাকা উচিত।"[১৮]

১৯০০ সালে আর একটি দুর্ভিক্ষ শুরু হয় যা বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, আজমীড়. হায়দ্রাবাদ ও পাঞ্জাবকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রচণ্ড খরার জন্য গবাদি পশুও অনেক মারা যায়; পশু খাদ্য ও জলের প্রচণ্ড অভাব ছিল। পশু চরানোর জন্য সরকারী বন উন্মুক্ত করা হল এবং দুর্গত এলাকায় পশুখাদ্য আমদানী করা হল। গুজরাটে মালিক চাষীদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল, ঋণ হিসাবে প্রায় ২ কোটি টাকা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে গবাদি পশু ও বীজ কেনার জন্য বণ্টন করা হয়েছিল। জমি বিক্রী ও বন্ধকী বেড়ে গিয়েছিল যার ফলে জমি অকৃষিজীবীদের হাতে চলে গিয়েছিল।[১৯] ১৯০১ এর দুর্ভিক্ষ কমিশন ঋণগ্রস্ততার তীব্র সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ঃ "ঋণগ্রস্ততার এই

বোঝা বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কৃষক সামাজিক দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে দিয়েছে যা আমরা দেখছি তা হল সরকারী সাহায্য ছাড়া এর থেকে কোন পরিত্রাণ নেই।[২০] প্রকৃতপক্ষে কৃষি সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সরকারী কার্যকলাপকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমবায় ঋণদান আন্দোলন গড়ে তুলতে সরকারকে আহ্বান জানানো হয়। কৃষির বিকাশের জন্য এবং সমস্ত রকম কৃষি বিষয়ের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার জন্য সভ্যরা যাতে ঋণ পেতে পারে, সেজন্য কৃষি ব্যাংক-গুলি স্থাপন করা উচিত। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রেণীর কৃষকদের কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাকে উন্নত করা এবং কৃষিগত গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উন্নত বীজের ব্যবস্থার জন্য, গবাদি পশু প্রজননের উন্নতির জন্য কৃষিবিভাগকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কমিশন লিখেছিলেন "কৃষিগত সমস্যার ক্ষেত্রে দক্ষ গবেষণার নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ হল এই সময়ের জরুরী প্রয়োজন।"[২১] অবশেষে কৃষি সম্পদের উন্নতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছিল বলে মনে হয়।

এবার ১৯৪৩ এর বাঙলার দুর্ভিক্ষ, যে দুর্ভিক্ষ মানুষের তৈরী তার প্রসঙ্গে আসা যাক। কিভাবে আধুনিক দুর্ভিক্ষ কৃষির কাঠামো ও ব্যবসায়ীদের আচরণের সঙ্গে যুক্ত তা এই দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত। দুর্ভিক্ষের প্রথম চেহারা দেখা গেল রঙ্গপুর, মৈয়মন-সিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায়—এই সমস্ত চাল উৎপাদনকারী জেলা। ১৯৪৩ এর জুলাইয়ের মধ্যে প্রায় সমগ্র বাঙলাতেই দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু শুরু হল। উদ্বৃত্ত জেলা মেদিনীপুর ১৯৪২ এর সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সাইক্লোনের ফলে চব্বিশ পরগণা জেলায় কয়েকটি থানায় আমন ফসলের খুবই ক্ষতি হয়েছিল। মুর্শিদাবাদে ১৯৪৩ এ আমন ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নদীয়া এবং হাওড়া দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আগষ্ট ও ডিসেম্বরের মধ্যে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। হাজার হাজার লোক জেলা-গুলি থেকে, বিশেষত মেদিনীপুর থেকে কলকাতা অভিমুখী রওনা হয়েছিল। অক্টোবরের দুর্গত বা দুঃস্থদের সংখ্যা ১০০,০০০ এ দাঁড়িয়ে-ছিল। কলকাতায় মৃত্যুর সংখ্যা অক্টোবরে চরমে পৌঁছেছিল। দুর্ভিক্ষ কমিশনের হিসাব অনুসারে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।[২২] আমন ফসলের ভাল উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও চালের দাম ছিল চড়া এবং ১৯৪৪ এ বাঙলায় মৃত্যুর হার উঁচু স্তরে রইল।[২৩]

দুর্ভিক্ষ কমিশন বাঙলার দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯৪২ এ খরা ও শস্যে পোকা হওয়ার ফলে আমন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ১৯৪৩ এ সাংঘাতিক রকমের খাদ্যের ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। ১৯৪২ এ বার্মার পতনের পর বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ টন বার্মার চালের আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। "অস্বীকৃতির নীতির" (Denial Policy) ফলে মেদিনীপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে নৌকা ও চালের মজুদকে ধ্বংস করা হয়েছিল। যে সমস্ত জেলেরা নৌকা হারিয়েছিল তারা দুর্ভিক্ষের ফলে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ বড়ো বড়ো ধানচাল কুক্ষিগত ও ক্রয় করে ফেলেছিল। মজুদ করা এমন একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়াল যেখানে চালের ব্যবসায়ীরা ছিল নাটকের প্রধান চরিত্র ; ব্যবসায়ী ও মজুদদাররা দুর্ভিক্ষের সময়ে ১৫০ কোটি টাকার মুনাফা করেছিল।[২৪] বাঙলা সরকারের খাদ্য ক্রয়ের জন্য এজেন্ট এম এম ইস্পাহানীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল ; হনুমান বক্সের প্রতিষ্ঠানকে বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে যে দাম দিতে হয়েছিল, সে তার থেকে উঁচু স্তরে দাম নির্দিষ্ট করে ইস্পাহানীদের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবেই বাঙলা সরকারকে প্রতারিত করেছিল।[২৫] ১৯৪৩ এর ২৩ শে সেপ্টেম্বর স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা লিখেছিল ঃ "কয়েক সপ্তাহ হল বাঙলা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। এশীয় ভূমিখণ্ডের এই ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধির সব চিহ্নগুলি প্রতিভাত হয়েছে। খাদ্যের সন্ধানে শীর্ণ গরীবদের করুণ বিচরণ ; পারিবারিক জীবনের ভাঙ্গন ; এবং তার সঙ্গে যুক্ত আবিষ্টগুলি দ্রুত বর্ধমান মৃতের তালিকা……এই পীড়াদায়ক বিপর্যয় মানুষের সৃষ্টি। আমরা যতটা জানি, ভারতে ইতিপূর্বে সব দুর্ভিক্ষই মুখ্যত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে ঘটেছিল। কিন্তু কোনও খারাপ আবহাওয়া দিয়ে এই দুর্ভিক্ষের ব্যাখ্যা হয় না ; বৃষ্টিপাত সাধারণভাবে যথেষ্ট হয়েছে।"[২৬]

যদিও "বৃষ্টিপাত যথেষ্ট হয়েছে", তবু ১৯৪৩ এর আমন ফসল খরা এবং ফসলের রোগের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আমন ফসলের উৎপাদন ১৯৪২ এর ৮·৯ মিলিয়ন টনের তুলনায় ১৯৪৩ এ ৬ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছিল।[২৭] দুর্ভিক্ষ কমিশনের হিসাব অনুসারে "প্রায় ৩ সপ্তাহের প্রয়োজনের" ক্ষেত্রে সরবরাহের চূড়ান্ত ঘাটতি হয়েছিল ; ১৯২৮, ১৯৩৬ এবং ১৯৪১ এর তুলনায় ১৯৪৩ এ সরবরাহের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল।[২৮] তথাপি এটা এমন কিছু গুরুতর ছিল না যাতে ব্যাপক-

ভাবে অনাহার অনিবার্য হয়ে ওঠে।[২৯] বেসরকারী ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষকদের আচরণ ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গোষ্ঠীগুলি বাজার থেকে ফসলের মজুদকে তুলে নিচ্ছিল এবং ফসলের ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের সৌভাগ্য গড়ে তুলছিল। যদিও ১৯৪২ এর অক্টোবরের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের পর চালের দামে ঊর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল, তবুও সরকার বেসরকারী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দামের ঊর্ধ্বগতির সম্মুখীন হয়ে সরকার ১৯৪২ এর ডিসেম্বরে খাদ্য সংগ্রহ পরিকল্পনার কাজ শুরু করেন, সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৭,৪০০ টন, কিন্তু মাত্র ২,৮০০ টন সংগৃহীত হয়েছিল। সংগ্রহের দ্বিতীয় পরিকল্পনাও ব্যর্থ হল। ১৯৪৩ এর ১১ই মার্চ সরকার প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করল: "পাইকারী চাল ও ধানের বাজারে কোন মূল্য নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।" নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার আসু ফল হল সরকারের কেনা ফসলের সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি। কিন্তু এটা ছিল সাময়িক ব্যাপার, মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যেই দাম হু হু করে বেড়ে গেল। কলকাতায় মার্চ মাসে চালের দাম মণ প্রতি ১৫্ টাকা থেকে মে মাসে মণ প্রতি ৩০ টাকা হয়েছিল। এই দাম খুলনায় ছিল ৩৩্ টাকা, বর্ধমানে ২৯ টাকা, ফরিদপুরে ৩১ টাকা, নোয়াখালিতে ৪৩ টাকা।[৩০] প্রদেশের বাইরের অঞ্চল থেকে আমদানীকে নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। শুধুমাত্র উড়িষ্যা তার কোটার ২৫,০০০ টন সরবরাহ করেছিল। মে মাসে সরকার পূর্বাঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য চালু করেছিল। যদিও ৯১,০০০ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব দামের ওপর সামান্যই পড়েছিল। কলকাতায় যে খাদ্যশস্য এসে পৌঁছাচ্ছিল তা সরকারী নিয়ন্ত্রণে ছিল না।[৩১] আগষ্ট মাসে বহু জেলায় বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে গিয়েছিল, তবে অস্বাভাবিক দাম দিলে লোকে চাল কিনতে পারত। ১৯৪৩ এর ১৩ই আগষ্ট স্টেটসম্যান পত্রিকা লেখে: কলকাতা যেন একটি এলডোরাডো—এই বিশ্বাসের থেকে অনশনক্লিষ্ট গ্রামবাসী নগরটিতে ভীড় করে আসছে··· সুতরাং কলকাতা ও অন্যান্য শহরগুলিতে দেখা যায়, প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টাতেই নরনারী ও শিশুরা ফুটপাতে, রাস্তায়, গাছের তলায় শুয়ে আছে ক্ষুধার্ত, সিক্ত, দুর্বল অসুস্থ এবং প্রায় আশাহত হয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমোতে পারা তাদের সৌভাগ্য।"[৩২]

কৃষকরা বাজার থেকে মজুদ সরিয়ে নিয়েছিল, যার ফলে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল কমে গিয়েছিল কিনা—এই প্রশ্নটি তোলা যেতে পারে।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, একমাত্র ধনী কৃষকদেরই বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ছিল। এটা খুবই সম্ভব যে এই শ্রেণী চড়া দামের ফলে লাভবান হয়েছিল এবং মজুদ করার দিকে ঝুঁকছিল। তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মিঃ হোসেন সঠিক ভাবেই মধ্য কৃষক ও নামমাত্র জমির মালিক ক্ষুদ্র কৃষকের আচরণকে লক্ষ্য করেছিলেন। মধ্য কৃষকরা 'বার্ষিক খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন করে" এবং ফসলের একটি মাত্র অংশ "খাজনা ও অন্যান্য জরুরী খরচ মেটাবার জন্য" বিক্রী করে, আবশ্যকীয় পণ্য কেনার জন্য তাদের চড়া দাম দিতে হত, খারাপ ফসলের বছরে তাদের খাদ্য কিনতে হত। খাদ্যের প্রশ্নে ছোট কৃষকদের সর্বদাই ঘাটতির মধ্যে থাকতে হত। খারাপ ফসলের বছরগুলিতে তারা উপবাসের মুখোমুখি হত। সমস্ত শ্রেণীর কৃষকরাই "প্রচুর উৎপাদনের বছরগুলিতে বেশী খায়, মধ্য কৃষক ও প্রান্তিক চাষী কদাচিৎ বেশী দামের বছরগুলিতে বেশী খায়।"[৩৩]

প্রশ্ন হল বাঙলার মন্বন্তরকে খাদ্য সরবরাহের দ্রুত ও সাংঘাতিক অবনতির সঙ্গে যুক্ত করা যায় কিনা। এ বিষয়ে দুর্ভিক্ষ কমিশন উল্লেখ-যোগ্য গুরুত্ব দিয়েছে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গী বাঙলার মন্বন্তরের ক্ষেত্রে অচল। ১৯৪৩ এ মাথাপিছু খাদ্য শস্যের যোগান আগের বছরগুলির তুলনায় খুব ভিন্ন ছিল না। মার্চ থেকে মে তে চালের দাম বৃদ্ধির কারণ ছিল "প্রধানত মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে বাজার থেকে ফসল তুলে নেওয়া।" ১৯৪২-৪৩ এ অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল যার সঙ্গে যুদ্ধকালীন ব্যয়কে দায়ী করা চলে। মূল্যস্তর ক্রমশ উপরের দিকে উঠছিল। কয়েক শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাকৃত বেশী খাদ্য গ্রহণ করছিল এবং তাদের চাহিদার ব্যাপকতা খাদ্যের দামের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। কৃষি মজুরদের অবস্থার অবনতি হয়েছিল এবং তাদের মজুরী দাম স্তরের অনেক পেছনে পড়ে ছিল। ঘূর্ণিঝড় এবং ফাংগাস সংক্রমণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে কৃষিগত কাজকর্মের শ্লথ গতির জন্য কর্মসংস্থানের অবনতি ঘটেছিল। অধ্যাপক সেনের মতে, কিছু গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তাদের যা সত্যিকারের পাওনা তা হ্রাস পেয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে দুর্দশার ধরণ ছিল জটিল। সেটা প্রতিফলিত হয়েছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর দুঃস্থতার তারতম্যের মধ্যে।[৩৫]

দুর্ভিক্ষ কমিশন কৃষিগত কাঠামোর ওপর আলোকপাত করেছিল। ৭৫ লক্ষ পরিবার জীবিকার জন্য কৃষির ওপর নির্ভর করত, ৪২.৭ শতাংশ পরিবারের ২ একরেরও কম জমি ছিল। প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার—১

কোটি মানুষ কৃষি মজুরীর ওপর নির্ভরশীল ছিল, দশ লক্ষ পরিবার ছিল বর্গাদার। যে ছোট কৃষকদের ৫ বিঘারও কম জমি ছিল, তাদের উদ্বৃত্ত ছিল সামান্যই। অস্বাভাবিক দামে তাদের কাপড়, নুন, কেরোসিন, ওষুধ কিনতে হত। কুড়ি লক্ষ পরিবারের ২ থেকে ৫ একর জমি ছিল, এদের আর্থিক অবস্থাও ভঙ্গুর ছিল। বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশন লক্ষ্য করেছিলেন, সাধারণ পরিবারগুলিকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকতে হলে ৫ একর জমির প্রয়োজন হত, শুধুমাত্র আমন ফসল উৎপাদন করার ক্ষেত্রে ৮ একরের প্রয়োজন হত।[৩৬] মনে হয় ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ কৃষি মজুর এবং বর্গাদারদের দুর্বল হয়ে পড়ার অবস্থার দ্বারাই ১৯৪৩ এর দুর্দশার ধরণটি বোঝা যেতে পারে।

দুর্ভিক্ষ নীতি

আমরা সংক্ষেপে সরকারের দুর্ভিক্ষ নীতির পর্যালোচনা করব। দেশে দুর্ভিক্ষ হলে কৃষিগত সমস্যা এবং ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের বিষয় সামনে এসে পড়ে। দুর্ভিক্ষ নীতি পরিস্থিতির বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সংকট বা দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছিল। এটা খুব জানা বিষয় যে শাসক শ্রেণী সরকারী নিয়ন্ত্রণবিহীন প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিল। দুর্ভিক্ষের সময়ে মূল্যবৃদ্ধির মুখে সরকার খাদ্যশস্যের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে বরাবর বিরোধিতা করেছিল। ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের সহায়ক শক্তি মনে করা হয়েছিল, যারা অবাধ বাণিজ্যের নীতিসমূহকে রূপ দান করেছিল, ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের বাজারের কারচুপির সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি আদৌ যুক্ত করা হয় নি। লিটন সাবধান করে বলেছিলেন যে ফসলের বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ বা কার্যকলাপ বেসরকারী বাণিজ্যকে অসংগঠিত ও অচল করে দেবে। ১৯৪৩ এর বাঙলার দুর্ভিক্ষের সময়েই বেসরকারী বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষীণ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের তোষণ করার একটা ঝোঁক সরকারের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। মার্চে সরকার বিনিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করল এবং এরপরই দেখা গেল দামের তীব্র ঊর্ধ্বগতি, পূর্বাঞ্চল থেকে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের জন্য দামস্তর বিশেষ কিছুই প্রভাবিত হয়নি এবং মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে দাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল। চালের ব্যবসায়ী, বড়ো ভূস্বামী ও ধনী কৃষকরা খুবই লাভবান হল।

দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রামীণ মজুর ও কারিগরদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি সামনে এল। ১৮৬০ এ বেয়ার্ড স্মিথ লিখেছিলেন : যেখানে কাজের ব্যবস্থা করা গিয়েছে এবং কাজের জন্য মজুরী দেওয়া হয়েছে, সেখানে খাদ্যের সরবরাহও অব্যাহত থেকেছে।"[৩৭] ১৮৬০ এ সক্ষম ব্যক্তিদের রাস্তা নির্মাণ বা খাল কাটার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল ; ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল, এবং এখানে "হাল্কা ধরণের কাজ দেওয়া হয়েছিল।"[৩৮] ১৮৬৮-৬৯ এ সক্ষম ব্যক্তিদের বড়ো এবং ছোট কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৩৯] ১৮৮০ তে স্ট্র্যাচি কমিশন "স্থায়ী উপযোগিতার কাজে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেছিল যা একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য বিরাট সংখ্যক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত রাখতে পারে। পুকুর কাটা বা জলাধারের জন্য বাঁধ তৈরী করা ইত্যাদি গ্রামীণ কাজের সুপারিশ করা হয়েছিল। যে সব শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে অভাবগ্রস্ত নয়, তারা যাতে ত্রাণমূলক কাজে ঢুকে পড়তে না পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্হা রাখা দরকার। কমিশন ভূমিরাজস্ব আদায় স্থগিত ও তা মকুব করা, গবাদি পশু ও বীজ ধান কেনার জন্য জমির মালিক শ্রেণীদের ঋণ বণ্টনের সুপারিশ করেছিলেন, এবং দুর্ভিক্ষের ত্রাণ সাহায্যের বন্দোবস্তের জন্য কিছু বিধিব্যবস্হা সম্বলিত একটি 'ফেমিন কোড' বা দুর্ভিক্ষ ত্রাণের নিয়মাবলী রচনা করার সুপারিশ করেছিলেন। দুর্ভিক্ষ নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে সরকারী কার্যকলাপকে দেখা হল। দুর্ভিক্ষ নীতি সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে

"দুর্ভিক্ষ এমন একটি বিপর্যয় যা প্রকৃতিগত বিচারে একটি ব্যতিক্রম এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে উদ্ভূত হয়, যা এ দেশের জনসমাজকে তার চিরাচরিত খাদ্য সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করে এবং মজুরীভোগী শ্রেণীগুলির স্বাভাবিক কর্মসংস্হান সংকুচিত করে। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারেনা যে এটি এমন একটি বিপর্যয় যা ভারতের মতো একটি দেশে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ বাইরে। এই কারণে সরকারের সর্বোচ্চ কর্তব্য হল জনগণকে সমস্ত রকম বাস্তব সাহায্য দেওয়া···এবং এই কর্তব্য আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, কৃষিজীবী জনগণের একটি বিরাট অংশের কাছে সরকার ভূস্বামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।"[৪০]

সরকারী রিপোর্টে রেলপথ নির্মাণ ও সেচ গুরুত্বপূর্ণ স্হান অধিকার করেছিল। বেয়ার্ড স্মিথ সেচ ব্যবস্থার প্রসারের সুপারিশ করে বলেন

যে এই প্রসার "দুর্ভিক্ষের তীব্রতা হ্রাস" করতে পারত। ১৯০১ এর দুর্ভিক্ষ কমিশন রেলপথের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানগুলিতে খাদ্য নিয়ে যাওয়া এবং যেখানে প্রয়োজন সেই অঞ্চলগুলিতে খাদ্য সরবরাহ করতে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার মতো ইতিবাচক দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[৪২] "দুর্ভিক্ষ প্রশমিত করতে" রেলপথের নির্মাণ তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল তা হল কৃষির বিকাশ—আর এই ব্যাপারে সরকারের প্রসারমান কার্যকলাপ একটা বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। "দুর্ভিক্ষের এলাকা সীমাবদ্ধ রাখা এবং তার উপশমের ক্ষেত্রে" সেচ ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একটি দেশকে শুধুমাত্র সেচের সাহায্যে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা যায় না। সেচ ব্যবস্থা নির্মাণ রাষ্ট্রের পক্ষে বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ এবং এর কোনও সরাসরি আর্থিক প্রতিদান নেই। তথাপি সেচ কৃষিজীবী শ্রেণীগুলিকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দিতে পারে এবং তাদের মধ্যে সেই বিজ্ঞতা ও মিতব্যয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যেগুলি ছাড়া শুধু সেচ স্থায়ী বা দীর্ঘ মেয়াদী সুফল আনতে পারে না।"[৪৪]

গবাদি পশুর সমস্যার ওপর খুব কম লেখকই গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে মনে হয়। কোন রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হলে গবাদি পশু ব্যাপকভাবে মারা গিয়েছিল; দুর্ভিক্ষ কমিশন গবাদি পশুর প্রজনন, গবাদি পশু রোগসমূহের ব্যাপারে অনুসন্ধান এবং পশুখাদ্যের সরবরাহের উন্নতির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[৪৫] এটা সাধারণ কথা যে গবাদি পশু শক্তি, সার, জ্বালানি এবং খাদ্যবস্তুর উৎসস্বরূপ। রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার (১৯২৮) বলে যে ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে; কৃষির বিস্তারের জন্য ষাঁড়ের বা বলদের চাহিদা সত্ত্বেও ভাল বলদ পাওয়ার সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল; বাংলা ও মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবাদি পশুর অবনতি ছিল সাধারণ ব্যাপার। কমিশন চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বলদের সংখ্যা হ্রাস করার সুপারিশ করেছিল।[৪৬]

বছরের পর বছর ধরে গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং পশু-খাদ্য যোগানের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠল। কৃষি বিশেষজ্ঞরা নির্দেশ করেছেন, ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলিতে সাধারণ জমিতে গবাদি পশু বিচরণের চিরাচরিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই অনুপযোগী। পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য বিচরণভূমির মাত্র এক টুকরো জমি প্রয়োজন।[৪৭]

প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ সংখ্যার গবাদি পশু কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। তথাপি অনুৎপাদক গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল যেহেতু সাধারণভাবে মাংসের জন্য গবাদি পশু হত্যা করা হত না। মিরডাল বলেছেন ঃ

"শোচনীয় অবস্থায় উপনীত পশুরা কৃষির বহু প্রয়োজনীয় কাজ করতে অক্ষম ; এই ধরণের পশুকে বাঁচিয়ে রাখা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং এই সঙ্গে সুপরিচিত পশ্চাৎপদ কৃষিগত কৃৎকৌশলের পক্ষে ঝোঁক সৃষ্টি করে···প্রতিষ্ঠানগত এবং মনোভঙ্গীগত ছকে পরিবর্তন ব্যতীত চাষবাসের পদ্ধতির উন্নতি সাধন সম্ভব নয় ; যে ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত জোত, নিম্ন আয় এবং প্রজা বন্দোবস্ত হয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে অথবা তাদের অর্থনৈতিক ব্যবহার বাতিল করে দেয়, সেক্ষেত্রে এটা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনা।"[৪৮]

পূর্ববর্তী অংশে আমরা দেখেছি কৃষিগত কাঠামোর সঙ্গে দুর্ভিক্ষের যোগ আছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী রিপোর্ট কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্গনের বিষয়টি বার বার উল্লেখ করেছে। বেয়ার্ড স্মিথ ভূমিকর এবং দুর্ভিক্ষের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্ট্র্যাচি কমিশন "কৃষকদের অধিকার" নষ্ট বা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং যাদের কোন দখলী স্বত্বের অধিকার ছিল না সেই দুর্বল খাজনার ভারে পীড়িত স্বত্বহীন প্রজাদের কথা বলেছেন।

রমেশ দত্ত সারা ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসারের কথা বলেছেন এবং জোরের সঙ্গে এই মত প্রকাশ করেছেন যে "ভারত সেই সব ভয়াবহ ও নিরানন্দময় দুর্ভিক্ষগুলির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারত" যদি রাজস্বকে চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা হত।[৪৯] এটা সম্পূর্ণ সত্য যে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভূমিরাজস্বের ভার খুবই বেশী হয়েছিল ; কিন্তু মনে হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে দেখাবার ঝোঁক দত্ত দেখিয়েছিলেন। এই সত্য অস্বীকার করা যায় না যে সরকারের অংশ চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ছিল যদিও খাজনা অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। যে বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার তা হল, দুর্ভিক্ষের ফলে যে দুর্দশা হয়েছিল তার ধরণটি ছিল অত্যন্ত জটিল। রায়তরা দুর্ভিক্ষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত বিরাট অংশ ছিল গ্রামীণ মজুর যাদের ভূমিরাজস্ব হার একেবারেই স্পর্শ করতে পারেনি। ১৯০০ এর ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের পর, দত্ত ভূমির

করের প্রশ্নটি তোলেন এবং প্রস্তাবের একটি তালিকা তৈরী করেন।[৫০] ১৯০২ এর শুরুতে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের খোলাখুলি নিন্দা করা হয়। ঐ প্রস্তাবের কয়েকটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

"...চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বাঙলা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, এই মর্মে যুক্তির—যে যুক্তি ইতিহাসের দ্বারা অপ্রমাণিত হয়েছে—কোনই ভিত্তি ভারত সরকারের জানা নেই ঃ সুতরাং অনুরূপ বন্দোবস্ত অন্যত্র প্রসারিত করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে—এই মর্মে ভবিষ্যৎ বাণীকে বিশেষ মূল্য দিতে সরকার রাজী নয়। গত শতাব্দীতে ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা সৃষ্ট জমিদারগণ প্রজাদের অবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে অত্যন্ত আরাম ও সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করেছে—এ রকম যুক্তি দেওয়ার পক্ষে ভিত্তি আরও দুর্বল।

"...যে তত্ত্বটি প্রচারিত হয়েছে তা হল, ভারত সরকার কর্তৃক কোন না কোন রূপে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত ভূমিরাজস্বর পরিমাণ দুর্ভিক্ষের জন্য মুখ্যত দায়ী। এরই অনুসিদ্ধান্ত হল ভূমিরাজস্বর পরিমাণ হ্রাস পেলে দুর্ভিক্ষ কম হবে অথবা অন্তত পক্ষে দুর্ভিক্ষ হলেও তা অনেক কম দুর্গতির কারণ হবে। সপারিষদ গভর্নর জেনারেল বিশ্বাস করেন না যে ইতিহাসে লিখিত তথ্য অথবা বর্তমান কালের পরিস্থিতি থেকে এই তত্ত্বের কোন সমর্থন পাওয়া যেতে পারে ...১৮৯৬—৯৭ এর দুর্ভিক্ষে যে সব জেলা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই সব জেলায় চল্লিশ বছরের মধ্যে রাজস্বের কোন বৃদ্ধি ঘটেনি...ভ্রান্তির অতিরিক্ত উৎস হল এই ভ্রান্ত ধারণা যে দুর্ভিক্ষের ফলে দুর্গতরা এবং দুর্ভিক্ষ ত্রাণের গ্রহীতারা খাজনা দাতা অথবা রাজস্বদাতা শ্রেণীগুলির থেকে প্রধানত আসে। কোনও ব্যাপকভিত্তিক ত্রাণমূলক কাজের যে কোনও পরীক্ষা থেকে দেখা যাবে যে যদিও প্রজাদের দরিদ্রতর অংশ ত্রাণকাজে সুবিধাভোগীদের মধ্যে নেই তা নয়, কিন্তু এটাও দেখা যাবে যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রায়ত নয়—তারা হল কৃষি শ্রমিক যারা কিন্তু ভূমিরাজস্বের পরিমাণ দ্বারা বস্তুতপক্ষে কোন ভাবেই প্রভাবিত হয় না।"[৫১]

দুর্ভিক্ষের সমস্যা যে কৃষিগত কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত তা দেখাবার জন্যই প্রস্তাবের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কৃষিব্যবস্থা একটা সংকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এই সংকট

ভারতীয় ভূমিব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনকে পুরো ভাগে এনেছিল। ১৯৪০ এর ভূমি রাজস্ব কমিশন এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে জমিদারী ব্যবস্থায় এত বেশী ত্রুটি বা গলদ দেখা দিয়েছে যে এটি আর জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ১৯৪৫ এর দুর্ভিক্ষ কমিশন এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেছিল।[৫২] কিন্তু সরকার ভূমি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে অসম্মত হয়েছিল এবং যে বিষয় আমরা এখন উল্লেখ করব সেই প্রজাস্বত্বের আইন নোতুন ভূস্বামীদের একটি শ্রেণী, যথা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ধনী কৃষক, তাদের স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল; এবং প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়েছিল কৃষক বিক্ষোভের ধাক্কায়, যে বিক্ষোভ ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলেছিল।

নির্দেশিকা

১। রমেশ দত্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২৭৫।

২। ঐ, পৃ—২৭৩।

৩। বেয়ার্ড স্মিথ, রিপোর্ট অন ফেমিন ইন এন, ডবলিউ পি, ১৮৬১ ; এ ছাড়াও ভাটিয়া ফেমিনস ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬৭, পৃ ৬০—৬২। সরকার বেসরকারী ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করেছিলেন এবং খাদ্যশস্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সামান্যই কিছু করা হয়েছিল, মজুররা মিলিটারী ব্যারাক নির্মাণ এবং জলসেচের কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছিল।

৪। স্মিথের রিপোর্ট, দত্ততে উল্লিখিত, পূর্বোল্লিখিত পৃ—২৭৪।

৫। ভাটিয়া, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৬৫-৬৭। সরকার নিজের খরচে চাল আমদানী করতে অসম্মত হয়েছিলেন। বিহারের চম্পারণ, ভাগলপুর, সাহাবাদ, গয়া, মুঙ্গের দুর্ভিক্ষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

৬। ঐ, পৃ ৭০-৭২। ভাটিয়া ককরেলের রিপোর্ট অফ ফেমিন ইন বেঙ্গল অ্যাণ্ড বিহার, ১৮৬৬ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ; বাঁকুড়া, নদীয়া, হুগলী, ২৪ পরগণা দুর্ভিক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যে শ্রেণীরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারা হল, কারিগর ও গ্রামীণ মজুর।

৭। ঐ পৃ—৭৩-৭৫। মাদুরার সালেম, কোয়েম্বাটুর, সাউথ

আর্কট ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল।

৮। রেজোলিউসন অফ দি গভর্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অন ফেমিন পলিসি (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮) ফিলিপস এ উল্লিখিত, পৃ—৬৬৮। ম্যালথাস অনুরূপ বিশ্লেষণ করেছেন ; তাঁর মতে ফাটকাবাজ এবং ব্যবসায়ীরা খাদ্য ঘাটতির সময়ে বাজারে খাদ্যশস্য না এনে ভাল কাজই করেন।

৯। শ্রীবাস্তব, ইণ্ডিয়ান ফেমিনস (১৫৫৮—১৯১৮), ১৯৬৮, পৃ ৯৫-৯৬।

১০। হেনভি ন্যারেটিভ অফ ফেমিন ইন এন, ডাবলিউ, পি (১৮৬৯) ভাটিয়া পূর্বোল্লিখিত পৃ ৭৮-৭৯।

১১। ভাটিয়া, পূর্বোল্লিখিত পৃ—৯৪-৯৬। ১৮৭৭ এর জানুয়ারীতে রিচার্ড টেম্পল বেলারি, কুডাপ্পা এবং কুর্নুলের ত্রাণ শিবিরে প্রায় ১০ লক্ষ মজুর দেখেছিলেন।

১২। লিটনের মিনিট (১২ই আগস্ট ১৮৭৭), লিটনস পেপারস, ফিলিপস, পূর্বোল্লিখিত পৃ—৬৬৯-৭০। লিটন লিখেছেন যে দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে খারাপ ফলগুলি রেল এবং ত্রাণকার্যের কল্যাণে সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে।

১৩। রিপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশন (১৮৮০) পৃ ৩৪-৩৫। কমিশন সরকারী হস্তক্ষেপের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিল : সরকারী হস্তক্ষেপ মনে হয় বাস্তবের দিক থেকে কার্যকরী সুফল সৃষ্টি করতে পারে…কৃষিজীবীদের কাছে সরকার ভূস্বামীর স্থান গ্রহণ করে…"।

১৪। ঐ, পৃ—১১৮। দখলীস্বত্বের কৃষকরা "স্বত্বহীন প্রজাদের চেয়ে সম্পন্ন"…নিয়মানুসারে তারা বৃহৎ আয়তনের জমির অধিকারী জমির ওপর তীব্র চাপের ফলে খাজনার হার মারাত্মক ভাবে বাড়ানো সম্ভব।

১৫। ভাটিয়া, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২৪১-৪৩। বোম্বের পার্বত্য উপজাতির মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশী ছিল।

১৬। ঐ, পৃ—২৪৯।

১৭। শ্রীবাস্তব, পূর্বোল্লিখিত, ঐ ছাড়াও মেরেওয়েদার, এ টুর থ্রু ফেমিন ডিস্ট্রিক্টস, পৃ—২৫৭।

১৮। দত্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৮৫।

১৯। বোম্বে. ফেমিন রিপোর্ট (১৮৯৯-১৯০২), ১ম খণ্ড শ্রীবাস্তবে উল্লিখিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২৭২।

২০। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান ফেমিন কমিশন, ১৯০১, পার্ট ৩, পৃ-৯৭—৯৯।

২১। ঐ, পৃ—১১১-১১৩ ; এ ছাড়াও পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২২। রিপোর্ট অফ ফেমিন এনকোয়ারি কমিশন (১৯৪৫), পৃ—৭০-৭২। অধ্যাপক কে. পি চট্টোপাধ্যায়ের হিসেব অনুসারে ১৯৪৩ এ মোট মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩-৫ মিলিয়ন। ১৯৪৩ এর নভেম্বরে, লঙ্গরখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬৬২৫ এবং এর মধ্যে ১৫৬টি লঙ্গরখানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা পরিচালিত হত। এটা লক্ষ্যণীয় যে পিপলস রিলিফ কমিটি এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মতো বে-সরকারী সংগঠন লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করেছিল। প্রায় ৫৫,০০০ দুঃস্থ শহরের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। নভেম্বরের শেষ দিকে দুঃস্থদের অধিকাংশ তাদের গ্রামে ফিরে গিয়েছিল।

২৩। কে ঘোষ, ফেমিন ইন বেঙ্গল (১৯৪৪), পৃ ১৪৬-৪৭।

২৪। রিপোর্ট, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃ—২৫-২৭, ৮৩। ১৯৪৩ এর ১৫ই নভেম্বর কে, সি নিয়োগী সেন্ট্রাল এসেম্বলীতে বক্তৃতায় সামরিক কর্তৃপক্ষ শিল্প সংস্থা ও চা বাগান কর্তৃক ক্রয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেনঃ "শস্য সংগ্রহের জন্য উন্মত্ত কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল," প, ১৭৬-৭৭।

২৫। রিপোর্ট পৃ—৯৪। দুর্ভিক্ষ কমিশন ইস্পাহানির প্রতিষ্ঠান এবং হনুমান বক্সের মধ্যে যোগসাজস সম্বন্ধে একমত হতে পারে নি। আশ্চর্যের বিষয় সমসাময়িক সংবাদপত্র চাল ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নীরব।

২৬। স্টেট্সম্যান, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩।

২৭। রিপোর্ট, পৃ-২০। ধান চাষের আওতাধীন এলাকা ছিল ১৯৪২-৪৩ এ ২৩'৩ মিলিয়ন একর ; পাট চাষের অধীন এলাকা ছিল ২.৭ মিলিয়ন একর।

২৮। ঐ, পৃ—১৫।

২৯। ঐ, ১৯০১ এ জনসংখ্যা ৪২.১ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪১ এ দাঁড়ায় ৬০.৩ মিলিয়ন।

৩০। রিপোর্ট, পৃ—৩৩-৩৫।

৩১। ঐ, পৃ—৩৫, ১০৪-০৫। কমিশন মন্তব্য করে যে "নিয়ন্ত্রণ-বিহীন অবাধ বাণিজ্য" ছিল ভ্রান্ত নীতি।

৩২। স্টেটসম্যান, ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৩।

৩৩। এস. এম. হোসেনের ভিন্নমত উল্লেখ করে বিবৃতি দ্রষ্টব্য, ঘোষ, পূর্বোল্লিখিত, পরিশিষ্ট।

৩৪। অমর্ত্য সেন 'ফেমিনস এ্যাস ফেলিওরস অফ একসচেঞ্জ এন-টাইটেলমেণ্টস, ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি, স্পেশাল নাম্বার, ১৯৭৬। ফেমিন কমিশন লক্ষ্য করেছিল যে গ্রামীণ মজুর, কারিগর এবং ছোট জোতের মালিকরা বাসনপত্র এবং গহনা, বাড়ী এবং জমি খাদ্য ক্রয়ের জন্য বিক্রী করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের সার্ভে এই তথ্য প্রকাশ করে যে ঢাকা ও নদীয়ার মৎস্যজীবীরা সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

৩৫। সেন, পূর্বোল্লিখিত।

৩৬। রিপোর্ট, পৃ—৬-৭, ২০২।

৩৭। স্মিথের রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ১৭৫ শ্রীবাস্তব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ-৫৩।

৩৮। লোভেট "দি ডেভেলাপমেণ্ট অফ ফেমিন পলিসি" কেমব্রিজ হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৬৪।

৩৯। ঐ।

৪০। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান ফেমিন কমিশন (১৮৮০), পার্ট-১, পৃ—৩৪-৩৫।

৪১। শ্রীবাস্তব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৫১।

৪২। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান ফেমিন কমিশন, ১৯০১-৩ পার্ট—১, পৃ—১১১-১২।

৪৩। ঐ।

৪৪। রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান ইরিগেসন কমিশন, ১৯০১-৩, পার্ট-১, পৃ-১২৫-২৬।

৪৫। ঐ।

৪৬। রিপোর্ট অফ দি রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার ১৯২৮, পৃ ১৯১—৯২।

৪৭। মিরডাল পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৭৩।

৪৮। ঐ, পৃ—১২৭৪—৭৮।

৪৯। দত্ত ফেমিনস অ্যান্ড ল্যান্ড অ্যাসেসমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ১৯০০। ১৯০০ এ কার্জনের কাছে লিখিত পত্রে দত্ত লেখেন "আমি এই মুহূর্তে ভারতের অন্যান্য অংশে বাঙলার ব্যবস্থার প্রসারণের কথা বলছি না।" ১৮৯৯-১৯০০তে দত্ত হ্যামিলটনের কাছে আবেদন করেন রায়তওয়ারি এলাকায় জমির কর হ্রাসের জন্য। ১৯০০ তে কার্জনের কাছে লিখিত পত্রে হ্যামিলটন দত্তকে "একজন অবিশ্বাসী চতুর ব্যক্তি" বলে বর্ণনা করেন যিনি বাঙলা এবং মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের মধ্যে গভীর পার্থক্য দেখিয়েছিলেন। হ্যামিলটনের মতে ভূমি কর স্বাভাবিক ছিল। হ্যামিলটন পেপার্স ১৯০০।"

৫০। দত্ত কার্জনের কাছে খোলা চিঠি, ১৯০৪।

৫১। ভারত সরকারের প্রস্তাব (১৬ই জানুয়ারী, ১৯০২) ভারত সরকারের গেজেট, ৩ নং, ১৮ই জানুয়ারি ১৯০২। এই প্রস্তাবের পটভূমিকা হল কার্জনের কাছে লেখা রমেশ দত্তের পত্রাবলী এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত কিছু অফিসারদের স্মারকলিপি।

৫২। রিপোর্ট, পৃ—৪৫০।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃষক বিক্ষোভ—১

উত্তর প্রদেশ জমিদারী বিলোপ কমিটি একটি উদ্ঘাটনকারী অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে কৃষি পরিস্থিতিকে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন: "যুগব্যাপী ধিকি ধিকি অসন্তোষ আমাদের প্রদেশে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রকাশ্যে বিরোধিতা ও কখনও কখনও হিংসায় ফেটে পড়ার মধ্য দিয়ে একটি সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের প্রজাদের মধ্যে যে ধৈর্য ও আত্মসংযম আমরা দেখি তা এই প্রত্যাশার জন্য যে দেশ যারা শাসন করেছে তারা তাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতীকার করবে। সেই প্রত্যাশা একবার নষ্ট হয়ে গেলে প্রজারা মরিয়া হয়ে উঠবে। এই অসন্তোষ বিদ্রোহে পরিণত হতে পারে এবং আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা এই হিংসার প্রকাশের ফলে বিপন্ন হতে পারে।"

বাস্তব ঘটনা হল ব্রিটিশ রাজত্বের একেবারে শেষ পর্যন্ত কৃষক বিক্ষোভ তীব্র ছিল এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ জ্বলে উঠেছিল। সাম্প্রতিক কালে যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ জমে উঠেছে তার থেকে এটা স্পষ্ট যে সমস্ত বর্গের কৃষকরাই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, যে আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে চালিত ছিল। প্রায়ই কৃষকরা খাজনা বৃদ্ধি, উচ্ছেদ ও মহাজনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করত এবং ফসলের আর্থিক খাজনায় রূপান্তরকরণ, জমিদার কর্তৃক ধার্য খাজনা হ্রাস, এবং দখলী স্বত্বের অধিকার দাবী করত। আপাতদৃষ্টিতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বন্ধনকে শিথিল করতে চেয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিল ধনী কৃষকেরা যারা চাষের উন্নতি করতে চেয়েছিল এবং বাণিজ্যিক কৃষির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় যে ধনী কৃষকেরা প্রায়ই কৃষক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিত। যতদিন পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়, ততদিন ধনী ও গরীব কৃষকদের স্বার্থ ছিল অভিন্ন। যখন সামাজিক পার্থক্যীকরণের ব্যবস্থাটি ত্বরান্বিত হল, (যা একদিকে ধনী কৃষকের একটি শ্রেণী অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষকদের একটি শ্রেণীর উদ্ভবের দ্বারা চিহ্নিত ছিল) তখন বিভিন্ন লক্ষ্য ও উচ্চাশা বিভিন্ন স্তরের কৃষকদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

কৃষক অভ্যুত্থান কৃষি সমস্যার চূড়ান্ত গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ক্রমবর্ধমান কৃষক বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে সরকার প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করেন। প্রশ্ন হল, প্রজাস্বত্ব আইন সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে কমাতে পেরেছিল কিনা। মনে হয়, শাসক শ্রেণী একদিকে ধনতান্ত্রিক কৃষির বিকাশ সাধন এবং অপরদিকে জমিদারদের স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখার উভয় সংকটে পড়েছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে ভূস্বামীদের ক্ষমতাশালী অবস্থানকে কদাচিৎ ক্ষুন্ন করা হয়েছিল। কৃষক আন্দোলনে অনিবার্যভাবে খাজনার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে খাজনাদাতা প্রজাদের সংগ্রাম কয়েক বছর ধরে অব্যাহতভাবে চলছিল।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, গ্রামীণ ঋণের সমস্যাটি ছিল তীব্র। উনিশ শতকে কৃষকদের আক্রমণকে কখনও কখনও মহাজনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা হত। লক্ষণীয় হল, মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন কদাচিৎ গতিবেগ লাভ করেছিল। এর আংশিক কারণ হল, নেহাৎ খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য কৃষকদের মহাজনদের ওপর নির্ভর করতে হত। কৃষকদের স্বতন্ত্র স্বাধীন শ্রেণী সংগঠন হিসেবে কৃষকসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসংস্কারের দাবী ক্রমশ পুরোভাগে এল। গান্ধীবাদী ঢঙের সত্যাগ্রহকে বর্জন করে কৃষকসভা "আংশিক সংগ্রাম" সংগঠিত করল এবং সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু হল। গরীব কৃষক ও কৃষিজীবী শ্রমিকদের মধ্যে কৃষক আন্দোলন প্রসারিত হলে কৃষকদের ঐক্য রক্ষার সমস্যাটি দুঃসমাধেয়ই রয়ে গেল। মনে হয়, গ্রামে যে ধনী কৃষকদের বিশেষ প্রভাব ছিল। তারা যাতে দূরে সরে না যায় বা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে কৃষকসভা বিশেষভাবে সতর্ক ছিল ; কৃষক আন্দোলনকে কার্যকরী করতে গিয়ে তাদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কৃষক আন্দোলনে যে সব বিষয় জড়িত ছিল সে সবের ভিত্তিতেই ধনী কৃষক তার কার্যবিধি স্থির করত এবং সে নিজের চাল ভালই চেলেছিল।

কৃষক বিদ্রোহ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রধান কৃষক বিদ্রোহগুলির কয়েকটি বাঙলা দেশে জ্বলে উঠেছিল যা পেশাদার ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা সংক্ষেপে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক অভ্যুত্থানের কাহিনীগুলি বিবৃত করব এবং কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করব।

১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম, বাঁকুড়া, সিংভূম, হাজারিবাগ, ভাগলপুর এবং মুঙ্গেরে ছড়িয়ে পড়া সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রধানত মহাজনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল যদিও খাজনার প্রশ্নটি সাঁওতালদের আলোড়িত করেছিল। রাজমহল পাহাড়ের প্রান্তদেশে দামিন-ই-কোতে মহাজনরা প্রধানত এসেছিল বাংলা ও বিহার থেকে যারা চড়া হারে সুদ আদায় করত এবং সমসাময়িক একটি পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে দশগুণ দিয়ে দেওয়ার পরেও যে ঋণ সাঁওতালদের ওপরে ভূতের মতো চেপে বসেছিল তার দায় তার ফসল, তার গবাদি পশু এমন কি তার নিজেকে এবং তার পরিবারকেও (মহাজনের) কবলে চলে যেতে দেখেছিল।[১] এটাও একটা ঘটনা যে "জমিদাররা পুলিশ, রাজস্ব বিভাগ ও আদালতের আমলারা নিংড়ে নেওয়া নিপীড়নমূলক আদায় এবং জবরদস্তি সম্পত্তি-চ্যুতির মিলিত ব্যবস্থা চালিয়েছিল।"[২]

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন ১০,০০০ সাঁওতাল ভাগনাদিহিতে সমবেত হয় এবং বাঙালী ও বানিয়া মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই ও দেশ দখল ও তাদের নিজস্ব একটি সরকার গঠনের দৃঢ় মনোভাব তারা প্রকাশ করেছিল।[৩] বিদ্রোহ সুরু হলে পাঁচজন মহাজন নিহত হল, দীঘির দারোগা মহেশ লাল দত্তকে খুন করা হল, বহু মহাজনদের বাসস্থান বারহাইত বাজারে হানা দেওয়া হল, ভাগলপুর এবং রাজমহলের মধ্যেকার রেল যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিনষ্ট করা হল; সাঁওতালরা মুর্শিদাবাদ জেলার পাকুড়ের দিকে অগ্রসর হল; একজন মুসলমান ভূস্বামী রাহাসাদি মণ্ডলের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী দীনদয়াল রায় যখন নিহত হল, সাঁওতালরা উল্লসিত হয়ে চেঁচাল; "ঐ আঙুলগুলো দিয়ে তুমি তোমার সুদ গুনেছ।"[৪] ১৪ই জুলাই সাঁওতালরা মহেশপুরের রাজার বাড়ি লুট করল এবং পরের দিন সকালে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হল; কিন্তু "শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী পরাজিত হল।" ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জুলাই ভাগলপুরের কমিশনার রিপোর্ট করেন. যে "গোয়ালা. কলু এবং অন্যান্য জাতের মানুষ সাঁওতালদের লেলিয়ে দেয় এবং নিপীড়নমূলক কার্যকলাপে উত্তেজিত করে" এবং তাদের গোপন খবরা খবরের যোগান দেয়, তাদের মাদল বাজায়, কাজ পরিচালনা করে এবং গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে।"[৫] ও' ম্যালি সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে সাঁওতালদের বেপরোয়া সাহসের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"কোন একটি ঘটনায় সিপাহীদের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা একটি মাটির

কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিল। তার ওপর গোলার পর গোলা বর্ষিত হল… প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তীর নিক্ষেপ করে সাঁওতালরা জবাব দিয়েছিল। অবশেষে যখন তাদের গোলাবর্ষণ বন্ধ হল, তখন সিপাহীরা কুটিরে প্রবেশ করল এবং দেখল মাত্র একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি জীবিত আছে। একজন সিপাহী তাকে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানাল ; সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং যুদ্ধের কুড়ুল দিয়ে তাকে কেটে ফেলল।"[৬]

১৮৫৫ এর ১১ই আগষ্ট ভাগলপুরের কমিশনার মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লেখেন যে "সাঁওতালরা আমাদের জেলার এবং মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের সৈন্যদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সংগ্রামে রত ছিল।"[৭] ১৮৫৫ এর ২৪ শে সেপ্টেম্বর বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট করেন যে "নাগোর থেকে চার মাইল পশ্চিমে লোরোজোর থেকে দেওঘরের প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল তাদের দখলে। ডাক ব্যবস্থা অচল এবং গ্রামবাসীরা তাদের গ্রাম পরিত্যাগ করেছিল এবং পালিয়ে গিয়েছিল।"[৮]

সাঁওতাল বিদ্রোহের জন্য শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামান্যই সহানুভূতি ছিল। উদারপন্থী পত্রিকা সোমপ্রকাশ ছোট শহরগুলিতে সৈন্য সরবরাহ করার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল যার ফলে বিদ্রোহীরা জঙ্গলে থাকতে বাধ্য হয়।[৯] সংবাদ ভাস্কর রিপোর্ট করে যে "বিহারের বিধর্মী মুসলমানরা এই মর্মে গুজব ছড়াচ্ছিল যে সাঁওতালদের নবজাগরণ শীঘ্রই ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য করবে।[১০] দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে লিখেছিলেন : "এটা শুধুমাত্র রক্ত পিপাসু বর্বরতার মধ্য দিয়ে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা ·· এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য আমরা শুধু আশাই করতে পারি…সাঁওতালরা বিশ্বাস করে যে তারা রক্ত পাতের বিলাসিতা উপভোগ করতে পারে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও একমাস ধরে লুঠ করতে পারে…প্রতিশোধ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে…ভবিষ্যতের দাঙ্গাকারীদের সুযোগের হিসেব না করে…"[১১]

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালের মধ্যে বিদ্রোহকে দমন করা হল, জানুয়ারীতে সামরিক আইন জারী স্থগিত রাখা হল। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা কানহুকে ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। যদিও সাঁওতাল পরগণা জেলা তৈরী হল এবং সরকার সরাসরি এই জেলা শাসন করতে মনস্থির করলেন, তথাপি সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ চলতেই থাকল প্রধানত এই কারণে যে জমিদাররা সাঁওতাল প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি

করেছিল। ১৮৭১-৭২ এবং ১৮৮২ তে বিক্ষোভের পুনঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

১৮৫৯ এর শরৎকালে ব্রিটিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলবিদ্রোহ জ্বলে উঠল। এই বিদ্রোহ বারাসাতে শুরু হল যা ১৮৩৮ এর ফারাজী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্রোহ নদীয়া, বারাসাত, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, মালদা, ফরিদপুর এবং মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে নদীয়ার জেলা শাসক হারসচেল রিপোর্ট করেন যে "রায়তদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের একটা সাধারণ চেতনা গড়ে উঠেছিল। যেন খুব একটি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা থেকে তারা মুক্ত হতে চায়, সেই আন্দোলনের শ্লথগতির জন্য তারা অধৈর্য এমন ভাবেই তারা চলছিল।[১২] নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে ডাঃ ক্লিং কৃষকদের প্রতিরোধের সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন :-

"নীল চাষের বিরুদ্ধে একটি" নিয়মিত সংগঠন গড়ে উঠেছিল, হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে দিয়েই শপথ করানো হয়েছিল। এক গ্রামের রায়তরা অন্য গ্রামের রায়তদের সাহায্য করার জন্য মাদল বাজিয়ে ডাকত, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত হলে তারা প্রতিরোধ করত। নানারকম সঙ্কেত তৈরী করা হত ও সঙ্কেত দেওয়া হত; চাঁদা তোলা হত; গ্রামবাসীরা মাদলের শব্দে সাড়া দিত এবং বিশালভাবে দল বেঁধে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিপন্ন জায়গাগুলোতে যেত।"[১৩]

যদিও বিদ্রোহের পক্ষে উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন ছিল, তথাপি জমিদার, তালুকদার, মহাজন, ধনী কৃষক এবং নীলচাষের কর্মচারীদের মধ্য থেকেই নেতা ও সংগঠকের আবির্ভাব ঘটত। মনে হয়, নীলকররা গ্রামীণ জনসমাজের সমস্ত শ্রেণীকেই দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জমিদাররা একথা মেনে নিতে পারেনি যে নীলকররা গ্রামে প্রভাব বিস্তার করবে। নীলকররা তাদের জমিদারির এলাকা প্রসারিত করার চেষ্টা দৃঢ়তর করলে জমিদাররা ভেবেছিল যে রায়তদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে; প্রকৃতপক্ষে নীলকররা তাদের জমিদারিতে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের মতোই আচরণ করত।[১৪] এই বিদ্রোহে জমিদারদের ভূমিকার ওপরে কিঙ্ উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রামরতন রায় নামক এক ব্যক্তি যশোর, ফরিদপুর এবং পাবনাতে ভূসম্পত্তি দখল করেছিলেন; তিনি একজন বীর হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন যিনি পাবনার বেল্লবারিয়া কারখানার নীলকরদের বিরুদ্ধে ১২০০ লাঠিয়াল পরিচালনা করেছিলেন। রামরতন রায় এবং একজন জমিদার মহেশ চট্টোপাধ্যায়কে জেলাশাসক

বর্ণনা করেছেন "নদীয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উত্তেজনাকারী নেতা" বলে। রাণাঘাটের পালচৌধুরীরা নীলকরদের সঙ্গে কয়েকটি ঘটনায় জড়িত ছিলেন। শিবনিবাসের বৃন্দাবন সরকার প্রায়ই রায়তদের অর্থ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতেন।[১৫] বিশ্বাস ভ্রাতারা, নদীয়ার চৌগাছার দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস রূপকথার চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁরা রায়তদের নীলচাষ করতে নিষেধ করতেন, নীলকরদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য বরিশাল থেকে লাঠিয়াল ভাড়া করতেন এবং যখন নীলকররা রায়ত-দের বিরুদ্ধে ডিক্রী পেত তখন তাদের আর্থিক সাহায্য করতেন।[১৬] মোরাদ বিশ্বাস বা মল্লিক ভ্রাতাদের মতো নীলকুঠির কর্মচারী বা চাকুরে ছিল যারা সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। বিশ্বাস ভ্রাতারা বাঁশবেড়ের নীলকুঠির কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন।[১৭] নিশ্চিতভাবেই মণ্ডল বা মোড়লরা বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল যারা প্রচুর শস্য গোলার মালিক হওয়ার ফলে গ্রামে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্লিঙ্ লিখেছেন যে, নীলবিদ্রোহের নেতা হিসেবে যে সমস্ত গ্রামীণ প্রধান বা মণ্ডলের নাম শোনা যায় তারা সংখ্যায় এত বেশী যে বিবৃত করা সম্ভব নয়।"[১৮] নীলকরদের বিরুদ্ধে মণ্ডলদের মধ্যে কিভাবে তিক্ততা জেগে উঠেছিল লালবিহারী দে তার বর্ণনা দিয়েছেনঃ "নীলকররা আমাদের দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ঐ শালারা আসার আগে এ দেশ রামরাজত্বের অযোধ্যার মতই সুখী ছিল। কিন্তু এখন সব কিছু ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এরা আমাদের উপর অত্যাচার করে, আমাদের মারধোর করে, আমাদের বন্দী করে রাখে, আমাদের নির্যাতন করে, আমাদের স্ত্রী ও কন্যাদের অসম্মান করে। নীল বাঁদররা ধ্বংস হোক। মারো শালাকে মারো।"[১৯]

যেহেতু ধনী কৃষক ও জমিদার এই বিদ্রোহে জড়িত ছিল, তাই গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত শহরের এমন মধ্যবিত্ত শ্রেণী রায়তদের পক্ষে তাদের শক্তি প্রয়োগ করার ঝোঁক দেখিয়েছিল। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা রায়তদের স্বার্থ তুলে ধরেছিল এবং দরিদ্র পরিবার থেকে আগত ও একজন সরকারী কর্মচারী, পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় তাঁর কলকাতা বাসভবনে ছুটে আসা কৃষকদের সাহায্য করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে আর্থিক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। হরিশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নিযুক্ত কয়েকজন মোক্তার মফঃস্বলের কোর্টে রায়তদের পক্ষে মামলা করেছিলেন। যশোরের তালুকদারি পরিবার থেকে এসেছিলেন শিশির

কুমার ঘোষ। নীলচাষের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশের জন্য যশোরের জনগণের আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বিবরণ পাঠান। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী দীনবন্ধু মিত্র তার নীলদর্পণ নামক নাটকে নীলচাষের ব্যবস্থার ভয়াবহতাকে চিত্রিত করেন। বুদ্ধিজীবীদের মনে এই নাটকের প্রভাব সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন "নীলদর্পণ আমাদের সকলকে আচ্ছন্ন করেছিল।"[২০]

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের খাজনা আইন বলবৎ হওয়ার শুরুতে খাজনা সংক্রান্ত যে বিক্ষোভ হয়েছিল তার সঙ্গে ১৮৬০ এর শরৎকালে নীল বিদ্রোহ মিশে গিয়েছিল।[২১] হাণ্টার যেমন বলেছেন এই আইনের প্রয়োগের ফলে "খাজনা বৃদ্ধি ঘটেছে এবং যেখানে নীলকররা ভূস্বামী সেখানে এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে।"[২২] রায়তরা যখন নীলকর জমিদারদের দ্বারা ধার্য খাজনার বিরুদ্ধতা করল তখন বিদ্রোহের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল, পোড়াদহ অঞ্চলের নীলকর জমিদারদের বিরুদ্ধে যশোরের কৃষকরা খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করেছিল ; তিনমাসের মধ্যে আন্দোলন পাবনা, নদীয়া এবং ফরিদপুরে ছড়িয়ে পড়ল। বাঙলার জমিদাররা এর লক্ষণগুলি ধরতে দেরী করেনি এবং "সঙ্গে সঙ্গে সংঘর্ষের ধারাকে মন্থর করে দিতে শুরু করে দিয়েছিল।"[২৩] জগবন্ধু ঘোষ ঔরঙ্গাবাদের সংস্থার সঙ্গে মীমাংসা করলেন ; মহেশ চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় চলে গেলেন ; সোমচন্দ্র পালচৌধুরী রবার্ট লালমুরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করলেন।[২৪] আপাতদৃষ্টিতে জমিদার ও মহাজনরা খাজনা সংক্রান্ত গোলমালে অতি সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছিল, নীল বিদ্রোহ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল নীলকররা তাদের সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতায় হাত দেওয়া থেকে বিরত হল। ক্লিঙ যেমন দেখিয়েছেন ঃ "নীলবিদ্রোহ নিম্নবঙ্গে নীলকরদের হাত থেকে মহাজনদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সূচিত করল।"[২৫]

খাজনার প্রশ্ন

এই প্রসঙ্গে আমরা ১৮৫৯ এর প্রজাস্বত্ব আইনের দিকে তাকাই— খাজনার প্রশ্ন কিভাবে জমিদার ও প্রজার মধ্যেকার সম্পর্ককে তিক্ত করেছিল তা বোঝা যাক। প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৫৯ এর দশম আইন) বাংলা, বিহার উড়িষ্যা এবং বারাণসীর রায়তদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। দখলী স্বত্ব দেওয়া হয়েছিল 'প্রত্যেক রায়তকে যারা জমি চাষ করেছে, বা যাঁরা

বছরের জন্য জমি ভোগ করেছে' কিন্তু 'খামার, নিজ জোত অথবা শির জমি'' এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া অথবা বছরের পর বছর ধরে একজন রায়তের দখলের অধিকার'' পাওয়া জমির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হত না।[২৬] এই ভাবে সম্পন্ন রায়তরা তাদের জমি বর্গাদার অথবা দখলী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত প্রজাদের বন্দোবস্ত দিতে পারত। বাঙলার জোতদাররা দখলী স্বত্বের রায়ত হিসেবে নথিভুক্ত ছিল যদিও তাদের জমি বর্গা চাষের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। রংপুরের কালেকটার গ্লেজিয়ার যথার্থই লক্ষ্য করেছিলেন যে ''শুধুমাত্র দখলী স্বত্বের রায়তদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রজাদের অর্ধেকের বেশী অংশকে অরক্ষিত রাখবে। এটা সেই সব রায়তদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে যারা ছোট জমিদারের নির্মম একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হবে এবং অন্যদের এদেরই মর্জির ওপর নির্ভরশীল ভূমিদাসে পরিণত করবে।''[২৭] বাস্তবিকপক্ষে জোতদাররা ''ছোট জমিদারের নির্মম একটা গোষ্ঠীরূপে'' বিকাশ লাভ করল এবং এরা অরক্ষিত প্রজাদের খুশীমত উচ্ছেদ করত। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তদের কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল বটে। খাজনার অদল বদলের জন্য তাদের হাজিরা দিতে বাধ্য করার জন্য জমিদারদের ক্ষমতা তুলে নেওয়া হল; খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে জমিদারদের কাছ থেকে পাট্টা পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হল, যতদিন তারা তাদের খাজনা দিয়ে যাবে, তাদের ততদিন উচ্ছেদ করা হবে না। জমিদারদের তুষ্টি বিধানের জন্য শাসক শ্রেণী তিনটি শর্তে তাদের খাজনা বৃদ্ধির অনুমতি দিল। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তদের খাজনা বাড়ানো যাবে যদি ''খাজনার হার প্রচলিত হারের থেকে কম হয় '' যদি ফসলের মূল্য অথবা জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে অথবা যদি ''রায়তের জোতে নতুন জমি যোগ করা হয়ে থাকে।''[২৮]

এটা মনে হয় যে ১৮৫৯ এর প্রজাস্বত্ব আইন প্রধানত রচিত হয়েছিল উঠতি জোতদার ও ধনী কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। এই শ্রেণীর মানুষ কৃষিগত উন্নতির পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করবে—এই আশা করা হয়েছিল। অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, জমিদাররা এই আইন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং খাজনা বৃদ্ধি ও উচ্ছেদের ব্যাপারে লেগে রইল। সুপরিচিত পদ্ধতিগুলি ছিল এই আবওয়াবকে আদত খাজনার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া এবং মিথ্যা জরিপের সাহায্যে রায়তের বাড়তি জমি দেখিয়ে খাজনা বৃদ্ধি করা; রায়তরা জমিদারদের শর্তের কাছে আত্মসমর্পণ না

করলে তাদের হয়রাণির জন্য মিথ্যা মামলা রুজু করা হত। সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণই প্রতিপন্ন করে যে ১৮৫৯ এর পর থেকে দ্রুত খাজনা বৃদ্ধি করা হচ্ছিল। হুগলী ময়মনসিংহ এবং ঢাকার খাজনার চড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে হাণ্টার উল্লেখ করেছেন।[২৯] ময়মনসিংহে নীলামে সবচেয়ে বেশী দাম দিতে ইচ্ছুক ক্রেতাকে ইজারা দেওয়া হত এবং ইজারাদার "জমিদারের কাছ থেকে প্রাপ্য অঙ্কের প্রতি টাকায় দু আনা হারে ইজারাদারীর লেভী ধার্য করত।"[৩০] কলকাতার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর কৃষকদের চড়া দামে জমি লীজ দিয়েছিল এবং এই ব্যক্তিরা "সমস্ত সীমার বাইরে জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থায় খাজনা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করত।"[৩১] ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাম্পবেল লেখেন যে পাবনার জমিদাররা "খাজনা বৃদ্ধির কোন নোটিশ জারী করত না" এবং বেআইনী ভাবে ও অসদুপায়ে বর্তমান বছরেই একই সঙ্গে আরও খাজনাবৃদ্ধি ও অনিয়মিত সে সবে খাজনার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত।[৩২] বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল দখলীস্বত্বের রায়তদের একটি শ্রেণীর বৃদ্ধিকে ঠেকিয়ে রাখার একটা ঝোঁক জমিদারদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল যাতে সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারে। রংপুরে রায়তদের স্বল্প মেয়াদী লীজ দেওয়া ছিল সাধারণ পদ্ধতি। বহু জেলায় খাজনার রসিদ দেওয়া হত না; দখলীস্বত্বের প্রমাণ নষ্ট করার জন্য প্রজাদের কাছে থেকে কবুলিয়ত নিয়ে নেওয়া হত। ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনায় জমিদাররা কৃষকদের দিয়ে ১৬৭২ টি কবুলিয়ত সই করিয়ে নিয়েছিল যা কার্যকরী হলে দখলীস্বত্বের রায়তদের স্বত্বহীন প্রজার মানে নামিয়ে দিতে পারত।[৩৩]

স্থানীয়ভাবে খাজনা সংক্রান্ত যে বিক্ষোভগুলি ১৮৬০ থেকে চলে আসছিল তা ১৮৭৩ এ একটা অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করল। ১৮৭৩ এ পাবনা জেলার ইসারশাহীতে একটি কৃষি সংঘ গঠিত হয়েছিল। জুন মাসের মধ্যে সদর মহকুমায় লড়াই ছড়িয়ে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জেলা বিদ্রোহের ঘূর্ণিবাত্যায় বিক্ষুব্ধ ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী রমেশ দত্ত খাজনা বৃদ্ধিজনিত বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধান করেছেন। নোলান লিখেছেন "বিরোধের মূল কারণ দেখা যায় ইসাফশাহী পরগণায় ঘন ঘন খাজনা বৃদ্ধি এবং বে-আইনী খাজনা আদায়ের মধ্যে।"[৩৪] পাবনার জেলাশাসক টেলার একই কথা বলেছেন: "এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা যে নাটোরের রাজার সময়ে খাজনার হার ছিল খুবই কম···জমিদাররা আবওয়াব সংগ্রহ করেছে এবং এই ব্যবস্থা এত বেশী বছর ধরে চলেছে যে

এখন এটা বিশেষ স্পষ্ট নয় যে সংগ্রহের কোন অংশ খাজনা এবং কোন অংশ বে-আইনী কর…বন্দোপাধ্যায়রা তাদের অনেক রায়তকে কবুলিয়ত দিতে রাজী করিয়েছিল, পরবর্তীকালে যার শর্তাবলী আবিস্কৃত হওয়ার পর দেখা গেছে, সেগুলি রায়তদের পক্ষে সবচেয়ে প্রতিকূল ; কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই যে এই আবিস্কারের জন্য অন্য জমিদাররাও বন্দ্যোপাধ্যায়দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। রায়তরা বিপদ দেখে বা অন্যের দ্বারা দৃষ্ট হয়ে জমিদারদের দাবীকে ঠেকাবার জন্য একটি সংঘ তৈরী করে।[৩৫]

কৃষি সংঘ মামলার খরচ বহন করার জন্য চাঁদা তুলত ; ঢোল বাজিয়ে বা মোষের শিঙা ফুঁকে কৃষকদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হওয়ার আহবান জানানো হত।[৩৬] মুসলমান প্রধান পাবনা জেলায় বৃহৎ সংখ্যক মুসলমান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আদালতের দ্বারা দণ্ড-প্রাপ্ত রায়তদের দুই তৃতীয়াংশ এই সম্প্রদায় থেকে এসেছিল।[৩৭] মনে হয়, আন্দোলন খাজনা বন্ধের রূপ গ্রহণ করেছিল। রায়তরা জমিদারকে সরাসরি খাজনা দিতে অস্বীকার করেছিল, যে জমিদার, মোলোনীর ভাষায়, "প্রজাদের ইচ্ছানুযায়ী শর্তে দেওয়া খাজনাকে স্বীকার করবে না।" এটা খুব তাৎপর্যের বিষয় যে রায়তরা ধ্বনি তুলেছিল যে "তারা মহারাণীর এবং শুধু তাঁরই প্রজা হবে।" এটা বোঝা যায় যে জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠেছিল। তথাপি জমিদখলের একটি দৃষ্টান্তও তখন দেখা যায়নি।

নীলবিদ্রোহের ক্ষেত্রে যেমন, তেমন এই বিদ্রোহে তালুকদার, জোতদার, গ্রামীণ প্রধান ধনী কৃষকদের মধ্যে থেকেই বিদ্রোহের নেতাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। একজন জনপ্রিয় নেতা যাকে কৃষকরা ভালবেসে বলত "বিদ্রোহী রাজা" সেই ঈশানচন্দ্র রায় একজন তালুকদার ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তাদের সহযোগী এবং গ্রামীণ মণ্ডল ও বন্দ্যোপাধ্যায়দের কর্মচারী শম্ভুনাথ পাল সংঘ গঠনের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন, খুদি মোল্লা নামক একজন মুসলমান জোতদার জমিদারদের সঙ্গে কলহ করে সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং সাল্লাপের জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করে।[৩৮] যতক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন খাজনা বৃদ্ধি ও বে আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ধনী কৃষকদের হারাবার কিছু ছিলনা। তারা পাটশিল্পের দিকে ঝুঁকেছিল এবং "জমিদারদের সক্রিয় প্রতিরোধ করার মতো সঙ্গতি সম্পন্ন" ছিল বলে মনে হয়। এটি খুব তাৎপর্যের বিষয় যে রাজশাহী ডিভিসনে খাজনা সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা

১৮৮০ খ্রী-টাব্দে ১,৩৪৩ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২,০৪৭ এ দাঁড়িয়েছিল।[৩৯] প্রকৃতপক্ষে মামলাতে ধনী কৃষকের সংখ্যাই বেশী ছিল। ১৮৭৪ থেকে পাবনায় জমিদারদের দ্বারা অনুমোদিত স্থায়ী লীজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৪০] গরীব প্রজার বিরুদ্ধে জমিদারদের বাঞ্ছিত মিত্র ধনী কৃষকরা পত্তনী ব্যবস্থার দ্বারা লাভবান হয়েছিল। কৃষি সংঘের নেতা ও সংগঠক হিসেবে ধনী কৃষকরা জমিদারদের সামন্ত তান্ত্রিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে এবং গ্রামকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লড়াই না করে জমিদাররা সেই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে আদৌ আগ্রহী ছিলনা।

যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছিল ততক্ষণ ধনী কৃষকদের মতই শহরের মধ্যবিত্তদের হারাবার কিছু ছিল না। এই শ্রেণী জমিতে মূলধন-নিয়োগ করেছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাবে ভদ্রলোক জোতদাররা ছিল স্বীকৃতিযোগ্য শ্রেণী। সঙ্গতিসম্পন্ন ও উচ্চাশা প্রণোদিত ভদ্রলোক শ্রেণী সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে চেয়েছিল এবং শহরের ও গ্রামের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করত। বার লাইব্রেরী স্থানীয় রাজনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজত্বের সংস্পর্শে এসে তারা আইন শৃংখলা সম্পর্কে সপ্রশংস ছিল। কৃষক বিদ্রোহ দেশকে প্লাবিত করলে তারা মর্মাহত ও ভীত হয়ে পড়ল। তাদের ভয় দূর করার জন্য রমেশ দত্ত পাবনার বিদ্রোহী কৃষকদের জন্য একটি সমর্থনসূচক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং রায়তদের দাবীর ন্যায্যতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। দত্তর রচনাতে বলা হয়েছে ঃ

''এটা খুব দুঃখের বিষয়, যদিও সম্ভবত আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বাঙালী জনসমাজের সংবাদপত্রগুলির অধিকাংশ প্রশ্নটি সম্পর্কে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে এবং পাবনার রায়তদের কার্যকলাপ সম্পর্কে পুরোদস্তুর নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল·· কলকাতায় এসে ভীড় করা পলাতক জমিদাররা অথবা নির্যাতিত পাবনার জমিদার যারা পাবনা থেকে সংবাদ প্রেরণ করছিল তারা সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়নি··· রায়তরা নানা রকম বিশৃংখলা ও কিছু হিংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অপরাধী ছিল··· তবুও যারা এই ধরণের কাজকে চূড়ান্তভাবে নিন্দা করে তাদের মনে রাখা উচিত যে পাবনার মত জাগরণ হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছাড়া, প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়া খুব কম ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হতে পারে, যেহেতু নিষ্ঠুর নিপীড়নই হল এর কারণ···ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদ তাকে

সামান্যই স্পর্শ করেছে সভ্য নাগরিক জীবনের বিলাসের উপকরণের জন্য তার আকাংখা নেই…কিন্তু এই সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য তার একটিই, মাত্র একটিই দাবী আছে, তার জমি এবং তার সারা বছরের ফসল…যখন জমিদার ঐ জমিতে উৎপন্ন ফসলে তার ভাগকে বাড়াতে চায়, তখন রায়ত আর সহ্য করেনা—বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো।"[৪১]

পাবনার বিদ্রোহ ধনী কৃষক ও জোতদারদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল : খাজনার প্রশ্নটি পুরোভাগে এল। ১৮৭০ থেকে ১৮৮৫ খৃীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে খাজনা সংক্রান্ত বিক্ষোভ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, বগুড়া এবং রাজশাহীতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং খাজনা সংঘ গঠিত হয়েছিল।[৪২] ১৮৭৩ খৃীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট করেন : "লক্ষণ দেখা যাচ্ছে‥ তারা (রায়তরা) সমষ্টিগতভাবে যে অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা অর্জন করা যায় তা বুঝতে পারছে। আমার একথা বলতে কোন বাধা নেই যে এই আন্দোলনের ভবিষ্যত হল বাঙলার সাম্প্রতিক বৃহৎ সামাজিক প্রশ্নটি।[৪৩] নিশ্চিত-ভাবেই ধনীকৃষকরা ও ভদ্রলোকেরাই রায়তদের সংঘের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ফিন্নুকেন মেদিনীপুরের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন : "কয়েকজন ধনী কৃষক আছে যারা এই জোটের পান্ডা… এই সব রায়তদের ছেলেরা ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে কিছুটা ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেছে…উকিল এবং অন্যান্যরাও…পরিকল্পনাটিকে উৎসাহিত করেছিল।"[৪৪] বাগল আমাদের জানিয়েছেন যে ১৮৮০-৮৫ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে "রায়ত সভাগুলি" বাঙলার জেলাগুলিতে গজিয়ে উঠেছিল এবং ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন রায়তদের সভাগুলি সংগঠিত করেছিল। ১৮৮১ খৃীষ্টাব্দে অ্যাসো-সিয়েশন কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি সভা করে যেখানে সুদূর গ্রাম থেকেও রায়তরা জড়ো হয়েছিল।[৪৫] বাঙলায় রাজনীতির ক্ষেত্রে যাদের ওপর প্রায়ই তারা নির্ভর করত সেই রায়তদের সমবেত করাকে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল।

এটা খুব আকস্মিক ব্যাপার নয় যে খাজনার প্রশ্নটি সরকারের মনো-যোগ আকর্ষণ করেছিল। ১৮৭৯ খৃীষ্টাব্দে খাজনা আইন কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল; এই কমিশন খাজনা আইনের একটি খসড়া দাখিল করে। রিপণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে তিনি "যে সমস্ত উদার প্রশস্ত নীতিকে সারাজীবন ধরে পোষণ করেছেন" তাদের কার্যকরী করার চেষ্টা করবেন। তিনি ভূস্বামীদের কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতা পাওয়ার

আশংকা করেছিলেন। হ্যারিংটন একমাত্র "যাযাবর কৃষক ও দখলী স্বত্বের রায়তদের অধস্তন প্রজা ছাড়া সমস্ত "রায়তী জমিকে" দখলী স্বত্ব দেওয়ার মৌলিক পরিকল্পনা পছন্দ করেন নি। যা হোক, এ বিষয়ে তিনি একমত হয়েছিলেন যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন রায়তদের স্বার্থের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ জমিদাররা তাদের একটি লিখিত চুক্তিতে (কবুলিয়ত) আবদ্ধ হতে প্ররোচিত করে অথবা শুধুমাত্র একটানা দখলের প্রমাণাদি নষ্ট করে ১২ বছরের মধ্যেই রায়তদের এক জমি থেকে অন্য জমিতে সরিয়ে দিয়ে সাফল্যের সঙ্গেই আইন এড়িয়ে যেত। সুতরাং একজন রায়ত কোন গ্রামে ১২ বছরের জন্য যে সব জমি দখল করে থাকবে, সে সব জমির দখল স্বত্বের অধিকারী সে হবে—এই প্রস্তাবে তিনি রাজী হয়েছিলেন।[৪৬] অনিবার্যভাবেই ভূস্বামীরা এই বিলের খাজনা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ধারাগুলির বিরোধিতা করেছিল; তারা বিরোধিতা করেছিল জমি বিক্রীর ধারাকে যে ধারাটির দ্বারা প্রজারা তার দখল স্বত্বের অধিকারকে হস্তান্তরিত করতে পারে। সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি যাওয়ার পর স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা সরকারকে জমিদারদের প্রতি তাদের মনোভাব পরিত্যাগ করার তাগিদ জানিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ঃ

"অবিলম্বে সরকারের জমিদারদের প্রতি তার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা উচিত ··প্রথমে যে কাজটি করতে হবে তা হল খাজনা আদায়ের জন্য সততার সঙ্গে জমিদারকে আইনগত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া···যতক্ষণ না খাজনা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, ততক্ষণ জমি বন্দোবস্ত দেওয়া বন্ধ করা দুঃসাধ্য।"[৪৭]

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বিধিগুলি আকর্ষণীয় বা মৌলিক কোনোটাই ছিল না। একজন কৃষক গ্রামে বারো বছর ধরে কোন জমি দখল করে রাখলে একজন স্থিতিবান প্রজা হবে—এই ব্যবস্থা বা বিধি থেকে রায়ত লাভবান হয়েছিল। জমি বিক্রীর ধারাটি অদৃশ্য হল, ফলে রায়ত তার দখল স্বত্বের অধিকারকে আর হস্তান্তরিত করতে পারত না; রায়তদের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার অধিকারের একটি রেকর্ড তৈরী করত। নিশ্চিত ভাবেই খাজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা জমিদারদের পক্ষেই ছিল। গ্রামের চলতি খাজনার হারের চেয়ে কম হলে এরা প্রজার খাজনা বাড়াতে পারতেন; জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হলেই খাজনা বাড়ানো চলত। স্থানীয় সরকার দামবৃদ্ধির তালিকা প্রকাশ করত যা জমিদাররা মূল্য-

বৃদ্ধির প্রমাণ হিসেবে দাখিল করত।[৪৮] রেণ্ট বিল বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন.কোনোটাতেই বর্গাদারদের প্রজা বলে গণ্য করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তারা দখলস্বত্ব বিহীন প্রজা হিসেবে রইল। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে জমিতে বন্দোবস্ত দেওয়া বৃদ্ধি পেল এবং জমি অকৃষিজীবীদের হাতে চলে গেল যারা বন্দোবস্ত দেওয়া প্রজাদের কাছ থেকে মোট উৎপাদনের পঞ্চাশ শতাংশ আদায় করত। এইভাবেই প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থায়ী হয়েছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে বর্গাদারদের প্রজা হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা হয়নি ; আমরা দেখব, যে ভদ্রলোক জোতদাররা স্বরাজ্য দলে যোগ দেওয়ার প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেছিল ; তাদের চাপের কাছে সরকার শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেছিল। যে কেউ বুঝতে পারে কেন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়সনের উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করেছিল।[৪৯]

ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশে খাজনাদাতা প্রজাদের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং প্রজাস্বত্ব আইন গ্রহণ করা হল। অযোধ্যা খাজনা আইনের (১৮৬৮) দ্বারা যে সমস্ত প্রজারা নিজস্ব বা তাদের দ্বারা কর্ষিত জমিতে সমস্ত রকম মালিকানার অধিকার হারিয়েছে তাদের হস্তান্তরযোগ্য নয় কিন্তু উত্তরাধিকার যোগ্য পরিবর্তিত দখলস্বত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছিল ; যে কৃষকরা জমিতে ১৮৫৬র ১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৩০ বছরের জন্য দখল নিয়েছিল তাদেরই ঐ অধিকার দেওয়া হয়। যে প্রজা প্রকৃতপক্ষে ১২ বছর ধরে জমি দখল করে আছে বা চাষ করছে, খাজনা আইন (১৮৭৩) তাকেই দখল স্বত্বের অধিকার দান করেছিল। এই ধারা অনুযায়ী কোন প্রজা একটা নির্দিষ্ট দামে দখল স্বত্বের প্রজার কাছে থেকে পাওয়া জমিতে কিংবা শির জমিতে দখল স্বত্বের অধিকার লাভ করতে পারতো না।[৫০] এইভাবে প্রজাদের এমন একটা গোষ্ঠী ছিল যাদের দখল স্বত্বের কোন অধিকার ছিল না। এবার দেখা যাবে, যতই দিন যেতে লাগল, উত্তর প্রদেশে ততই খাজনাদাতা প্রজাদের আন্দোলন একটা গতিবেগ লাভ করতে শুরু করল।

দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গা

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে একটি নতুন ধরণের কৃষিগত বিক্ষোভ দেখা গেল, যে বিক্ষোভ পরিচালিত হয়েছিল প্রধানত গুজরাটি ও মারোয়াড়ী মহাজনদের বিরুদ্ধে। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, কিভাবে লোভাতুর সাহুকাররা চড়া সুদের হার ধার্য করত এবং

কৃষিগত সমাজের অঙ্গ কুনবিদের জমি ও ফসল গ্রাস করত।[৫১] মারোয়াড়ী মহাজনরা ভূসম্পত্তি দখল করেছিল। তাদের আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে: "চড়া খাজনা আদায় এবং অনেক সময় খাজনার অতিরিক্ত দেনাদার প্রজার শ্রম ব্যবহার করে সে জমি থেকে গড়ে বেশ ভাল মুনাফা করে; সেচে সে খুব কমই সেচ বিনিয়োগ করে, কারণ এই জাতীয় বিনিয়োগ কদাচিৎই আকর্ষণীয়। এই পরিস্থিতিতে সে কুনবিদেরই ওপর নির্ভর করে, কেননা কুনবি একজন বুদ্ধিমান চাষী।"[৫২]

বিভিন্ন কারণে গ্রামে কৃষক বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কুনবিরা জমি চ্যুত হচ্ছিল, তার জমির অধিকাংশ বন্ধক দেওয়া ছিল "যার দখল স্বত্ব সাহুকারদের হস্তান্তরিত করা হয়নি।" প্রায়শই তাকে জমিতে পুনর্বাসিত করা হত এই শর্তে যে সে মোট ফসলের অর্ধাংশ খাজনা হিসেবে দেবে; কুনবিদের দুঃখমোচনের সামান্যই আশা ছিল, যেহেতু "সাব-ডিভিসনাল কোর্টের সাবজজ এবং জজরা মারোয়াড়ীদের হাতের যন্ত্র মাত্র।"[৫৩] ১৮৬৬-৬৭ তে খরা হয় এবং পরের বছর আংশিক ফসল হয়। ১৮৭০-৭১ এর পরে দাম দ্রুত কমে গেলে রায়তদের রাজস্বদানের ক্ষমতা কমে গেল এবং ব্যক্তিগত ঋণকে বন্ধকী ঋণে পরিবর্তিত করার একটা ঝোঁক মহাজনদের মধ্যে দেখা গেল। ১৮৭১ এর সরকারী কাজ হ্রাস পেল, ফলে মজুরী কমে গেল।[৫৪] কিন্তু কৃষক বিক্ষোভের "কারণ সমূহের কারণ" মনে হয় মহাজন ও কুনবিদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান উত্তেজনা। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে উইনগেট দুজন মহাজন হত্যা করা সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। ১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ এর মধ্যে কায়রাতে ৯জন এবং আহমেদনগরে দুজন ও পুণাতে একজন মহাজন নিহত হয়েছিল।[৫৫] যা লক্ষ্য করা দরকার তা হল প্রায়ই মহাজন ছিল এমন একজন ভূস্বামী যে অন্যায়ভাবে নগদে ও জিনিষে কুনবিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত।

দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গা, যা স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয় তা ১৮৭৫ এর ১২ই মে পুণার বাজার শহর সুপাতে প্রথম জ্বলে উঠেছিল, মহাজনদের বাড়ী ও দোকান আক্রমণ ও লুঠ করা হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খেরগাঁওর একজন নেতৃস্থানীয় মারোয়াড়ী মহাজনের বাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল চারটি গ্রামে। সিরুর তালুকে মারোয়াড়ী মহাজনরা ছিল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। প্রায় একই সঙ্গে এই ধরণের বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল আহমেদনগরে যেখানে ২২টি গ্রামে আন্দোলন হয়েছিল। পুণা ও আহমেদনগরে বহু গ্রামে বিক্ষোভের ভয় দেখানো

হয়েছিল।"[৫৬] কয়েক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ পূর্ণোদ্যমে অব্যাহত থাকল। কমিশন রিপোর্ট করেছিল যে দাঙ্গাবাজদের প্রধান লক্ষ্য হল মহাজনদের দখলে থাকা ডিগ্রী, বণ্ড ইত্যাদি নষ্ট করে ফেলা।"[৫৭] বেশীর ভাগ মারোয়াড়ী মহাজনরা গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ২২শে জুলাই শেষ ঘটনাটি ঘটে যখন নিম্বালে একজন মহাজনের নাক কেটে দেওয়া হয়েছিল।[৫৮] সরকার গ্রামে পিটুনী পুলিশ মোতায়েন করেছিল এবং জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহের মধ্যে বিক্ষোভকে দমন করা হয়েছিল। পুণা ও আহ্মেদনগরে ৯৫১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এর মধ্যে ৫০১ জনকে দণ্ডিত করা হয়।[৫৯] দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গার সূচনায় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এগ্রিকালচারিষ্টস্ রিলিফ এ্যাক্ট পাশ হয়।

দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গার নেতৃত্বের বিষয়ে আমরা খুব কমই জানি। কমিশনের রিপোর্ট থেকে মনে হয়, কৃষকরা প্রায়ই গ্রামীণ সমাজের প্রধান প্যাটেলদের দ্বারা পরিচালিত হত; তাই কৃষকদের মধ্যে জঙ্গী মনোভাব তেমন দেখা যায় নি। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ "দায়িত্বশীল নেতৃত্বহীন উচ্ছৃংখল দাঙ্গাকারীদের জনতা যতখানি বিপজ্জনক হত, তার চেয়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য তাদের সাধারণ নেতার (প্যাটেল) নেতৃত্বে সক্রিয় গ্রামীণ জনতা কম বিপজ্জনক ছিল।"[৬০] কমিশন ৭৪ জন দাঙ্গাকারীর সাক্ষ্য রেকর্ড করেন, যার থেকে বোঝা যায় যে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বালুতেদের অথবা কারিগর, ধনী কৃষক যারা ভূমিরাজস্বে কুড়ি টাকা অথবা তার বেশী জমা দিত, এবং ভূমিহীন কৃষকরাও।[৬১] এটা সম্ভবপর যে, মহাজনদের হাতে যারা নির্যাতন ভোগ করত, সেই কারিগর, ধনী কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষকরা মহাজনের বিরুদ্ধে একটি মোর্চা তৈরী করেছিল। গ্রামীণ প্রধান হিসেবে তখনও প্যাটেলরা কৃষক জনগণের চিরাচরিত নেতা ছিল। তাদের নেতৃত্বের পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে তাদের "কোন গুরুতর অপরাধ" ছিলনা; বিদ্রোহী কৃষকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ডিক্রী, বণ্ড এবং হিসাবপত্র নষ্ট করে "শত্রুদের অস্ত্রহীন করা।" দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশন প্রতিরোধের অন্যান্য রূপ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ "সম্পত্তির সার্বিক লুণ্ঠন" "মহাজনদের ওপর মারমুখী আক্রমণ" "মহাজনদের ফসলের গাদা পুড়িয়ে দেওয়া" ইত্যাদি। ব্যাপক না হলেও এই ধরণের হিংসাত্মক কার্যকলাপ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষকদের আচার আচরণের পরিচয় দেয়। প্রশ্ন হল, শাসক শ্রেণী কর্তৃক গৃহীত সংস্কারমূলক কার্যাবলীর সঙ্গে কৃষিগত

বিক্ষোভকে যুক্ত করা যায় কিনা। একজন আধুনিক গবেষক ডাঃ কুমার যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে সরকার কর্তৃক গৃহীত সংস্কারের নীতি গ্রামীণ সমাজে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব খুব কমই দেখা যেত। হিতবাদী তত্ত্ব (ইউটিলিটারিয়ান মতবাদ) দ্বারা অনুপ্রাণিত সরকারের নীতির ফলে "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সম্পত্তিলাভের মনোভাব" এর উদ্ভব হয়েছিল এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক উত্তেজনা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাঃ কুমার লিখেছেন ঃ

"বোম্বাই সরকারের দ্বারা প্রবর্তিত সংস্কার নীতির মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে যে উত্তেজনার জন্ম হয়েছিল, ১৮৭৫ এ দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গার বৈশিষ্ট্যগুলিতে তা প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৮১৮ র আগে মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল—সেই সব গ্রামে বসবাসকারী সামাজিক গোষ্ঠী-গুলির মধ্যে কোন গুরুতর বিরোধের অভাব এবং এটা তাদের সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণতাকে সাহায্য করেছিল…হিতবাদী তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত সংস্কার নীতিগুলির প্রভাবে এই সবই বদলে গিয়েছিল…মহারাষ্ট্রের কুনবি এবং ভানি (Vani) দের মধ্যে উত্তেজনার বৃদ্ধি সার্বিক সামাজিক প্রক্রিয়ার একটা দিক মাত্র ছিল। সংস্কারনীতির ফলে সৃষ্ট ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং আত্মসাৎমূলক আবহাওয়া গ্রামের সমষ্টিগত কাঠামোকে ক্রমশঃ দুর্বল করে দিয়েছিল এবং পৃথক পৃথক সামাজিক গোষ্ঠীতে ভেঙ্গে দিয়েছিল। …মহারাষ্ট্রে হিতবাদীদের দ্বারা প্রণীত সংস্কারনীতির সীমাবদ্ধতা ১৮৭৫ এর দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গা উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল। এই নীতির মূল ভিত্তি ছিল ভূমিরাজস্বের রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত—এটা গ্রামীণ সমাজের সামূহিক সংস্থাগুলিকে ক্ষুন্ন করার জন্য এবং গ্রামের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও প্রতিযোগিতার একটা আবহাওয়া তৈরী করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল।"[৬২]

প্রায় একশ বছর আগে রমেশ দত্ত পাবনা কৃষক বিদ্রোহের উৎপত্তির মূল কারণ "একটা সভ্য প্রশাসন" থেকে উদ্ভূত পরিবর্তনের মধ্যে দেখে-ছিলেন। যখন মোগলদের অধীনে জমিদাররা "ক্ষুদে সামন্ততান্ত্রিক প্রধানদের" মতো শাসন করত তখন কৃষকরা প্রতিরোধের সমস্ত আশাই হারিয়ে ফেলেছিল ; ইংরেজ আমলেই তারা জড়তার থেকে জেগে উঠেছিল। রমেশ দত্ত লিখছেন ঃ

"চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যে যন্ত্রণাময় দাসত্বে কৃষক বহু শতাব্দী ধরে

শৃঙ্খলিত থেকেছে এবং যা তার কর্মস্পৃহাকে অসম্ভব করে তুলেছিল ন্যায় বিচারের নির্ভুল নীতি এবং যে কোন ক্ষেত্রে ও যে কোন সময় নিপীড়ন দেখলেই তাকে দৃঢ়ভাবে খর্ব করার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার কৃষককে ঐ দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে…কৃষক কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙলার জমিদারদের অধীনে সম্পূর্ণ দাসত্বের অবস্থায় ছিল। যারা মুসলমান রাজত্বের শেষ দিনগুলির শাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত, তারা একযোগে স্বীকার করবেন যে সেকালে জমিদাররাই ছিল সর্বময় শাসক…এমন একটা সময় যখন প্রতিরোধ নিশ্চিতভাবেই নিষ্ফল হতে বাধ্য ছিল, তখন সক্রিয় পন্থা গ্রহণ ছিল অসম্ভব—আমরা স্বীকার করি, আমরা এই সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে খুসী যে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ শেষ পর্যন্ত জড়তার থেকে জেগে উঠছে…তারা (জমিদাররা) এটা জমিদার ও রায়তদের মধ্যেকার শত্রুতা বলে দুঃখ প্রকাশ করেন…তাদের প্রশ্ন, কে শিখিয়েছিল রায়তদের দেওয়ানী আদালতে ছুটে যেতে? এই হল পীনাল কোর্ড ও ১৮৫৯ এর দশ আইনের সাহায্যে ব্রিটিশ সরকারের কাজ ব্রিটিশ সরকারের দোষ ও অপরাধ রায়তকে সুযোগ করে দিয়েছিল তা সংবাদপত্রে প্রকাশের—এটা আমাদের জমিদারদের, আমাদের সংবাদপত্রকে, আমাদের তথাকথিত জনমতকে ক্ষুন্ন করেছে।"[৬৩]

এই বক্তব্যে কিছুটা সত্য আছে যে ব্রিটিশের সংস্কার নীতি গ্রামের সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করেছিল। যা বিশেষভাবে বলতে হয় তা হল প্রজাস্বত্ব আইনের কথা। এই আইন সুনিশ্চিতভাবেই জমিদারদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল এই যে প্রজাস্বত্ব আইন "শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে" পরিচালিত করে। মারাঠা শাসনে গ্রামে সামাজিক উত্তেজনা অনুপস্থিত ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। সাম্প্রতিক গবেষণা এটা নির্দেশ করে বলে মনে হয় যে ব্রিটিশরা আসার আগেই গ্রামীণ যৌথ গোষ্ঠীগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল এবং হচ্ছিল, মোগল আমলে কৃষকদের মধ্যে স্তর বিন্যাসের কাজ অগ্রসর হচ্ছিল।[৬৪] যা আমরা লক্ষ্য করি তা হল যে উনিশ শতকে "অকৃষকীকরণের" প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল। একদিকে কৃষকরা জমিচ্যুত ও দুর্বহ খাজনার ভারে পীড়িত হচ্ছিল; অন্যদিকে ধনী কৃষকরা বাঙলার পাট উৎপাদনের এলাকায়, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের তুলো উৎপাদনের এলাকায় এবং উত্তর প্রদেশ, বিহারের আখ উৎপাদনের এলাকায় কৃষকরা স্বতন্ত্র একটি গোষ্ঠী-রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রাক ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পদ্ধতিকে ক্ষুন্ন

না করে মুখ্যত গ্রামের নতুন উচ্চবর্গের স্বার্থরক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে ব্রিটিশ সংস্কারনীতি প্রণীত হয়েছিল। জমিদাররা দৃঢ়ভাবে তাদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকায় সামাজিক উত্তেজনা প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, খাজনা ও দখলীস্বত্বের প্রশ্নগুলি কৃষক আলোড়নে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল, খাজনাদাতা প্রজারা খাজনা গ্রহীতা জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। আমরা পরে দেখব যে এই সব প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলন বিশ শতকেও অব্যাহত থেকেছে, জমিদারদের ক্ষমতা ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্য সামগ্রিকভাবে কৃষকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। খাজনাদাতা কৃষক ও কৃষিমজুরদের নির্দিষ্ট দাবী সামনে এসে পড়ায় ধনী কৃষকেরা একটা উভয়সঙ্কটে পড়ে গিয়েছিল। খুব কম লেখকই এ বিষয়ে পুরো সচেতন ছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর কৃষকদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ছিল—ফলে কালক্রমে কৃষকেরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই বাস্তবটিকে বোঝার জন্য আমরা এখন বিশ শতকের কৃষক আন্দোলনগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরাব।

নির্দেশিকা

১। ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৬০, দত্ততে উল্লিখিত, দি সানতাল ইনসারেকসন অফ ১৮৫৫-৫৭,১৯৪০।
২। ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৫৬, দত্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৮।
৩। দত্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৬।
৪। ঐ।
৫। ঐ, পৃ—১৬।
৬। ও' ম্যালি, বেঙ্গল, বিহার অ্যান্ড ওড়িষ্যা, ১৯১৭, পৃ—১৯৩-৯৪।
৭। দত্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৫২।
৮। ঐ, পৃ—৬০।
৯। ঘোষ, সামাজিক পত্রে বাঙলার সমাজচিত্র (বাঙলায়) ১৯৬৬।
১০। ঐ।
১১। ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৫৫, দত্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৬৭।

১২। ডবলিউ, জে হারস্চেল এর সাক্ষ্য, ইণ্ডিগো কমিশন (১৮৬০) এর রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। হারস্চেল লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রধান জমিদাররা নীলকরদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

১৩। ক্লিং, দি ব্লু মিউটিনি: ইণ্ডিগো ডিসটারবেন্সেস ইন বেঙ্গল (১৮৫৯-৬২), ১৯৬৬।

১৪। পালিত, পূর্বোল্লিখিত, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১৫। ক্লিং, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—২২, ৮৭, ৮৯, ৯০; এ ছাড়াও গুহ, 'নীলদর্পণ: দি ইমেজ অফ এ পেজেণ্ট রিভোল্ট ইন এ লিবারাল মিরর' জার্নাল অফ পেজেণ্ট স্টাডিস অক্টোবর, ১৯৭৪।

১৬। ঘোষ, ইণ্ডিয়ান স্কেচেস, ১৮৯৮।

১৭। ক্লিং, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৯৪-৯৬।

১৮। ঐ, পৃ—৯৭।

১৯। দি, বেঙ্গল পেজেণ্ট লাইফ, গুহ, পূর্বোল্লিখিত। গুহ আমাদের বলেছেন যে নীল বিদ্রোহ প্রধানত মধ্য কৃষক থেকে গ্রামীণ সর্বহারা পর্যন্ত সমস্ত কৃষকের মিলিত আন্দোলন। কিন্তু খুব কম লেখকই এই বিদ্রোহে কৃষকের ভূমিকার কথা বলেন।

২০। গুহ তাঁর রচনায় নীল বিদ্রোহে উদারপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাড়া সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

২১। হিষ্ট্রি অফ ইন্ডিগো ডিসটারবেন্সেস, ১৯০৩। ১৮৬২তে হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখেছিল যে "নীলকররা খাজনার জন্য মিথ্যে চেঁচামেচি করেছিল এবং দ্বিগুণ শক্তির সঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল।"

২২। মিত্র, পূর্বোল্লিখিত।

২৩। গুহ, পূর্বোল্লিখিত, তিনি লিখেছেন যে, বিদ্রোহ অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন "শ্রেণীর সংগ্রাম" পুরোভাগে আসে।

২৪। ক্লিং, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৮৮, ৯০, ৯২।

২৫। ঐ, পৃ—৭৫। সম্ভবত এটা বলা উচিত যে তখনও জমিদারদেরই ক্ষমতা অক্ষত ছিল, যাদের কয়েকজন ছিল মহাজন।

২৬। বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট অফ ২৯শে এপ্রিল, ১৮৫৯, ফিলিপস্। পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৬২৪-২৬।

২৭। টেম্পল কালেকসন, পালিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—১৮৫। পালিত লিখেছেন যে আইনের সুবিধা পেয়েছিল "গ্রামের ধনতান্ত্রিক শক্তিসমূহ," যারা রপ্তানীর জন্য অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করত।

২৮। ফিলিপস, পূর্বোল্লিখিত।

২৯। হাণ্টার, স্টাটিসটিকাল একাউণ্ট অফ বেঙ্গল; হুগলী, ময়মনসিংহ ঢাকার বিষয় সম্বলিত খণ্ড দ্রষ্টব্য। আবওয়াব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এই আবওয়াব প্রায়ই খাজনার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হত।

৩০। চৌধুরী, পজেণ্ট মুভমেণ্টস ইন বেঙ্গল (১৮৫০—১৯০০)।

৩১। ঐ।

৩২। সেনগুপ্তর রচনায় উল্লিখিত, পাবনা ডিসটারবেন্সেস অ্যাণ্ড দি পলিটিকস অফ রেণ্ট (১৮৭৩—৮৫) পৃ—৩০।

৩৩। সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৩১।

৩৪। দত্তর রচনায় উল্লিখিত, 'অ্যান অ্যাপোলোজি ফর দি পাবনা রায়োটারস, বেঙ্গল ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর ১৮৭৩। দত্ত প্রবন্ধটি "আরসিডি" ছদ্মনামে লিখেছিলেন।

৩৫। ঐ। বন্দ্যোপাধ্যায়রা ঢাকা থেকে এসেছিলেন এবং পাবনায় ভূসম্পত্তি দখল করেছিলেন।

৩৬। সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, এ ছাড়াও সেন পেজেণ্ট 'স্ট্রাগল ইন পাবনা,' নিউ এজ ২য় খণ্ড, ১৯৫৪ দ্রষ্টব্য।

৩৭। সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৫০-৫১। তিনি লিখেছেন যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বর্গাদার এবং কৃষিমজুররা ছিল যারা খাজনা বৃদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল না।

৩৮। সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৪১। ডঃ সেনগুপ্ত প্রজাদের "আইন ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর" উপর গুরুত্ব দিয়েছেন; প্রজারা আদালতের আশ্রয় নিয়েছিল জমিদারদের শক্তি দুর্বল করবার জন্য।

৩৯। ঐ, পৃ—৯২।

৪০। ঐ, পৃ—৮৮। রেজিস্ট্রীকৃত দলিলের সংখ্যা ১৮৭৩-৭৪ এ ৬২৭ থেকে ১৮৭৬-৭৭ এ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৩৩ হয়েছিল।

৪১। দত্ত, পূর্বোল্লিখিত।

৪২। সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৪৩। চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত।

৪৪। ঐ।

৪৫। বাগল, হিষ্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়শন (১৮৭৬-১৯৫১)। বাঙলার জেলাগুলিতে গঠিত রায়তসভার একটি তালিকা বাগল দিয়েছেন।

৪৬। রেভিনিউ ডেসপ্যাচ, (১৮৮২) ৩ নং ফিলিপস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ—৬৫১-৫৩।

৪৭। স্টেটসম্যান, ১৭ই জানুয়ারী ১৮৮৫।

৪৮। আইনের ধারাগুলি সারাংশের জন্য দি ইংলিশম্যান, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ দ্রষ্টব্য।

৪৯। এই আইন বঙ্কিমচন্দ্রকে এত আকৃষ্ট করেছিল যে তিনি "বঙ্গদেশের কৃষক" এর দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে লিখেছিলেন যে এই রচনায় জমিদারদের অত্যাচারের বিবরণ উল্লেখ করার আর প্রয়োজন নেই। ১৮৮৫র মধ্যে রমেশ দত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একজন অনুরাগীতে পরিণত হয়েছিলেন।

৫০। হুইটকম্ব, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৯৫-৯৬।

৫১। পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫২। রিপোর্ট অফ ডেকান রায়টস কমিশন (১৮৭৫), ১ম খণ্ড, ১৮৭৬, পৃ—৮৫।

৫৩। ঐ, এ কোলভিনের স্মারকলিপি পৃ-৫৬ দ্রষ্টব্য।

৫৪। ঐ, পৃ—৫০-৫১।

৫৫। ঐ, জি, উইনগেটের পত্র পৃ-৭।

৫৬। ঐ, পৃ—২-৬।

৫৭। ঐ।

৫৮। ঐ, পৃ—৭

৫৯। ঐ।

৬০। ঐ, পৃ—৭।

৬১। ঐ, পরিশিষ্ট, বি দ্রষ্টব্য। যে সব কৃষক ২০ টাকা রাজস্ব দিত, তাদের প্রায় ২০ একর জমি ছিল, যেহেতু পাঁচ একর অর্থনীতিক হোত ফলে বিবেচিত, তাই ২০ একর জমির মালিককে ধনী কৃষক বলা যেত।

৬২। কুমার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ-১৮৭-৮৯।

৬৩। দত্ত, পূর্বোল্লিখিত।

৬৪। চন্দ্র, সাম, অ্যাসপেক্টস্ অফ ইণ্ডিয়ান ভিলেজ সোসাইটি ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রিভিউ, ১ম খণ্ড।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৃষক বিক্ষোভ—২

কৃষক সংগঠনের প্রাচীনতম রূপ হল "রায়তসভা" যা অত্যন্ত ঢিলে-ঢালা ভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং ১৮৮৫ এর পরে মরণোম্মুখ হয়ে পড়েছিল। এটাই লক্ষ্যণীয় বিষয় যে আকর্ষণের প্রধান বিষয় ছিল রায়ত; রায়তের মধ্যে ছিল ধনীকৃষক এবং বাঙালী জোতদারের মতো অকৃষক মালিক। গান্ধীজী বিহারে চম্পারণ আন্দোলন এবং গুজরাটে কয়রা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনাকালে রায়তদের সমর্থন করেছিলেন। যে প্রজারা জমিদারদের খাজনা দিত, তাদের সংগঠিত করার আগ্রহ গান্ধীজীর বিশেষ ছিল না। তথাপি কৃষিগত আন্দোলন, বিশেষত, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও বাঙলার জমিদারী এলাকায় প্রজাদের আন্দোলন সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ বড়ো কৃষক সংগ্রাম সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাদের অসন্তোষকে প্রতিফলিত করেছিল। এই সংগ্রামের তরঙ্গশীর্ষে সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের দাবীর প্রতিভূস্বরূপ একটি সংগঠন হিসেবে কৃষক সভা গড়ে উঠল। আমরা এবার এই সংগ্রামের নেতৃত্ব, কৃষক সমাবেশে কৃষক সভার ভূমিকা এবং কৃষক ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অনির্দেশ্য সমস্যাগুলির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব। অন্য একটি বিষয় হল, কৃষিগত আন্দোলনের প্রতি জাতীয়তা-বাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণভাবে বলতে গেলে তারা ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের সমর্থন করেছিলেন এবং কৃষক সভা খাজনাদাতা প্রজা ও গরীব কৃষকদের পক্ষে অবলম্বন করেছিল।

রায়তদের সমাবেশ

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে গান্ধীজী চম্পারণ সংগ্রাম শুরু করলেন। এই জেলার বেশীর ভাগ বেতিয়া, রামনগর ও মধুবন এস্টেটের অধীন ছিল, ভূস্বামীরা বাগিচা মালিকদের জমি লীজ দিয়েছিল। তিন-কাঠিয়া ব্যবস্থায় বাগিচা মালিকরা খাজনাবৃদ্ধি করলে রায়তদের অসন্তোষ চরমে উঠল। বর্তমান শতকের সূচনায় নীল চাষ দ্রুত কমে গেলে নীল কররা সারাবেসী (খাজনাবৃদ্ধি) শুরু করল। যেহেতু রায়তদের জমির

একাংশে নীল চাষ না করার ব্যাপারটি অনুমোদন করা হবে, , তাই তাদের বর্দ্ধিত খাজনা দিতে হবে—রায়তদের এ রকম একটি চুক্তিতে সই করতে প্ররোচিত করা হল। যে সব নীলকর ঠিকা ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল তারা খাজনা ছাড়াও আবওয়াব সংগ্রহ করত। গান্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন, নীলকররা গ্রামে "রাজার মতো।"[১] রায়তদের প্রধান অসন্তোষ গুলিকে সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে তিনি বলেছেন: "এটা অবিশ্বাসযোগ্য যে রায়তরা বাধ্যতামূলকভাবে নীলচাষ করার থেকে মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে অস্বাভাবিক স্থায়ী খাজনা বৃদ্ধিতে রাজী হবে…তিনকাঠিয়া ব্যবস্থায় ভূস্বামীর ফসলের জন্য রায়ত তার সবচেয়ে ভাল জমি দিতে বাধ্য হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে তার বাড়ির সম্মুখস্থ জমিকে ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাকে তার সর্বোত্তম সময় ও মমতা প্রয়োগ করতে হয়েছে, যার ফলে তার নিজস্ব ফসল ফলাবার সময় সময় খুব কমই থেকেছে…"[২]

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অভিযান শুরু হল। গান্ধীজী রায়তদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এটি কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগের একটি চমকপ্রদ পদ্ধতি। মনে হয়, কৃষকদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। জুন মাসে সরকার গান্ধীজীকে অন্যতম সদস্য করে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করলেন, এই কমিটি অক্টোবরে রিপোর্ট পেশ করল। সরকার অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছিল এবং চম্পারণ কৃষি-সংক্রান্ত আইন (১৯১৭) পাস হয়েছিল। যে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই আইনের দ্বারা তাকে বে-আইনী করা হল। টারকাউলিয়ার ক্ষেত্রে সারা বেশী ২০ শতাংশ হ্রাস পেল এবং অন্যান্য কারখানার ক্ষেত্রেও ২৬ শতাংশ কমে গেল।[৩] আপাতভাবে সরকার জমিদার ও রায়তদের স্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে আগ্রহী ছিল। গান্ধীজী আপোষে রাজী ছিলেন কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে "কৃষক ও বাগিচা মালিকদের তখনও একসঙ্গে বাস করতে হবে।"[৪] কিন্তু রায়তরা বর্দ্ধিত খাজনা দিতে রাজী ছিল না এবং উল্লেখযোগ্য-ভাবে মামলা মোকদ্দমা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৮৫৯-৬০ এর নীলবিদ্রোহের মত চম্পারণ বিদ্রোহ কৃষক প্রতিরোধের গৌরবে চিহ্নিত নয়, জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকরা খাজনা বন্ধের আন্দোলন করেনি। আইন ব্যবসায়ী, মহাজন, ধনী কৃষকরা ছিল এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক। ব্রজকিশোর প্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ অনুগ্রহ

নারায়ণ সিংহের মত আইন ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যারা তাদের মক্কেল হিসেবে সম্পন্ন রায়তদের ওপর নির্ভর করতেন। সূচনা থেকেই চম্পারণ সত্যাগ্রহের সঙ্গে যুক্ত রাজকুমার শুক্লা একজন মহাজন ছিলেন, সমগ্র বিহারে মহাজন বনাম ব্যবসায়ী বলে পরিচিত বেতিয়া ও মোতিহারী জেলার সাহা এবং মারোয়াড়ীরাও এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন।[৫] মনে হয় গ্রামীণ অভিজাত সম্প্রদায় বাগিচা মালিকদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা ভাগ করতে চায়নি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেভেলি নামক একজন চতুর পর্যবেক্ষক লক্ষ্য করেন ঃ

"অনুগ্রহপুষ্ট ব্রাহ্মণ ও রাজপুতেরা, যারা সুবিধানজক হারে জমি ভোগ করে, যাদের গ্রামে ক্ষমতা ও প্রভাব আছে…ফ্যাক্টরির আমলারা তাদের জমি আত্মসাৎ করছে এটা দেখতে যারা ঘৃণা বোধ করে—এরাই হল সেই শ্রেণীগুলি যাদের কাছে নীল চাষ ছিল বিশেষভাবে ঘৃণ্য…"[৬] আধুনিক গবেষক মিশ্রও আমাদের বলেছেন, ফ্যাক্টরির যে সব কর্মচারীরা ভূসম্পত্তি ক্রয় করেছিল তারা, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং জমির মালিক সকলেই নীলকরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল—যে নীলকর নির্বিবাদে ও স্বাধীনভাবে প্রজাদের সম্পত্তি নিজেদের মালিকানায় হস্তান্তরিত করেছিল।[৭] তথাপি এটা সত্য যে নীলকররা খাজনাবৃদ্ধি ও আবওয়াবকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরেছিল এবং "রাজাদের মতো" আচরণ করছিল। চম্পারণ সত্যাগ্রহ নীলচাষের বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে প্রজাদের অসন্তোষকে প্রতিফলিত করেছিল—যা বিশ শতকের প্রথম বছরগুলিতে ভেঙ্গে পড়েছিল। গান্ধীজীর পক্ষে চম্পারণ সত্যাগ্রহ সুফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হলেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে গান্ধীজী গুজরাটের (খেদা) কয়রায় পাতিদার রায়তদের সত্যাগ্রহ শুরু করেন। রায়তওয়ারি এলাকা গুজরাটে রায়তরা সরকারকে রাজস্ব দিত। এই রায়তদের মধ্যে এক শ্রেণীর সম্পন্ন ভূস্বামী ছিল যাদের জমি চাষ করত ভাড়া করা প্রজারা। ১৯১৭ তে ভারী বর্ষার জন্য কয়রায় ফসলের হানি হয়েছিল এবং রায়তরা ভূমিরাজস্ব স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছিল। স্বাভাবিক উৎপাদনের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশী ফসল হয়েছে—এই যুক্তিতে সরকার কৃষকদের দাবী অগ্রাহ্য করে। চম্পারণের মতো এবারও গান্ধীজী গ্রামে পরিভ্রমণ করেন, কৃষকদের অবস্থা অনুসন্ধান করেন এবং ১৯১৮ এর ২২ শে মার্চ সত্যাগ্রহ অভিযান করেন। কৃষকরা জমির কর দিতে অসম্মত হয়।

সংঘর্ষ হয় রায়ত ও সরকারের মধ্যে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে ধনী কৃষকরা তাদের রাজস্ব মিটিয়ে দিতে রাজী ছিল এই শর্তে যে সরকার রাজস্বের দ্বিতীয় কিস্তি আদায় স্থগিত রাখবে। যে প্রতিজ্ঞাপত্রে কৃষকদের স্বাক্ষর দিতে হয়েছিল তা এই ঃ

"আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা গুরুত্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে সরকারের দ্বারা ধার্য রাজস্বের সম্পূর্ণ অথবা বছরের জন্য দেয় বাকী অংশ স্বেচ্ছায় আমরা সরকারকে দেবনা। সরকার ভাল মনে করেন এমন যে কোন আইন পদক্ষেপ সরকারকে গ্রহণ করতে আমরা দেব এবং আনন্দের সঙ্গে রাজস্ব বন্ধের ফলাফল ভোগ করব। যদি সরকার সমগ্র জেলায় রাজস্বের দ্বিতীয় কিস্তি সংগ্রহ স্থগিত রাখতে সম্মত হন তাহলে আমাদের মধ্যে সমর্থ সকলেই পাওনা রাজস্বের সব অথবা বাকী অংশ শোধ করবে। রাজস্ব মেটাতে সমর্থ ব্যক্তিদের রাজস্ব দান থেকে বিরত থাকার যুক্তি এই যে, যদি তারা রাজস্ব দেয় তাহলে অধিকতর গরীব রায়তরা ভয়ে বরেয়া রাজস্ব মেটাবার জন্য তাদের গবাদি পশু বিক্রী করে দিতে পারে অথবা ঋণ করতে পারে..."[৮]।

আন্দোলন মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত (২২ শে মার্চ থেকে ৬ই জুন, ১৯১৮) পূর্ণোদ্যমে চলেছিল। সমস্ত জেলায় বহু সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল; ২,৩৩৭ জন রায়ত ভূমি রাজস্ব না দেওয়ার প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে, আন্দোলনের আর্থিক ব্যয় মেটাবার জন্য প্রধানত বোম্বাইয়ের গুজরাটি বণিকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়েছিল। সরকার আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেছিল; কৃষকদের স্থাবর সম্পত্তিগুলিকে একত্রিত করা হয়েছিল এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম কৃষকদের ওপর জরিমানা ধার্য করা হল।[৯] জুন মাসে বীজ বপনের সময় উপস্থিত হলে রায়তদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা গেল। সরকার এ বিষয়ে রাজী হলেন যে ধনী পাতিদাররা সমস্ত রাজস্ব জমা দিলে গরীব রায়তদের জমির কর আদায় স্থগিত রাখবেন। সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হল। প্রকৃতপক্ষে সরকার রাজস্বের ৯৩ শতাংশ সংগ্রহ করেছিলেন।[১০] যে গরীব রায়তরা ফসল হানির দ্বারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, গান্ধীজী আপাতদৃষ্টিতে তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং ধনী পাতিদারদের নিরপেক্ষ করে রাখতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে দেখাবার মত খুব কম সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যে পাতিদার, ভূস্বামীর জমি চাষের নিযুক্ত নীচু জাতের প্রজা ও বর্গাদারদের এই আন্দোলনে নিয়ে আসা হয়েছিল।[১১] এটাই ছিল বিশেষ-

ভাবে কৃষক সমাবেশের গান্ধীবাদী পদ্ধতি ঃ তিনি ক্রমাগত শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা করেছেন। আইনজীবী, মহাজন এবং বণিকরা কয়রা সত্যাগ্রহে তাদের বিপুল সমর্থন জানিয়েছিল। মনে হয়, এই আন্দোলনের দ্বারা কংগ্রেস এবং গান্ধীজী বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। ১৯১৯ এ রাউলাট সত্যাগ্রহের সময় কয়রা জেলায় বিক্ষোভের ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হচ্ছিল ; সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং একটি ট্রেনকে লাইনচ্যুত করা হয়েছিল।[১২] বোম্বাই সরকারের বিবৃতি অনুসারে বিক্ষোভের সম্মুখভাগে ছিল পাতিদাররা।

"এটা যোগ করা উচিত যে শুধুমাত্র তুলনামূলকভাবে জেলার একটি ছোট গোষ্ঠীর প্রায় কেবলমাত্র পাতিদার ও বানিয়া গোষ্ঠীর কার্যকলাপই বিক্ষোভের কারণ। জনগণ, যেমন ধরলারা সচেতনভাবেই পুরো ব্যাপার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল।"[১৩]

প্রজা সংগ্রাম

উত্তর প্রদেশেই প্রজা সংগ্রাম ১৯২০র দশকে জ্বলে উঠেছিল এবং ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলছিল। কয়েক বছর ধরে অযোধ্যার কৃষকদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। উচ্ছেদ ও খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১৮৬৪র খাজনা আইন কৃষকদের স্বার্থ সামান্যই সংরক্ষণ করেছিল। ১৮৮৬র খাজনা আইন পাশ হওয়ার পর নতুন প্রজাদের কাছ থেকে নজরানা পাওয়ার জন্য ভূস্বামীরা প্রায়ই প্রজাদের উচ্ছেদ করত ; পুরোনো প্রজাদের উত্তরাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে দুরূহ করে তোলার জন্য উচ্ছেদ করা ছিল তালুকদারদের একটি উপায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রতাপগড়ে ১৯০৬-৭ এ ৯৩৬টি উচ্ছেদের সমন জারী করা হয়েছিল ; ১৯১৯-২০ তে এই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫৯৩ হয়েছিল।[১৪] ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপগড়ের ডেপুটি কমিশনার রিপোর্ট করেন "পিতারা নজরানার জন্য বয়স্ক স্বামীদের কাছে তাদের কন্যাদের বিক্রী করেছে।[১৫] এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে অযোধ্যার প্রজা সংগ্রাম গতিবেগ লাভ করেছিল। ভূস্বামীরা প্রজাদের উচ্ছেদ করছিল এবং তারা তার বিরুদ্ধে কখনও কখনও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। লক্ষ্যণীয় হল যে ঢিলে ঢালা ভাবে হলেও কৃষকরা কিষাণ সভার মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল। ১৯২১ এর মধ্যে কৃষকদের অসন্তোষ এত ছড়িয়ে পড়ল যে আর তা গোপন রাখা গেল না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে একটি সরকারী

রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজাদের ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার আন্দোলন ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল। বহুক্ষেত্রে এই ইউনিয়নগুলি স্থানীয় জোতদার ও প্রভুদের সঙ্গে দরকষাকষি করতে এবং প্রজাস্বত্বের অবস্থাকে উন্নত করতে নিজেদের নিযুক্ত রেখেছে···অন্ততঃ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে আধা-বলশেভিক কার্যকলাপের একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছে। অসহযোগ দলগুলির সরকারের প্রতি শত্রুতা প্রচারের নীতির দ্বারা এটা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে··· গ্রামবাসীদের শ্রেণী চেতনার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায়।"[১৬]

উত্তরপ্রদেশের প্রজা সংগ্রাম প্রতাপগড়, রায়বেরেলী, ফৈজাবাদ এবং সুলতানপুর জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান রূপকার হিসেবে আবির্ভূত জহরলাল নেহরু প্রজা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, তালুকদারদের 'অযোধ্যার ব্যারণ' বলে বর্ণনা করেছিলেন যাদের অন্যায় দাবী "অসহ্য হয়ে উঠছিল।" ১৯২০ এর গ্রীষ্মে প্রতাপগড়ের প্রজারা সংগ্রামে রত হল ; এই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন বাবা রামচন্দ্র নামক এক সন্ন্যাসী যিনি কৃষকদের মধ্যে ঘুরতেন এবং সুরেলা গলায় রামায়ণের কাব্যাংশ সভায় আবৃত্তি করতেন।[১৭] কয়েকজন কৃষক গ্রেপ্তার হলে জঙ্গী মেজাজের কৃষকরা আদালত প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কৃষক নেতারা মুক্ত হয়েছিলেন। নেহেরু লক্ষ্য করেছিলেন ঃ কৃষকদের পক্ষে এটা ছিল বড়ো জয়।"[১৮] ১৯২১ এর জানুয়ারীতে কৃষক বিক্ষোভ রায়বেরেলীতে ছড়িয়ে পড়ে। তালুকদারদের শির জমির ফসল নষ্ট করে ফেলা হয়, ভূস্বামীদের গৃহ আক্রমণ করা হয় এবং তাদের সম্পত্তি লুঠ করা হয়, কৃষকরা প্রায়ই ব্যবসায়ী ও মহাজনদের বাসস্থান বাজারে সমবেত হত ; সাবডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে কৃষকদের আচরণ প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

"আমি তাদের বাজারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এবং চলে যাওয়ার জন্য বলেছিলাম···কেউই আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। কখনও তারা বলত যে বানিয়ারা (ব্যবসায়ী) দারুণ লাভ করেছে। আমাদের তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। কখনও তারা ফসল ও বস্ত্রের মহার্ঘতা বা দুর্মূল্যতার অভিযোগ করত···আমার মতে প্রায় তারা আট বা দশহাজার জনতার স্ফীতকায় রূপ লাভ করেছিল এবং কিছু বাড়ী এবং দোকানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল···যখনই আমরা যেখানে গিয়ে পৌছুলাম

জনতা "জয় জয়" বলে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং চীৎকার করতে লাগল, "এদের মারো, পুড়িয়ে ফেল এদের বন্দুক কেড়ে নাও⋯তারা আমাদের ইটপাটকেল, লাঠি, বর্শা এবং কুড়ুল নিয়ে আক্রমণ করেছিল।"[১৯]

১৯২১ এর ৬ই জানুয়ারী পুলিশ ফুরসৎগঞ্জের কৃষকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে যার ফলে চার থেকে ছয় ব্যক্তি নিহত হয়; পরদিন মুন্সিগঞ্জে গুলিবর্ষণ চলে যেখানে নজন কৃষক নিহত হয়।[২০] নিম্ন-লিখিত ভাষায় নেহরু রায়বেরেলীর বিয়োগান্ত ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন: "যখন আমি নদীর ধারে পৌঁছুলাম, তখন অপর পার থেকে গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ব্রিজের ওপর আমাকে থামিয়ে দেওয়া হল⋯আমরা দেখলাম যে গুলিবর্ষণের ফলে মানুষ নিহত হয়েছে। কিষাণরা ছড়িয়ে যেতে বা ফিরে যেতে অসম্মত হল।"[২১] একজন পুলিশ অফিসার রিপোর্ট করেন, প্রজাসংগ্রাম অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল:

"কিষাণসভার উদ্যোগে বা খিলাফৎ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশের মধ্যে স্থানীয়ভাবে নির্বাচন করার কিছুই ছিল না। উভয় আন্দোলনই অসহযোগ দলগুলির করায়ত্ত ছিল এবং বর্তমানে একটি মাত্র আন্দোলন এগিয়ে চলছিল এবং তা হল অসহযোগ আন্দোলন।[২২]

প্রায় একই সময়ে ফৈজাবাদে বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। প্রধানত চামার, লুনি আর এবং আহীরদের মধ্যে থেকে আসা প্রজারা ব্রাহ্মণ জমিদারদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিল যাদের বাড়ী আক্রমণ ও লুঠ করা হয়েছিল। কৃষকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত না হওয়ার আবেদন জানিয়ে নেহরু সভায় বক্তৃতা করেন, এমনকি কৃষক-জমিদার ঐক্যের কথাও বলেন, যাতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভেঙ্গে না পড়ে।[২৩] ১৯২১ এর মার্চে বিক্ষোভ সুলতানপুরে ছড়িয়ে পড়ে। এই জেলার একটি গ্রামে স্বরাজ ঘোষিত হয় এবং পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] প্রচণ্ড নিপীড়ন ও নির্যাতন চলতে থাকে। ৬ই মার্চ 'ইনডিপেণ্ডেণ্ট' লেখে: "এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকে মারধোর করা হয়।" যখন প্রজা সংগ্রাম খাজনা ধর্মঘটের রূপ গ্রহণ করল তখন জাতীয়তাবাদীরা ট্যাকস বন্ধের আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন, যে আন্দোলন কোনভাবেই ভূস্বামীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীজী লিখেছিলেন: "যখন সময় আসবে তখন আমরা কৃষকদের ট্যাক্স দেওয়া স্থগিত রাখার কথা বলতে ইতস্ততঃ করব না। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের কোন পর্বেই জমিদারদের তাদের খাজনা থেকে

বঞ্চিত করার চেষ্টা হবে না।"[২৫] ১৯২১ এর নভেম্বরে এ আই সি সি কর না দেওয়াকে অনুমোদন করল; 'কোন খাজনা নয়' প্রচারের কথা উচ্চারণ করা হলনা; ১৯২২ এর ১২ ই ফেব্রুয়ারী বারদোলি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস কর্মী ও সংগঠনগুলিকে এই উপদেশ দিয়েছিল যে "রায়তদের জানানো দরকার যে জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখা কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধী এবং দেশের সর্বোত্তম স্বার্থের হানিকারক।"[২৬] প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান তা হলো জমিদারদের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখার ব্যাপারে কংগ্রেসের উদ্বেগ।

বিশ্বব্যাপী মন্দার বিবর্ণ বছরগুলিতে উত্তপ্রদেশের প্রজাসংগ্রামে একটি নতুন প্রবাহ দেখা গিয়েছিল। ১৯৩১ এর মধ্যে কৃষিপণ্যের দাম ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছিল; ১৯২৭ থেকে পর পর কয়েকবছর খারাপ ফসল হয়েছিল। প্রজারা খাজনা দিতে অপারগ হলে জমিদাররা উচ্ছেদের কাজ শুরু করল। ১৯৩০ এবং ৩১ এর মধ্যে বকেয়া খাজনার জন্য প্রজা উচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ৬৪,০৭৬ টি উচ্ছেদ করা হয়েছিল। জমিতে অনুপ্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশের চেষ্টার জন্য উচ্ছেদ হওয়া প্রজাদের বিরুদ্ধে ১৩,৩৩৭ টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল; ৩৪৫ জন প্রজাকে দণ্ডিত করা হয়েছিল।[২৭] ১৯৩১ এর এপ্রিলে কয়েকটি জেলায় গোলমালের বিবরণ শোনা যায়। আদালতের ক্রোক জারী হওয়া ফসল সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল; এলাহাবাদে একজন জমিদার আক্রান্ত হয়েছিল, বারাবাঁকীতে কয়েকজন জমিদারকে খুন করা হয়েছিল।[২৮] ১৯৩১-৩২ এর একটি সরকারী রিপোর্টে বিস্ফোরক পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে:

"করাচী কংগ্রেসের কুড়িটি মূল লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল পঞ্চাশ শতাংশ হারে ভূমি রাজস্ব হ্রাস এবং ছোট মালিকদের সামগ্রিকভাবে রেহাই দেওয়া। এই অসার রাজনৈতিক কল্পনার দ্বারা প্রলোভিত হয়ে কংগ্রেস নেতারা এই রকম উর্বর জমিকে ব্যবহার করার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারেনি··· যুক্তপ্রদেশে নেহেরুর আশীর্বাদ নিয়ে প্রজাসংগ্রাম শুরু হল, প্রজারা ভূস্বামীদের খাজনা দিলনা। কয়েকটি গ্রামে গুরুতর ঘটনা ঘটতে শুরু করল।"[২৯]

গুজরাটের একটি তালুক বারদোলিতে কোন খাজনা নয় প্রচারাভিযান কংগ্রেস শুরু করেছিল, যার ভিত্তি ছিল রায়তদের সমর্থন এবং যা সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল; প্রধান দাবী ছিল ভূমি রাজস্ব স্থগিতকরণ। প্যাটেলের দ্বারা পরিচালিত বারদোলি কংগ্রেস

প্রচণ্ড নিপীড়নের মুখে বড়ো মাপের সাফল্য অর্জন করেছিল ; কিন্তু উত্তর প্রদেশের পরিস্থিতি ছিল মূলগতভাবে ভিন্ন। যে সব ভূস্বামীরা খাজনা না দেওয়ার জন্য প্রজাদের উচ্ছেদ করেছিল, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল খাজনার প্রশ্নে নেহেরু উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং খাজনা ধর্মঘট শুরু করার পক্ষে ছিলেন ; গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাকে শ্রেণী সংগ্রামের ভয় দেখালেন। তিনি খাজনা বন্ধ এবং প্রজা কর্তৃক জমিদারদের আক্রমণকে সমর্থন করলেন না।[৩০] সরকারী কর্মচারী ও জমিদারদের নিপীড়নের ব্যাপকতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করার জন্য কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটি স্থাপন করলেন।[৩১] কিন্তু সংকট গভীরতর হল কারণ সরকারের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হয়ে জমিদাররা বকেয়া খাজনার জন্য প্রজাদের উচ্ছেদ করতে থাকল। এই প্রশ্নে জহরলাল বলিষ্ঠভাবে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচারাভিযানের কথা প্রচার করলেন। কৃষক সম্মেলন খাজনা বন্ধের সুপারিশ করল এবং জহরলাল বললেন ঃ "এটা যুদ্ধ বর্তমানের যুদ্ধ এবং আমাদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।"[৩২] ১৯৩১ এর ডিসেম্বরের আগে প্রকৃতপক্ষে কোন খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়নি। এই আন্দোলনে কৃষক জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। রায়বেরেলী, এটাওয়া, কানপুর, উনাও, এলাহাবাদে খাজনা দেওয়ার ব্যাপারটি "প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"[৩৩] অভূতপূর্ব আন্দোলনের সম্মুখীন হয়ে সরকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কালক্ষেপ করেনি। ২৬শে ডিসেম্বর জহরলাল গ্রেপ্তার হলেন। নতুন ভাইসরয় ওয়েলিংডনের শাসনে নিপীড়ন ছিল সীমাহীন। কিষাণসভা, যুব সংঘ, এবং কংগ্রেস সমর্থিত বিদ্যালয়গুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। ১৯৩২ এর মধ্যে প্রজা সংগ্রাম নিঃশেষিত হল। অবশ্য সরকার খাজনা বন্ধ সংগ্রামের পুনঃ প্রকাশের আশংকা করেছিল এবং নেহেরুকে একজন সম্ভাব্য বিক্ষোভকারী বলে মনে করেছিল।[৩৪]

কৃষাণ সভা

প্রজাদের সংগ্রাম কৃষক আন্দোলনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল। ক্রমশ অগ্রবর্তী হচ্ছিল জমিদারদের ক্ষমতা চ্যুত করার সংগ্রাম। ইতোমধ্যে কমিউনিস্টরা নাট্য মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। কমিউনিস্টদের মৌলিক আদর্শগুলি প্রচারিত হতে লাগল। হেইলী ঘটনার

গতি লক্ষ্য করেছিলেন ঃ "ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক চাপের দ্বারা নিপীড়িত প্রজাদের বলা হয়েছিল যে ভূস্বামীরা হল পরগাছা, তাদের ভবিষ্যতের একমাত্র আশা হল কৃষক ও শ্রমিকদের রাষ্ট্র বা ভূস্বামীদের ধ্বংস করবে।"[৩৫] কৃষক ঐক্যবদ্ধ কাজের শক্তি উপলব্ধি করার পর কয়েকটি প্রদেশে কিষান সভা গঠিত হল। কিন্তু এই সমস্ত কৃষক সংগঠন গুলি প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এবং কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না যা কৃষক আন্দোলনকে পরিচালিত করতে পারে ও যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। ১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মোহমুক্তি সোস্যালিষ্ট কমিউনিষ্ট এবং র‍্যাডিকাল কংগ্রেসীদের আত্মানুসন্ধানের পথে পরিচালিত করেছিল। যে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষক "সেখানকার কৃষক সমাবেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে নবজাগ্রত চেতনা দেখা গেল। এই পটভূমিতে ১৯৩৬ খৃীষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল সারা ভারত কিষান সভা লক্ষৌতে গঠিত হল।[৩৬]

১৯৩৬ খৃীষ্টাব্দে সারাভারত কিসান সভা তার কর্মসূচী গ্রহণ করল, কিন্তু কৃষি বিপ্লব ভবিষ্যতের গর্ভেই রয়ে গেল। কিষান সভা সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন কর্মসূচী গ্রহণ করল এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে ভোলেনি। ইস্তাহার অনুসারে কিষান সভার লক্ষ্য "অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ…" সর্বাধিক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল জমিদারী প্রথা বিলোপ ও কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার দাবী। সর্বনিম্ন কর্মসূচীতে ছিল ঋণ স্থগিত রাখার আইনগত অধিকার, ভূমিরাজস্ব ও বিলোপ, মহাজনদের লাইসেন্স দেওয়া, কৃষি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী, আখ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসলের নায্য দাম, জলসেচের সুবিধা।[৩৭] আপাতত কিষান সভা সমস্ত শ্রেণীর কৃষকের স্বার্থকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিল। জমি থেকে ভূমিরাজস্ব ও খাজনা বিলোপ, বাণিজ্যিক ফসলের জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান, জলসেচের সুবিধা ছিল প্রকৃতপক্ষে রায়তদের দাবী। এই সমস্ত দাবী কৃষিশ্রমিক বা প্রজাদের খুব কমই প্রভাবিত করত। ধনী চাষী শস্যের উচ্চমূল্য পেতে আগ্রহী ছিল। অপর দিকে গরীব চাষী বা প্রান্তিক চাষী খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য থেকে খুব কমই লাভবান হত। সে তার নিজের উপভোগের জন্য বেশী উৎপাদন করত না। বছরে কয়েকটি মাসের জন্য তাকে খাদ্যশস্য কিনতে হত।

আগের একটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে সে ফসল কাটার সময়ের দামে শস্য বিক্রী করত এবং উৎপন্নের একটি অংশ তাকে মহাজনদের সমর্পণ করতে হত, এই মহাজনরা প্রায়ই ছিল ধনী কৃষক। প্রজারা নগদ ফসলের চড়া দামের চেয়ে তার প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তার বিষয়ে অধিক আগ্রহী ছিল।

কিষাণ সভা আপাতভাবে তাৎক্ষণিক সুবিধার পথ গ্রহণ করেছিল এবং ধনী কৃষকের মাধ্যমে গরীব কৃষকের কাছে পৌঁছুবার চেষ্টা করত। এই অনুমানও ছিল যে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের দ্বারা দখলচ্যুত হওয়ার বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে ধনী কৃষকরা গরীব কৃষকের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবে। কৃষককে জমি দিতে হবে—এই দাবী কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু একে বহু দূরবর্তী আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। এটা প্রচারে ব্যবহার করা হ'ত বলে মনে হয়। কৃষক সমাজের আশু দাবীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং কৃষকসভা আংশিক সংগ্রামকে সংগঠিত করেছিল। তথাপি "আংশিক সংগ্রাম" প্রধানত খাজনাদাতা প্রজাদের দাবীতেই কেন্দ্রীভূত ছিল এবং কয়েকটি রাজ্যে জনপ্রিয় চরিত্রের রূপ গ্রহণ করেছিল। এই সংগ্রামের তাৎপর্য বা প্রভাব কৃষকসভাকে এমন একটি পথে ঠেলে নিয়ে গেল যা ছিল অপরিচিত বা অজানা। সামনে যে সব সমস্যা ছিল সে সম্পর্কে নেতৃত্বের কোন আভাসও জানা ছিল না। নেতারা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক ঐক্যের তত্ত্ব নিয়ে ক্লান্তিকর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ কিষাণ সভার কাজকর্ম ও কৃষক আন্দোলনের প্রতি দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের শত্রুতামূলক মনোভাব সম্পর্কে বলে: "কৃষকদের মধ্যে, বিশেষত বিহার, বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ এবং মাদ্রাজের কৃষকদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা রাজনৈতিক চেতনার সাম্প্রতিক বিকাশ সম্পর্কে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে···যদিও ভারতে গণ-কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সাধারণ সাফল্য খুব অল্পই লাভ করা গেছে, তবুও এটা খুবই ইঙ্গিতবাহী যে নেতৃস্থানীয় কমিউনিষ্টরা বিক্ষোভকারীদের সংগঠিত ও পরিচালিত করার দিকে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে···সমগ্র কংগ্রেস সংগঠনকে বিপদগ্রস্ত করছে, এই ধরণের একটি স্বাধীন সংগঠনের যে কোন পরামর্শকে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতারা তীব্র সমালোচনা করেছেন।"[৩৮] কিন্তু তখন পর্যন্ত কৃষি বিপ্লবকে এক দূরবর্তী আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। ১৯৩৯ এর শীতকালের মধ্যে কিষাণসভা "কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি:" এর

কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল "কোনও কর নয় আন্দোলন, বিহারে বকস্ত জমি দখল, পাইকারীভাবে বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ এবং গ্রামীণ এলাকায় রিক্রুটমেণ্ট বিরোধী অভিযান।"[৩৯] ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিষাণ সভা পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বিহারে কিছু পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছিল। এই বিহারেই বকস্ত আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল।

বকস্ত আন্দোলন

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে প্রজা সংগ্রাম ভেঙ্গে যাওয়ার পর আংশিক সংগ্রামগুলি ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে একটি অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করে; ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে কিষাণ সভা গঠিত হয়েছিল। যিনি গান্ধীজীর শিষ্য হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে-ছিলেন এবং আশ্রমে একজন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন সেই স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী (১৮৮৯-১৯৫০) কিষাণ সভার প্রতি অনুরক্ত হলেন এবং অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে কিষাণদের সমবেত করতে একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৪০] ১৯৩২ থেকে তিনি প্রজাদের দখলের অধিকারের দাবীকে তুলে ধরেন এবং জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বকস্ত আন্দোলন শুরু হয়। বকস্ত জমি ছিল জমিদারদের খাস জমি। এ জমি প্রজারা এই শর্তে চাষ করত যে তারা তাদের উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ খাজনা হিসেবে জমির মালিককে দেবে। জমিদারদের একটা ঝোঁক ছিল, প্রজার বন্দোবস্তাধীন জমিকে বকস্ত জমিতে (খাস জমি) পরিণত করা, যেহেতু তাদের ভয় ছিল প্রজারা দখলের অধিকার অর্জন করতে পারে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গের জেলার বারহাইয়া তাল এর জমিদাররা প্রজাদের, বিশেষতঃ বকস্ত জমিতে নীচু জাতের ধানুকদের উচ্ছেদ শুরু করে। কিষাণ সভা উচ্ছেদ প্রতিরোধ করে এবং বকস্ত আন্দোলন শুরু করে।[৪১]

কৃষক আন্দোলনের বিকাশের পেছনে বিভিন্ন উপাদানের অবদান আছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব গঠিত হওয়ার পর জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল, যেহেতু কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব ঘোষণা করেছিল যে প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকরী করা হবে। ফৈজপুরে কংগ্রেস একটি মৌলিক কৃষিসম্পর্কিত কর্মসূচী গ্রহণ করে যার অন্তর্ভুক্ত ছিল খাজনা ও রাজস্ব হ্রাস, সামন্ততান্ত্রিক দেনা ও লেভির বিলোপ, স্বত্বের নির্দিষ্ট-করণ, ঋণ স্থগিত রাখার আইনগত অধিকার, কৃষিজীবী শ্রমিকদের বাঁচার

মতো মজুরী এবং কাজের উপযুক্ত পরিবেশ ও অবস্থার জন্য আইনগত ব্যবস্থা। এটাও একটা ঘটনা, যা আওয়াদেশ্বর প্রসাদ নির্দেশ করেছেন, যে কৃষক বিক্ষোভ গয়া, মুঙ্গের, পাটনা এবং ছোটনাগপুর জেলায় তীব্র হয়ে উঠেছিল। কৃষকরা "দ্রুতহারে দখলচ্যুত হয়েছিল, কৃষিজীবী শ্রমিকরা ধনী কৃষক ও জমিদার কর্তৃক সমস্ত রকম শোষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"[৪২] প্রকৃতপক্ষে কৃষক আন্দোলনকে কৃষিগত অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা গিয়েছিল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট প্রায় ২০ হাজার কৃষক পাটনায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। তাদের শ্লোগান ছিল ঃ 'আমাদের রুটি দাও, আমরা ক্ষুধার্ত, আমাদের জল দাও, আমরা তৃষ্ণার্ত, সমস্ত কৃষি-ঋণ মকুব কর, জমিদাররা ধ্বংস হোক।"[৪৩] মনে হয়, কৃষকদের জমায়েত করার নতুন নীতি জোরের সঙ্গেই অনুসৃত হয়েছিল। ১লা সেপ্টেম্বর এবং ২৬শে নভেম্বর পাটনায় বড়ো বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল। যদিও কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বকস্ত ল্যাণ্ড অ্যাক্ট এবং বিহার টেনান্সি অ্যাক্ট পাশ করেছিল, তথাপি জমিদাররা প্রজাদের উচ্ছেদ করে চলছিল। সভা, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং সত্যাগ্রহ সংগঠিত হয়েছিল মুঙ্গের, গয়া, সাহাবাদ, দ্বারভাঙ্গা এবং সারাণ জেলায়। যে কৃষকরা উচ্ছেদ প্রতিরোধ করছিল কয়েকটি জেলায় জমিদারের লাঠিয়ালরা তাদের আক্রমণ করেছিল। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং প্রায় ২০০ কৃষক ও কিষাণসভার কর্মী কারারুদ্ধ হয়েছিল।[৪৪] মনে হয়, কিষাণ সভার উল্লেখযোগ্য জন সমর্থন ছিল, ১৯৩৮ এ এর সভ্যসংখ্যা ছিল ২৫০,০০০ যার অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঞ্জাব (৭৩,০০০), উত্তরপ্রদেশ (৬০,০০০), অন্ধ্র (৫৩,০০০), বাঙলা (৩৪,০০০), উড়িষ্যা (১৮,০০০)।[৪৫] ১৯৩৯ এর গ্রীষ্মে গয়াতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কিষাণ সভার প্রায় একলক্ষ কৃষক ৯ই এপ্রিলের সমাবেশে যোগ দিয়েছিল এবং ৬০০ স্বেচ্ছাসেবকের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল।[৪৬]

যে কংগ্রেস জমিদারদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, বিকাশমান কৃষক আন্দোলনকে তার আশীর্বাদ পুষ্ট করার কথা ছিল না। অভিযোগ করা হয় যে কিষাণ সভা এই শ্লোগান তুলেছিল "লাঠি হামারা জিন্দাবাদ" (আমাদের লাঠি দীর্ঘজীবী হোক)। কংগ্রেস "ডাণ্ডার সংস্কৃতিকে" নিন্দা করেছিল এবং তার সদস্যদের কিষাণ সভার কাজকর্মের সঙ্গে "নিষ্ক্রিয় সংযোগের" বিরুদ্ধেও সতর্ক করে দিয়েছিল। কয়েকটি

কংগ্রেস কমিটি সহজানন্দকে সারাণ, মুঙ্গের এবং চম্পারণ জেলা পরিভ্রমণ করতে নিষেধ করেছিল।[৪৭] যদিও কৃষক আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের শত্রুতা খোলাখুলি ও প্রকাশ্য ছিল তবুও সারা ভারত কিষাণ সভার নেতৃত্ব কংগ্রেস ও কিষাণ সভার যুক্তফ্রন্ট বজায় রাখার "বিগত বছরটি কৃষক সমাজের পক্ষে সামান্য স্বস্তির বছর হয়েছে…সভা মনে করে যে কংগ্রেস ও কিষাণসভার মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো উচিত…জাতীয় অনৈক্যের শক্তিগুলি যাতে… সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় ঐক্যকে দুর্বল না করে।"[৪৮]

কংগ্রেস ও কিষাণ সভার প্রশ্নে মোর্চার কিষাণসভার নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটা যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়েছিল যে কংগ্রেস ঐক্য চায়নি, শোষক ও শোষিতের মধ্যে কোন ঐক্য হতে পারে না। সুতরাং জাতীয় ফ্রন্ট ছিল একটি অসার কল্পনা ১৯৩৯ এর এপ্রিলে, সারা ভারত কিষাণসভার গয়া অধিবেশনের প্রাক্কালে "ন্যাশনাল ফ্রন্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে জোশী যুক্তফ্রন্টের নীতিকে সমর্থন করতে গিয়ে আপাতভাবে কিষাণ সভার সংগঠকদের আশংকাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেন নি ঃ

…"স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সচেতনভাবে কাজ করা প্রয়োজন এবং এইভাবে প্রত্যেকটি কিষাণ সংগ্রামকে জনগণের সংগ্রামে পরিণত করা, এবং নীচের থেকে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রধান ভাগটি হল একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, অন্য দিকে সমগ্র জনগণ, আমাদের সংগ্রামের প্রধান মুখপাত্র হল জাতীয় কংগ্রেস…সমগ্র কংগ্রেস কিষাণ ঐক্যই কংগ্রেসকে সামনে এগিয়ে দেবে।"[৪৯]

সহজানন্দ "কংগ্রেস কিষাণ ঐক্য" সম্পর্কে ক্রমশ মোহমুক্ত হচ্ছিলেন ; কিন্তু বকস্ত আন্দোলন কংগ্রেস ও কিষাণ সভার মধ্যেকার মত পার্থক্য বাড়িয়ে তুলেছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর তিনি সুভাষ বসুর সহযোগী হন এবং কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিষাণ সভার ওপর নির্যাতন বৃদ্ধি পেল এবং সহজানন্দকে হাজারিবাগের জেলে বন্দী করা হল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন জার্মানী সোবিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে কিষাণ সভা একটি জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। সারা ভারত কিষাণ সভার সভাপতি হিসেবে

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সহজানন্দ একটি নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি দেন ঃ "এই যুদ্ধকে সাফল্যের সঙ্গেই ভারতীয় জনগণের যুদ্ধে পরিণত করা যায় একমাত্র তখনই যখন এটি একটি জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।"[৫০] কিন্তু এই নীতি সমাজবাদী বা জাতীয়বাদীদের সমর্থন করা খুব কঠিন ছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে, অধ্যাপক রঙ্গ যিনি পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র দলের স্তম্ভস্বরূপ হয়েছিলেন তিনি কিষাণ সভা পরিত্যাগ করেন ; পরবর্তী বছরে তাকে অনুসরণ করেন গুজরাটের বিখ্যাত নেতা ইন্দুলাল যাজ্ঞিক। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিহারে কৃষি সম্পর্কিত আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ছিল ; ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কিষাণসভার মাত্র ২৮,০০০ সভ্য ছিল।[৫১] মনে হয়, কিষাণ সভার ভেতরে ফাটল ধরার লক্ষণ দেখা দিলে সহজানন্দ দোদুল্যমানতা দেখাতে শুরু করলেন এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কিষাণ সভা পরিত্যাগ করা স্থির করলেন। সহজানন্দ কিষাণ সভা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিষাণ সভা পুরোপুরিভাবে কমিউনিষ্টদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিহারে কৃষক আন্দোলন মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। মিঃ হাউসার লেখেন যে আন্দোলন ততদিনই সক্রিয় ছিল যতদিন সহজানন্দ এটিকে জাতীয়তার কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত করেছিলেন এবং "যখন তিনি জাতীয়তাবিরোধী বামপন্থীদের আদর্শগত রাজনীতিতে আকৃষ্ট হলেন" তখন এটি টুকরো টুকরো হতে আরম্ভ করল।[৫২] এই উক্তি আংশিক সত্য। একথা সত্য যে কৃষিগত আন্দোলন ১৯৩৭-৩৮ এ চরমোৎকর্ষে পৌঁছেছিল যখন সহজানন্দ একজন কংগ্রেসী হলেও বামপন্থীদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, এটা ছিল একটা যুক্তি সম্মত পথ। কৃষিগত আন্দোলন ভূমিহার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং কায়স্থদের দ্বারা প্রভাবিত গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোকে বিপদাপন্ন করে তুলছিল যার ফলে কিষাণ সভা ও কংগ্রেসের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়ছিল। একটা দুঃসমাধেয় সমস্যা বলে যা মনে হয়েছিল তা হল সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের একটি সমাবেশে জমায়েত করা। বকস্ত আন্দোলনের ভিত্তি ছিল খাজনাদাতা প্রজাদের সমর্থন এবং এই আন্দোলন একটি ছোট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষিশ্রমিকদের, যারা ছিল প্রধানত হরিজন তাদের সংগঠিত করার কোনও লাগাতার প্রচেষ্টা ছিল না। কিষাণ সভার কুমিল্লা অধিবেশনে সহজানন্দের একটি বক্তৃতায় দেখা যায়, কৃষি শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রশ্নে তিনি দ্ব্যর্থবোধক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন;

ছোট কৃষকদের তিনি "কিষাণ সভার মেরুদণ্ড" বলেমনে করেছিলেন এবং যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে "এই দুটি গোষ্ঠীর কৃষকের মধ্যে কোন কঠোর পার্থক্যের রেখা টানা যায় না।"[৫৩] মনে হয়, যখন তিনি দেখলেন যে ধনী কৃষকরা কিষাণ সভায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে তখন তিনি তাঁর নীতি পরিবর্তন করলেন।[৫৪] ধনী কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের জন্য তাঁকে এই মূল্য দিতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কৃষি শ্রমিকরা সবচেয়ে সমস্যামূলক গোষ্ঠীহিসাবে আবির্ভূতহয়েছিল এবং সারাভারত কিষাণসভা কৃষি শ্রমিক ও ধনী কৃষকদের স্বার্থকে মিলিয়ে দেওয়ার লাগাতার চেষ্টা করেছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষি-শ্রমিক সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে অধিকতর মজুরীর জন্য কৃষিশ্রমিকদের আন্দোলন সংগঠিত করার কোন আহ্বান ছিল না। প্রস্তাবে বলা হয়েছে ঃ

"সভা সর্বদাই স্বীকার করেছে যে কৃষি মজুর ও শ্রমজীবী কৃষকরা কৃষক শ্রেণী বা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যতক্ষণ ও যতদিন না কৃষি শ্রমিকদের বড়ো অংশের কাজের নিরাপত্তা, নিম্নতম মজুরী, বেঁচে থাকার মানবিক ও আত্ম সম্মানজনক শর্ত এবং সমস্ত ফিউডাল দাসত্ব বা বন্ধন থেকে স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা যায়, ততক্ষণ ও ততদিন গ্রামীণ জীবনের পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়।

যেখানে স্বতন্ত্র কৃষিশ্রমিকদের ইউনিয়নের অস্তিত্ব রয়েছে, যেখানে পি. কে. সির কর্তব্য হল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সমস্ত বিবাদের একটি মীমাংসায় আসা, যদি কোন বিবাদ কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে শুরু হয়ে থাকে।[৫৫]

তেভাগা ও টংক সংগ্রাম

যখন আমরা বাঙলার দিকে তাকাই, তখন বহু উপাদান সম্বলিত সমাজের সমস্যা এবং ভূস্বামী ভদ্রলোকদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। পূর্ব বাঙলার জেলাগুলিতে জমির মালিক ছিল প্রধানত হিন্দু কিন্তু কৃষক সমাজের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। ব্রুমফিল্ড বলেছেন, "ইসলামিয়া আনজুমান হিন্দুবিরোধী ও কংগ্রেস বিরোধী প্রচারে লিপ্ত ছিল, বর্ণ সংগঠনগুলি নীচু জাতের মানুষকে সংগঠিত করছিল ; প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ভূসম্পত্তি দখল করেছিলেন এবং "সমানভাবে জাতের মর্যাদা ও উদারপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূল্য দিয়েছিলেন এবং তাদের পরিহার করে চলার ইচ্ছে সামান্যাই ছিল।"[৫৬]

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে কৃষিপণ্যের দামবৃদ্ধির ঝোঁক দেখা গেলে ১৯৩৭ থেকে কৃষিগত আন্দোলন গতিবেগ লাভ করল। মনে হয় যে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি জনগণের প্রত্যাশাকে জাগ্রত করেছিল।[৫৭]

ফজলুল হক মন্ত্রীসভা ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপন করেছিল যা কৃষকদের ঋণ হ্রাস করেছিল ; ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত হয় ; ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে সভাপতি করে ১৯৩৯ এ ভূমি রাজস্ব কমিশন স্থাপিত হয় ; এই কমিশনের রিপোর্ট কৃষিগত সমস্যার বিশ্লেষণে অনেক সরকারী রিপোর্টকে ম্লান করেছে। কমিশন সুপারিশ করেছিল যে বর্গাদারদের প্রজা বলে গণ্য করা উচিত এবং ফসলে ভূস্বামীর অংশ অর্দ্ধেকের পরিবর্তে এক তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত। যে আইন ব্যবসায়ীরা বার এ্যাসোসিয়েশন তৈরী করেছিলেন তারা জোরের সঙ্গে বলেন যে বর্গা ব্যবস্থা ছিল গরীব কৃষকদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। জলপাইগুড়ি বার এ্যাসোসিয়েশন বর্গা ব্যবস্থাকে "অর্থনৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য" বলে মনে করেছিল এবং এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল যে যদি বর্গাদারদের দখলের অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে ভূস্বামীরা ভৃত্য অথবা ভাড়া করা শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করবে। ময়মনসিংহ বার এ্যাসোসিয়েশনের মতানুসারে বর্গাদাররা ছিল "সবচেয়ে সুখী মানুষের দল"; "ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের চেয়ে বর্গা ব্যবস্থা অনেক ভাল।" পাবনা বার এ্যাসোসিয়েশন এই যুক্তিতে বর্গাদারদের দখল স্বত্বের অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধতা করে যে শ্রমিক ছাড়া কিছুই নয় এমন একজন ব্যক্তিকে এই ধরণের অধিকার দিলে জমিদার ও রায়তরা তাদের জমি অকর্ষিত রাখবে। ২৪ পরগণার বার এ্যাসোসিয়েশন যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে "ভূস্বামীরাই বর্গাদারদের কাছ থেকে আসা বিপদের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ বা নিরাপত্তার প্রয়োজন অনুভব করে।" দিনাজপুর বার এ্যাসোসিয়েশন "মধ্যবিত্তরা বিপন্ন"—এই জুজুর ভয় দেখাচ্ছিল : "বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেশের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক বিকাশে অবদান রেখেছে…এই শ্রেণীর জীবন ধারণের প্রধান উপায় হল জমি…এই শ্রেণীকে জমি থেকে বঞ্চিত করার প্রধান ফল হবে তাদের বিনাশ…সমগ্র উৎপাদনের অর্ধাংশ পাওয়া বর্গাদারদের পক্ষে ভাল ব্যবস্থা।"[৫৮]

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে, উত্তর বাঙলার দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি স্টেশনে সীমাবদ্ধ বর্গাদার আন্দোলন প্রথম পর্যায় কিষাণ সভার অব্যাহত কাজের মধ্যে মধ্য দিয়ে শুরু হল। এটা

কিষাণ আন্দোলনে একটি নতুন পর্বের সূচনা করল। এই আন্দোলন আর ধনী কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বর্গাদারদের প্রধান দাবী হল জোতদারের খামারের পরিবর্তে নিজ খোলানে ধান তোলা এবং কর্জা ধানের সুদের হার কমানো। বহু সভা হয়; কিষাণ সভার স্বেচ্ছাসেবকরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে মিছিল করে যেতে লাগল। বর্গাদারেরা তাদের খামারের ধান তুলতে শুরু করল। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য হল রাজবংশী কৃষকদের অংশগ্রহণ। জলপাইগুড়িতে গুর্খা সেনাদের পাহারা বসানো হয় ও ২০০ কৃষক গ্রেপ্তার হয়।[৫৯] জলপাইগুড়ির এই আন্দোলনকে দমন করা হলেও তা দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মহকুমায় বর্গাদাররা গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ ছিল। রামলান সিং, পাথাল সিং ও বিনোদ দাস স্থানীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সিংরা ছিল মাঝারি কৃষক আর জাতে গোয়ালা দাসরা ছিল ধনী কৃষক। কিছু ছোট ভূস্বামী পূর্বে আন্দোলনে যোগ দিলেও পরে কিষাণ সভা পরিত্যাগ করে। আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত হলে সাবডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট হস্তক্ষেপ করে একটি মীমাংসায় উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে সকলে একমত হয় যে বিবাদের সূত্রগুলিকে জোতদার ও বর্গাদারদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বোর্ডে পেশ করা হবে।[৬০] এরপর ১৯৪০ প্রচণ্ড দমন পীড়ন সুরু হল এবং কিষাণ সভাকে আত্মগোপন করতে হল। তবুও কৃষক বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং কিষাণ সভা পুলিশের তাড়নাকে এড়িয়ে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করল। ১৯৪১ খৃীষ্টাব্দের ২০ শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে: "রিপোর্ট থেকে মনে হয়, প্রধানত কৃষক সমিতির মাধ্যমে ত্রিপুরা, ফরিদপুর, দিনাজপুর, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ঢাকা ও রাজশাহী জেলায় সাম্যবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে··· জনপ্রিয় কর্মসূচী নিয়ে সাম্যবাদীরা কাজ করছে, যেমন উৎপন্ন ফসলে বর্গাদারদের ভাগ, পাটের জন্য নিম্নতম দাম স্থির করা, কর্জা ঋণের কোন সুদ না দেওয়া এবং জুট রেষ্ট্রিকসন স্কীম অনুযায়ী জমির অপ্রচুর বণ্টন। এই সব ঘটনার দিকে সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন হবে।"[৬১]

১৯৪৬ খৃীষ্টাব্দে শীতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত তেভাগা সংগ্রামের বিস্ফোরণ ঘটল। বর্গাদাররা মাঠ থেকে ধান তাদের খামারে নিয়ে যেতে লাগল এবং অর্ধেকের পরিবর্তে দুভাগ ফসলের দাবী জানাল। কিষাণ সভা তেভাগা আন্দোলনকে জমিদারী প্রথা বিলোপের এবং

কৃষকের হাতে জমি ন্যস্ত করার দাবীর সঙ্গে যুক্ত করেছিল। মনে হয়, বর্গাদারদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং বাঙলার জেলাগুলিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল। যেহেতু সমস্ত ধানই বর্গাদারদের খামারে গাদা করা হত, তাই এই আন্দোলন আংশিক জয়লাভ করেছিল। গ্রামগুলি থেকে উল্লাসের ধ্বনি উচ্চকিত হয়ে উঠল। কৃষকদের মনোবল দৃঢ় হয়ে উঠল। স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার একজন সাংবাদিক দিনাজপুর জেলায় আন্দোলনে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন ঃ

"বিগত শতকগুলিকে নির্বাক হয়ে থাকার পর সে আজ শ্লোগানের ধ্বনির দ্বারা মুখরিত। তাকে সহযোগীদের সঙ্গে মাঠে মিছিল করে এগিয়ে যেতে দেখা অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা। প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেলের মতো রয়েছে লাঠি, শোভাযাত্রার সম্মুখে রয়েছে লাল পতাকা। বাঁশঝাড়ের নীরবতার মধ্যে ললাটের উপরে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে তাদের 'ইনকিলাব, কমরেড' ধ্বনি কেমন যেন ভীতির সঞ্চার করে।

"লাঠি বহন করা আপাতভাবে বাধ্যতামূলক···একজন সহরবাসী সমর্থক বলেছিলেন "যুগ যুগ ধরে অধঃপতিত মানুষকে লাঠি সাহস যোগায়! হিংসাকে নিন্দা করলেও তারা অবশ্য লাঠির ব্যবহারে পশ্চাৎপদ হয় নি।"[৬২]

প্রায় একই সঙ্গে কাছারী উপজাতিদের অন্তর্গত হাজংরা মৈমনসিংহ জেলায় টংক আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৬ এর ৮ই ডিসেম্বর প্রায় ৫,০০০ হাজং টংক খাজনা হ্রাস এবং তাকে ফসলের বদলে টাকায় পরিণত করার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন সংগঠিত করে।[৬৩] টংক ছিল ফসলের খাজনা যা ভূস্বামী কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে প্রজাকে দিতে হত এমন কি খরা বা বন্যার জন্য ফসলহানি ঘটলেও রেহাই ছিল না। চাষের খরচ প্রজাদের বহন করতে হত। ১৯৩৭ এ মৈমনসিংহ জেলার কিষাণ সভা টংক খাজনা হ্রাসের একটি আন্দোলন শুরু করে। হাজং ছাড়াও সুসাঙ্গ এর হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে যে সব প্রজা সমবেত হয়েছিল তাদের একটি বড়ো অংশ ছিল মুসলমান। এই আন্দোলন তিরিশের দশকে সর্বপ্রথম সুসান জেলার দাসাল গ্রামের কৃষকদের মধ্যে শুরু হয়। কলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং অনুশীলন পার্টির সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘদিনে বিপ্লবী মণি সিং তাঁর নিজের জেলা মৈমনসিংহে এলেন এবং হাজংদের মধ্যে ডুবে থেকে তাদের সংগঠিত করলেন। সম্পন্ন কৃষক ললিত সরকার যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৭-৩৮এ

কিষাণ সভা আন্দোলনে যুক্ত হলেন। ১৯৩৮এ ফজলুল হক মন্ত্রীসভা টংক খাজনা হ্রাস পেলে কিষাণ সভার প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেল। আধি খাজনার মতো টংক খাজনা শুধুমাত্র একটা প্রথা ছিল না, এতে আইনের অনুমোদনও ছিল। ১৯৪৬-৪৭ এর টংক আন্দোলনের একটা মোটামুটি বাস্তব বিবরণ স্টেটস্‌ম্যান দিয়েছে ঃ

"টংককে যথেষ্ট কম টাকার খাজনায় পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্য হল কৃষকদের যুদ্ধ পরবর্তীকালের কৃষিপণ্যের দামস্তরের সুযোগ দেওয়া এবং প্রজা উচ্ছেদকে আরও কঠিন করে তোলা। কৃষকদের পক্ষে টাকায় খাজনা দেওয়ার অন্য একটি সুবিধা আছে। যদি কোনও ক্ষেত্রে বিবাদ থাকে এবং ভূস্বামী তার খাজনা প্রত্যাখান করে টাকায় খাজনা হলে তা থানায় জমা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু জিনিষপত্রের ও ফসলের মাধ্যমে খাজনা হলে মজুদ করে রাখার অসুবিধার জন্য তা করতে পারেনা এবং সুদ দেওয়ার দায়ভাগী হতে হয়।"[৬৪]

নেত্রকোনা সদর ও জামালপুর মহকুমা সম্বলিত উত্তর ময়মনসিংহ টংক আন্দোলন হাজংদের উল্লেখযোগ্য সমর্থন লাভ করেছিল। কৃষকরা তাদের ফসল খামারে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দাবী পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত টংক দিতে অসম্মত হয়েছিল। হাজং কৃষকদের বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের সামনে ভূস্বামীরা এমন কি এই অঞ্চলে বছরের পর বছর কর্মরত মিশনারীরাও গ্রাম পরিত্যাগ করে পরিবার পরিজনদের শহরে স্থানান্তরিত করে। হাজংরা আন্দোলনের সামনের দিকে থাকলেও গারো ও তাদের মধ্যে কোন উপজাতীয় সংঘর্ষ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ এবং ১৯৪৭এর জানুয়ারী পর্যন্ত তা হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ করেনি।[৬৫]

ইতিমধ্যে সুরাবদ্দীর মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা দমন নীতি-মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিষাণ সভার বিবৃতি অনুযায়ী ১৯৪৬ এর ১৩ই ডিসেম্বর প্রায় ১০০০ কিষাণ সভার কর্মী গ্রেপ্তার হন এবং মৈমনসিংহ, দিনাজপুর ও যশোরে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়।[৬৬] ১৯৪৭ এর ৪ঠা জানুয়ারী পুলিশ দিনাজপুর জেলার চিড়িরবন্দর গ্রামে একটি কৃষক মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে, ফলে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ভূমি হীন সাঁওতাল কৃষক শিবরাম মাঝি এবং ভূমিহীন মুসলমান কৃষক সমীরুদ্দিন। একজন পুলিশ হাসপাতালে মারা যায়।[৬৭]

৩০শে জানুয়ারী মৈমনসিংহ জেলার বাহেরতলিতে হাজং কৃষক ও পুলিশের মধ্যে সত্যকার সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন

সুরেন্দ্র সরকার নামে একজন যুব হাজং কর্মী এবং মধ্য বয়সী বিধবা রাসীমণি যিনি মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের পরিচালনা করেছিলেন। দুজন পুলিশ নিহত হয়েছিল এবং তাদের রাইফেল কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।[৬৮] অমৃতবাজার পত্রিকা বাহারতলি ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করেন : "৩০শে জানুয়ারী বাহারতলিতে পুলিশ ও আদিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় যাতে দুজন পুলিশ এবং কয়েকজন হাজং পুলিশের গুলিচালনার ফলে নিহত হয়, পুলিশ ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং মনে হয় হাজংরা তাদের সম্পত্তি ও ধান পিছনে ফেলে দূরবর্তী অঞ্চলে পলায়ন করে।"

কৃষিগত বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি খসড়া আইন আনবার সিদ্ধান্ত করে। একথা অনস্বীকার্য যে বহু বছর ধরে বর্গাদাররা অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্গাদারদের প্রজাস্বত্বের অধিকার দানের কর্মসূচী সামনে এলে একজন স্বরাজবাদী নেতা ভদ্রলোক জোতদারের স্বার্থ তুলে ধরতে ত্রুটি করেন নি : "সাধারণভাবে যারা বর্গা ব্যবস্থায় তাদের জমি চাষ করায়, আমি সেই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে আবেদন করছি···অন্যায়ভাবে অধিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তদের রক্ষা করার জন্য আমি সভার কাছে আবেদন করছি।"[৬৯]

প্রজাস্বত্ব আইন (১৯২৮) বর্গাদারদের প্রজা বলে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯৪০ এ ফ্লাউড কমিশন সুপারিশ করেছিল যে বর্গাদারদের প্রজা বলে গণ্য করা উচিত এবং তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত ফসল অর্ধেকের পরিবর্তে এক তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত।" কিন্তু 'হায়' বধিরের কাছে এই সুপারিশ করা হয়েছিল। মনে হয় ১৯৪৭ এর ২২শে জানুয়ারী ক্যালক্যাটা গেজেটে যখন বর্গাদারস টেম্পোরারি রেগুলেশন বিল প্রকাশিত হল, তখন আন্দোলন তার সাফল্যের চরমশীর্ষে পৌঁছেছিল। যদি বর্গাদার চাষের খরচ সরবরাহ করে তাহলে দুই তৃতীয়াংশ সে নিজে নেবে বিলে এই ব্যবস্থা ছিল; জোতদার নিজে অথবা পরিবারের সদস্যদের সাহায্য নিয়ে জমি চাষ করতে চাইলে সে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে পারত।"[৭০]

বর্গাদার বিল তেভাগা সংগ্রামে একটি উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। যে বর্গাদাররা এতদিন নিরপেক্ষ নিষ্ক্রিয় এবং দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, বর্গাদার বিল তাদের নবজীবন দান করল। এই বিলের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অনেক সময় কিষাণ সভার অনুমোদন ছাড়াই তারা জোতদারের খামার থেকে ধান

মাড়াই করার জায়গায় ধান সরিয়ে নিয়ে যেতে সুরু করল। এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় তা একটি জনপ্রিয় রূপ গ্রহণ করেছিল।[৭১] বর্গাদাররা যুক্তি দেখিয়েছিল যে বর্গা-দার বিলে যে তেভাগা কে আইনগত সমর্থন দেওয়া হয়েছে ছোট ভূস্বামী-দেরও তা করা উচিত। নতুন সামাজিক চেতনার উত্তেজনা কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছিল তা সে যুগের উত্তাল আবহাওয়ায় অল্প ব্যক্তিই লক্ষ্য করে-ছিলেন। শুধুমাত্র বড়ো ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে তেভাগা সংগ্রাম পরি-চালিত হচ্ছিল তাই নয়, এর এলাকা ছোট ভূস্বামী ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও সম্প্রসারিত হল। আন্দোলনের একটি নোতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

যে জোতদাররা বর্গাদার বিদ্রোহের মুখে গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা দিন গুনছিল। তারা নিজেদের সংগঠিত করে তুলল, একটি জোতদার সমিতি তৈরী করল, চাঁদা তুলল এবং সরকারের ওপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করল। সুরাবর্দী তাঁর আইন সভার বক্তৃতায়, বিভিন্ন জোতদারদের বাড়ী থেকে লুঠের অভিযোগ জানিয়ে যে তারবার্তার বন্যা বয়ে গিয়েছিল, তার উল্লেখ করেন।"[৭২] দিনাজপুর জেলায় এই ঘটনা-গুলির উল্লেখ করে স্টেটসম্যান পত্রিকা লেখেন: "কিছু আধিয়ার আরও এগিয়ে গিয়েছিল, তারা জোতদারের খামারে মজুদ করা নতুন ধান নিজেরাই নিজের ভাগ হিসেবে নিয়ে গিয়েছিল। এটা হল রীতিকে বলপূর্বক পরিবর্তন করার চেষ্টা, কিন্তু এটা আইন ভাঙ্গার সামিল কিনা, তা হল সংশয়ের বিষয় এবং গ্রামের ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে একে 'লুঠ' বলা অতিরঞ্জন মাত্র। কিন্তু এই সব বিষয়গুলিতে অভিজ্ঞ জোতদাররা ডাকাতির অভিযোগ দায়েব করেছিল।[৭৩] জোতদাররা কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ উভয়ের মধ্যেই চাপ সৃষ্টিকারী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এরা প্রায়ই বাংলার রাজনীতিতে পরস্পরের বিরোধী ছিল। সেদিন দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংহতি দেখিয়েছিল।[৭৪]

ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে পুলিশী নিপীড়ন পুর্ণোদ্যমে শুরু হল এবং সরকার এ বিষয়ে পরিষ্কার মনোভাব প্রকাশ করল যে আঘাত করাই তার লক্ষ্য। ২০শে ফেব্রুয়ারী দিনাজপুরে খানপুর এ নির্বিচার গণহত্যা সংঘটিত হল, বালুরঘাটের নিকটবর্তী ছোট শহর খানপুরে পুলিশ বাহিনী কিছু স্থানীয় কৃষককে গ্রেপ্তার করার জন্য উপস্থিত হলে "মাদল বাজিয়ে সংকেত

ধ্বনি করা হল এবং তীর, ধনুক, বর্শা এবং অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে লোক জড়ো হল।" পুলিশের ট্রাক আক্রমণ করা হল, রাস্তার মাঝখান দিয়ে গর্ত কাটা হল এবং তার মধ্যে ট্রাক পড়ে গেল। সাঁওতালরা তাদের চিরাচরিত অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিল; ১২১ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল এবং ২০ জন কৃষক নিহত হয়েছিল; এদের মধ্যে ছিল চিয়ার সাই শেখ নামে সবলদেহী একজন মুসলমান কৃষক, যিনি স্থানীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মধ্য কৃষক পরিবার থেকে আগত মধ্যবয়সী রাজবংশী মহিলা যশোদা, এবং কিছু সাঁওতাল ও রাজবংশী কৃষক।[৭৫] ২১ শে ফেব্রুয়ারী দিনাজপুরের ধুমনিয়া গ্রামে আরেকটি কৃষক পুলিশ সংঘর্ষ হয় যাতে সুকুর চাঁদ নামক এক রাজবংশী কৃষক এবং তার স্ত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। মুক্তু সিং ও নেন্দেলী সিং গুলির আঘাত পেয়ে হাসপাতালে মারা যায়।[৭৬] ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুর-গাঁও শহরে কিষাণ সভা কৃষকদের ওপর গুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে একটি বড়ো মিছিল সংগঠিত করে। পুলিশ গুলি চালায় এবং হীরামন মহম্মদ নামে একজন গরীব মুসলমান কৃষক এবং দুজন রাজবংশী কৃষক নিহত হয়; দুজন সাঁওতাল কৃষক হাসপাতালে মারা যায়; এই বিক্ষোভ মিছিলের অন্যতম সংগঠক নিয়ামত আলি নিহত হয় এবং তার পা কেটে বাদ দিতে হয়।[৭৭]

২৮ শে ফেব্রুয়ারী শহীদ সুরাবন্দী বিধান সভায় একটি দীর্ঘ বিবৃতি দেন যার মূল প্রতিপাদ্য হল যে অরাজকতা গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে:

"শুধুমাত্র বিক্ষোভের একটি সাধারণ তরঙ্গ জেগে উঠেছিল তা নয়, অরাজকতা এবং কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করাও প্রকাশ পেয়েছিল…আদালত গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী করলেও গ্রেপ্তারকে প্রতিরোধ করা এবং গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি কে উদ্ধার করা ও পুলিশকে আক্রমণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল…মাঠ থেকে এবং কখনও কখনও জোতদারের বাড়ী থেকে জোর করে ফসল নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। পাল্টা আদালত স্থাপন করা হয়েছিল এবং আন্দোলনে বিরোধিতা করার জন্য লোকেদের ধরে আনা হত এবং শাস্তি দেওয়া হত। জোর করে জমি চাষ করা হত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জোতদারের পাশাপাশি এই চাষ হত। আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন কমিটি, সেচ্ছাসেবক বাহিনী, প্রচার পত্র, গোপন আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা সংগঠিত করা হয়েছিল। সেচ্ছাসেবকদের ব্যাজ ও লাঠি দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ড্রিল প্যারেড করতে শেখানো হয়েছিল…সৌভাগ্য

বশতঃ এই বিক্ষোভ দিনাজপুর, মৈমনসিং এবং জলপাইগুড়ির কয়েকটি জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল, অবশ্য অন্যত্রও এর মৃদু ধ্বনি শোনা গিয়েছিল।"[৭৮]

১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কৃষক আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছুল। এটা তখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে বর্গাদার বিলকে "সাফল্যের সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বিনষ্ট করা হয়েছে।"[৭৯] কিন্তু এই প্রশ্নটি তোলা হল যে তাদের গ্রেপ্তার করতে ও ধান ছিনিয়ে নিতে পুলিশ এলে তারা কি করবে। পুলিশী নিপীড়ন বা দমন নির্যাতনকে প্রতিরোধ করা কি না করা—এই উভয় সংকটের সম্মুখীন হল কৃষকসভা। পুলিশের নিপীড়নের সামনে মুসলমান কৃষকরা দোদুল্যমান মনোভাব প্রকাশ করল। বর্গাদাররা বড়ো এবং ছোট ভূস্বামীদের মধ্যে পার্থক্য করতে অসম্মত হলে এবং এই ভূস্বামীদের খামারে মজুদ করা ফসল নিজেদের খামারে নিয়ে যাওয়ার ফলে ধনী কৃষকরা শত্রুতামূলক মনোভাব গ্রহণ করতে শুরু করল। ভদ্রলোক জোতদাররা ছিল সর্বদাই শত্রুভাবাপন্ন। জোতদাররা কৃষকদের বিরুদ্ধে শত শত মামলা দাখিল করলে আইনজীবীরা মফঃস্বল আদালতে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের সৌভাগ্য গড়ে তুলল। আন্দোলন একটি অচল অবস্থায় ছিল। ভবানী সেন একটি নতুন কৌশলগত পন্থার নির্দেশ দেন যা তিনি পরে স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের জন্য একটি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষক সভায় এগিয়ে যাওয়া উচিত।[৮০] কিন্তু এটা মনে হয় না যে জমিদারদের উৎখাত করার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল; প্রকৃতপক্ষে কৃষক কর্তৃক জমি দখলের একটি দৃষ্টান্তও ছিল না। কৃষককে জমি দেওয়ার শ্লোগান তখন পর্যন্ত প্রচারের জন্যই তোলা হত, কার্যকরী করার জন্য নয়। অনিবার্যভাবেই প্রচণ্ড নিপীড়নের সামনে কৃষিগত আন্দোলন ভেসে চলছিল এবং পিছু হটছিল। ব্যাপক গ্রেপ্তার ছাড়াও শারীরিক নির্যাতন করা হত। মারধোর, স্ত্রী ও পুরুষকে আহত করা, নারী ধর্ষণের কাহিনী এক কুৎসিত চিত্র তৈরী করেছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার রিপোর্ট অনুসারে ৩,১১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২৪ পরগণা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর এবং ময়মনসিংহে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল।[৮১] কৃষকদের সন্ত্রস্ত করার আরও একটি পদ্ধতির কথা জ্যোতি বসু উল্লেখ করেছেন: আমি দেখছি, কৃষকদের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ

তাদের জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কোন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার সুযোগ পায় না। তাদের দিনের পর দিন উচ্ছেদ করা হচ্ছে।[৮২] যদি জোতদাররা সত্যিই "দিনের পর দিন" বর্গাদারদের উচ্ছেদ করতে পারত এটা তাহলে স্পষ্ট যে কৃষিগত আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

মুমূর্ষু হলেও আন্দোলন জলপাইগুড়ি এবং মৈমনসিং জেলায় এগিয়ে চলছিল। জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে আগত প্রধানত ওরাওঁরা ছিল বর্গাদার যারা জমি পুনরুদ্ধার করেছিল; এদের বিভিন্ন উপায়ে জোতদার ও মহাজনরা উচ্ছেদ করেছিল এবং বর্গাদার অথবা কৃষি মজুরের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিল। উনিশ শতকে ডুয়ার্সে চা বাগান খোলা হয়; ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে চা বাগানের সংখ্যা ছিল ১৮৯ যার বেশীর ভাগ শ্রমিক এসেছিল ওরাওঁদের মধ্যে থেকে। এই কারণেই চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া সহজ ছিল। ১৯৪৭ এর ১লা মার্চ মাল এর ধনী জোতদার খুলি মহম্মদ এর খামারে মজুদ করা ধান সরিয়ে নেওয়ার জন্য কৃষকরা গিয়েছিল। পুলিশ তাদের ঘিরে ফেলে এবং গুলি চালাবার ফলে ৫ জন কৃষক নিহত হয়।[৮৩]

৪ঠা এপ্রিল মেটেলীর মহাবাড়ি অঞ্চলে রাজবংশী জোতদার গয়ানাথ বর্মনের খামার থেকে কৃষকরা ধান সরাতে চেষ্টা করে। ওরাওঁ কৃষক ও পুলিশের মধ্যে সত্যকার লড়াই হয়েছিল। নয় জন কৃষক ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছিল।[৮৪] এই ঘটনার পরে ডুয়ার্সে আন্দোলন দ্রুত ভেঙ্গে যেতে থাকে। উত্তর মৈমনসিংহে বাহেরতলি ঘটনার পরেও হাজং কৃষকরা অকম্পিত বিশ্বাস নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা রিপোর্ট করে: "এর মধ্যে একজন হাজংকে খোঁজ করা হল খড়ের গাদায় একটি ছুঁচ খোঁজার মত।" গ্রামবাসীরা দিনের বেলায় পাহাড়ে চলে যেত এবং রাত্রে গ্রামে ফিরে আসত। স্ত্রী-লোকরা নির্ভীকভাবে তাদের পণ্য বিক্রী করার জন্য হাটে বাজারে যেত। ইস্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ারস-এর সৈন্য বাহিনী গ্রামে গ্রামে টহল দিত, হাজংদের মারধোর এবং গ্রেপ্তার করত, কিন্তু তাদের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে পারত না।[৮৫] প্রকৃতপক্ষে মণি সিং সহ অধিকাংশ নেতা আত্মগোপন করে ছিলেন। ১৪ই মার্চ মৈমনসিংহ বিধান সভার একজন কংগ্রেস সদস্য খাজনা দানের ক্ষেত্রে টংক ব্যবস্থা বিলোপের সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন, মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যা ১২৬ ভোটের বিপক্ষে ৬৯ ভোটে পরাজিত হয়।[৮৬]

এপ্রিল মাসের মধ্যে কৃষিগত আন্দোলন ভেঙ্গে গেল। ১৯৪৭ এর পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ "তেভাগা আন্দোলন...একটি হিংসাত্মক ও বিপজ্জনক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল যেখানে কৃষকরা তাদের ভূস্বামীদের ফসল বলপূর্বক কেটে ফেলেছিল।"

যখন এই ধরণের হিংসাত্মক কার্যকলাপের মোকাবিলা করার জন্য পুলিশ বাহিনী পাঠানো হত তখন তার, ধনুক, বর্শা, লাঠি এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বন্দুকধারী সহস্র মানুষের জনতা কর্তৃক পুলিশ বাহিনী প্রায়শই আক্রান্ত হত···বিশেষতঃ মৈমনসিং, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, এবং ২৪ পরগণার অবস্থা ছিল খারাপ এবং মোট ১৯টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল।"[৮৭]

বিদ্রোহের ঝড় থেমে গেল বটে, কিন্তু কৃষকদের ধূমায়িত অসন্তোষকে অগ্রাহ্য করা গেল না। ২১ শে এপ্রিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা স্টেট অ্যাকুইজিসন এ্যান্ড টেনান্সি বিল উপস্থিত করল। বিলের প্রধান ধারাগুলিকে সংক্ষিপ্তাকারে বলা যেতে পারে। জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার তার স্বত্ব অধিগ্রহণ করবে ; "যেখানে যাদের দশজন সদস্যের পরিবারে ১০০ বিঘা জমি আছে বা মাথা পিছু ১০ বিঘা জমি আছে" তাদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত জমি নিয়ে নেওয়া হবে ; কিন্তু যদি তারা "সমবায়ের ভিত্তিতে অথবা যান্ত্রিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বড়ো আকারে কৃষিফার্ম গড়ে তোলে তাহলে তাদের উচ্চ সীমার অতিরিক্ত জমি অনুমোদন করা হবে। ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য হবে, "জমি তাদের দেওয়া হবে যাদের জমি "ইকনমিক হোল্ডিং" এর পর্যায়ে পড়ে শুধুমাত্র— নাবালক, বিধবা, এবং অন্যান্য শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া "অন্যান্য ক্ষেত্রে জমি ভাগে বন্দোবস্ত দেওয়া নিষিদ্ধ করা হবে। সরকারের লক্ষ্য হবে, পুনর্গঠনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা ; ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হবে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, গ্রামীণ মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা, সমবায় ব্যবস্থার প্রসার, কৃষিপণ্যের বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা, গ্রামে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা।[৮৮]

জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের জন্য আইন সভায় আনীত বিলের সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কৃষক সভা তার শক্তিগুলিকে সংগঠিত করা এবং ভূমি সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু করার ক্ষেত্রে কমই সাফল্য লাভ করেছিল। পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিল।

২৭ শে মার্চ বিকালে কলকাতায় নতুন করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ জ্বলে ওঠে এবং পরদিন সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়। মিঃ আলাভি কৃষক আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: "স্বাধীনতার প্রাককালে মুসলিম জাতীয়তাবাদ বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ে ···এই ঘটনা হিন্দু কর্মীদের বিচ্ছিন্ন করার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।"[৮৯] মুসলিম জাতীয়তাবাদ বলতে মিঃ আলভি কি বুঝিয়েছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত এটা বলাই সঠিক হবে যে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর. এস. এস,) দ্বারা প্ররোচিত সাম্প্রদায়িকতার প্রবাহ দেশকে প্লাবিত করেছিল। বাঙলায় ২৭ শে মার্চ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে দাঙ্গা স্বাধীনতার পূর্বদিন পর্যন্ত চলেছিল এবং কৃষিগত আন্দোলন দ্রুত ভাঙ্গনের পথে অগ্রসর হয়েছিল।[৯০] কৃষকরা এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল কারণ আর কোন বিকল্প তাদের ছিল না।

একটি কৃষক বিপ্লব

আধুনিক অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানাই হল সেই অঞ্চল যেখানে কিষাণ সভা একটি কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমে ভূস্বামীদের বলপূর্বক দখলচ্যুত করার মহান কাজটি করেছিল। যেহেতু অন্ধ্র কিষাণ সভা এই কৃষিগত সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তাই আমরা কৃষকদের সমর্থন পাওয়ার জন্য এর দীর্ঘ ও ধৈর্যশীল প্রচারাভিযান সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব। সমস্ত রকম সাক্ষ্যপ্রমাণই প্রমাণ করে, ১৯৪০ এর দশকে গ্রামাঞ্চলে কিষাণ সভা ক্ষমতাশীল শক্তি হিসাবে অবিভূত হয়েছিল। যা লক্ষ্যনীয়, তা হল রায়তদের ভিত্তি করে গঠিত কিষাণ সভা স্বতন্ত্র একটি সংগঠনে সংগঠিত কৃষিশ্রমিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করাই সঠিক কাজ বলে মনে করেছিল।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার শুরুতে ১৯৩১ এ অন্ধ্র জমিদারী রায়তস্ এ্যাসোসিয়শন গঠিত হয় এবং এর প্রধান দাবী ছিল: রায়তদের দখলের সমস্ত জমি রায়তী জমি হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, রায়তওয়ারি হারের বেশী খাজনা হবে না, ফসলহানির ক্ষেত্রে খাজনা স্থগিত রাখা ও হ্রাস করা, জমিদারের বাড়ীর খামারের জমির বেশীরভাগ অংশকে রায়তী জমি হিসাবে গণ্য করা উচিত।[৯১] রায়তস্ এ্যাসোসিয়েশন জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল এবং তা কোন আন্দোলন পরিচালনা করেনি বললেই

চলে। ১৯৩৭ এ অন্ধ্রে কিষাণ সভা গঠিত হল যা ১৫০০ মাইল ব্যাপী নয়টি জেলার কৃষকদের একটি মিছিল সংগঠিত করে। কিষাণ সভার কাজকর্ম তীরবর্তী জেলাগুলিতে, বিশেষত কৃষ্ণা এবং পশ্চিম গোদাবরীতে সীমাবদ্ধ ছিল।[৯২] তখন পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কিষাণ সভার স্বাধীন ক্ষমতা ছিল সামান্য ; ১৯৪১-৪২ এ এর সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬,৯৯৩ জন। ১৯৪৩ থেকে কিষাণ সভার অবস্থার উন্নতি হয়। এর সভ্য সংখ্যা ১৯৪৩ এ ৫৫,৫৬০ থেকে ১৯৪৪ এ ১০১, ৫০২ এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৫-৪৬ এ সভ্য সংখ্যা ছিল ১৭৫,০০৯ জন। ইতিমধ্যে কৃষি মজুর সমিতি গঠিত হয়, ১৯৪৫ এ যার সভ্য সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ জন।[৯৩] ১৯৪৪ এ কিষাণ সভার বার্ষিক সম্মেলন বেজওয়াদায় অনুষ্ঠিত হয় ; কিষাণ সভা ৪,০০০ সদস্য নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী করে যার মধ্যে মহিলারাও ছিল ; ১৫ ই মার্চের সমাবেশে যোগদান করার জন্য গ্রাম থেকে এক লক্ষ কৃষক এসেছিল।[৯৪]

প্রায় একই সময়ে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কৃষিগত আন্দোলন নিজস্ব গতিবেগ লাভ করছিল। হায়দ্রাবাদের পরিস্থিতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কৃত্রিম রাষ্ট্র হায়দ্রাবাদে তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক এবং মারাঠাওয়াড়া ; তেলেঙ্গানার জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যক মানুষ ছিল তেলুগু ভাষাভাষী, উর্দু ছিল শাসনকার্যের ভাষা, এবং জনসংখ্যার পঁচাশি শতাংশ হিন্দু সরকারী উচ্চপদের চাকুরী খুব কমই পেত। জায়গীরদার, দেশমুখ, প্যাটেল এবং পাটওয়ারীদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত ছিল যাদের কেউ কেউ ছিল হিন্দু।[৯৫] ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত অন্ধ্র মহাসভা একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে যেখানে রবিনারায়ণ রেড্ডি এবং বাদ্দাম ইয়েলা রেড্ডি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ; এবং কয়েকজন সহযোগী নিয়ে এই নেতারাই ১৯৪০-৪২ এ কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।[৯৬] জমিদার কর্তৃক বেগার শ্রম ও বে আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে আংশিক সংগ্রাম ১৯৪৬-৪৭ এর কৃষক অভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। ১৯৪৬ এর গ্রীষ্মে, জনগাঁও তালুকের ধনী ভূস্বামী বিষ্ণুর রামচরণ রেড্ডি আইলাম্মা নামক একজন ধোপানীকে উচ্ছেদ করে মাঠ থেকে ফসল নিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কৃষকরা জমিদারের লাঠিয়ালদের প্রতিরোধ করে। ১৯৪৬ এর ৪ ঠা জুলাই কৃষকরা জমিদারের বাড়ীর কাছে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ; দোদ্দি কোমারাইয়া নামক একজন কৃষক সভার সংগঠক গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলে

নিহত হয় এবং কয়েকজন কৃষক আহত হয়;[১৭] জমিদারকে দখলচ্যুত করার শ্লোগান তুলে কৃষিগত আন্দোলন শুরু হয়; কৃষকরা গ্রেপ্তারী পরোয়ানাকে অগ্রাহ্য করে গ্রামে গ্রামে মার্চ করে ঘুরতে থাকে, গ্রামে পুলিশের আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং ড্রাম বাজিয়ে সংকেত জানানো হলে কৃষকরা বিপুলভাবে সমবেত হয়। আন্দোলন প্রধানত নালগোণ্ডা জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং সন্নিহিত ওয়ারাঙ্গাল জেলার কয়েকটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৪৬ এর শীতকালের মধ্যে নালগোণ্ডা জেলার অনেক গ্রামে কৃষক ও পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল।[১৮]

স্বাধীনতার পর ব্রিটিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী নিজাম যখন ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে অস্বীকার করল তখন পরিস্থিতিতে একটি নোতুন পরিবর্তন সূচিত হল। ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে হায়দ্রাবাদকে সংযুক্ত করার জন্য রাজ্য কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার ফলে কৃষিগত আন্দোলন দ্রুতভাবে কৃষক বিপ্লবে পরিণত হল। কমিউনিষ্ট ও রাজ্য কংগ্রেসীরা যুক্ত সভা ও বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করেছিল এবং কৃষিগত আন্দোলন নিজাম শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। রাজাকার নামক সংগঠন তাদের ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমীন পত্রিকায় "দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করার" শপথ ঘোষণা করে। কৃষকরা রাজাকারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্র তুলে নেয়, এদের নেতা ছিল কাসিম রাজভী। একটি সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"একই সঙ্গে কমিউনিষ্ট ও কংগ্রেস পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল; হিংসাত্মক কার্যকলাপ, অগ্নিসংযোগ, এবং খুনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, ; ফসল লুঠ করা হল বা নষ্ট করে ফেলা হল, বলপূর্বক অথবা, কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট ক্ষমতায় আসার পর খাজনা দেওয়া বন্ধ করা হবে এবং কৃষকদের হাতে জমি দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে খাজনা সংগ্রহ বন্ধ করার চেষ্টা করা হল, যারা যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের মৃত্যুর ভয় দেখানো হল।"[১৯]

এটা খুব একটি আদর্শায়িত চিত্র ছিল না। একটা সীমা পর্যন্ত রাজ্য কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টরা ঐক্যবদ্ধ ছিল; নালগোণ্ডা ও ওয়ারাঙ্গাল জেলা ছিল কৃষক বিপ্লবের ঘূর্ণিবাত্যায় আপ্লুত। "বড়ো ভূস্বামীদের" জমি দখল করে গরীব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। ৫০০ একরে জমির সর্বোচ্চ সীমা স্থির করা হল এবং পরে এই সীমা ১০০ একর

শুকনো ও ১০ একর সেচপ্রাপ্ত জমিতে সীমাবদ্ধ করা হল। ভূস্বামী ও বনিকদের মজুদ খাদ্যশস্য গ্রামীণ গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল। মহাজনদের হিসাবের খাতা পুড়িয়ে দেওয়া হল ; প্রায় চার হাজার গেরিলা যোদ্ধার নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল যারা গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে বাজাকারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল। নিজামের সৈন্যবাহিনী এবং সশস্ত্র কৃষকদের মধ্যে বেশ কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল।[১০০] ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বরে আন্দোলন চরম শীর্ষে পৌঁছুল এবং নালগোন্ডা, ওয়ারাঙ্গাল, করিমনগর এবং খাম্মামে ছড়িয়ে পড়েছিল।[১০১] ভারত সরকার ও হায়দ্রাবাদ সরকারের মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে গেলে জেনারেল জে এন চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্য সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদে অগ্রসর হল এবং নিজামের প্রতিরোধ দ্রুত ভেঙ্গে পড়ল। হায়দ্রাবাদে নিজামের শাসন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন একটি কানাগলিতে প্রবেশ করল। রাজ্য কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের যে যুক্তফ্রণ্ট ইতিমধ্যেই সংকটাপন্ন ছিল তা এবার ভেঙ্গে পড়ল। সাংঘাতিক নিপীড়নের সামনে ১৯৫১ এর অক্টোবরে আন্দোলন পিছু হটল এবং তুলে নেওয়া হল।[১০২]

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল যে শুরুর থেকে অন্ধ্র কিষাণ সভার নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ধনীদের তোষণ করা। তেলেঙ্গানা সংগ্রামের সময় এ জিনিষটি ছিল তুঙ্গে, যে সংগ্রাম শুধুমাত্র বড়ো ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর কৃষকদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা ছিল সর্বোচ্চ বিবেচ্য বিষয়। গ্রামাঞ্চলে কারিগরী সংক্রান্ত উন্নতির পশ্চাৎপদতার পরিপ্রেক্ষিতে ধনী কৃষকরা কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করা হত। মনে হয় কিষাণ সভা অনুভব করেছিল যে নিপীড়ন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নয়, মতাদর্শগতভাবে বোঝানোর ব্যবস্থা করে ধনী কৃষকদের নিরপেক্ষ করে রাখা যেতে পারে। কৃষিগত আন্দোলনের কয়েকজন সংগঠক ধনী কৃষক ও ছোট ভূস্বামীদের থেকে এসেছিল।[১০৩] যেহেতু কিষাণ সভা সেচপ্রাপ্ত জমির ১০ একরে সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছিল, তাই সমৃদ্ধিশালী কৃষকরা জানত যে কৃষক সংগ্রামের সংঘটনের ফলে তাদের দখলীকৃত বিষয় সম্পত্তির কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, যে গরীব ও ভূমিহীন কৃষক কর্তৃক জমিদারদের দখলচ্যুতি বা উৎখাতের দাবী করাই ছিল স্বাভাবিক, কিষাণ সভা কিভাবে তাদের আবেদন বা মিনতিকে পূরণ করতে পারত।

চেস্টার বোল্‌স্‌ একটি সুস্পষ্ট অনুচ্ছেদে তেলেঙ্গানার কৃষক বিপ্লবে প্রতীয়মান ভূমিসংস্কারের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

"...তেলেঙ্গানার বিপ্লবী ঘটনা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ঐ ধরণের ঘটনার থেকে মূলগতভাবে পৃথক ছিল, শহরগুলির শ্রমিক ও ছাত্রদের ওপরে দৃষ্টি বা নজর দেওয়ার পরিবর্তে..., চীনে ক্ষমতা দখলের জন্য মাও-ৎসে-তুঙের গৃহীত পথের নকশা অনুযায়ী এক চেটেভাবে গ্রামাঞ্চলের প্রচারাভিযানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল...এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তেলেঙ্গানা ছিল একটি লোভনীয় লক্ষ্য...নিজামের বিশাল রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ ছিল তাঁর খাস জমি এবং তাঁর পারিষদবর্গ, পাইঘের আমীর, ঘামাস্থানের রাজা, জায়গীরদার, জমিদার ও দেশমুখদের জমি। আর এই জমিতেই কুড়ি লক্ষেরও বেশী দারিদ্র্যক্লিষ্ট কৃষক বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ লড়াই করত...স্বাধীনতার সূচনাকালে তেলেঙ্গানার কয়েকটি গ্রামে এবং মাদ্রাজ রাজ্যের সংলগ্ন এলাকায় কমিউনিস্ট কর্মীরা জমি বুভুক্ষু মানুষকে তাদের মালিকের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলেছিল...প্রকৃতপক্ষে অচিরেই কয়েকশ গ্রাম কমিউনিস্টদের হাতে চলে গিয়েছিল; এমন কি গাছের মাথায় কাস্তে হাতুড়ি দেখা যেত। যে সব সরকারী কর্মচারী ও ভুস্বামী পালিয়ে যায়নি তাদের খুন করা হয়েছিল...তেলেঙ্গানার শিক্ষা হল, যে কোন উন্নয়নশীল দেশে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার নাটকীয় প্রকাশ...বছরের পর বছর ধরে আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছি যে কোন উন্নয়নশীল জাতির সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভূমি সমস্যা হল সবচেয়ে বেশী এবং একক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[১০৪]

স্বাধীনতার প্রভাতকালে কংগ্রেস ভূমিসংস্কার কমিটি জোরালোভাবে জানায় যে "কৃষিগত উৎপাদনে যে কোন স্থায়ী উন্নতি"র প্রধান নীতি হবে ভূমি সংস্কার। ভারতীয় কৃষিগত অর্থনীতিতে "মধ্য স্বত্ব ভোগীর কোন স্থান নেই এবং জমি অবশ্যই কৃষকের হওয়া উচিত।" শুধুমাত্র স্বামী হীনা, নাবালক এবং অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া জমিতে বন্দোবস্ত দেওয়ার অধিকারকে নিষিদ্ধ করা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে চাষ্ করার জনা জমি পুনর্গ্রহণ করতে পারত সেই সব মালিকরা যারা "অন্তত ন্যূনতম শারীরিক শ্রম প্রয়োগ করে এবং প্রকৃত কৃষিগত কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করে।" যে প্রজারা একটানা ছ বছর ধরে জমি চাষ করছিল তাদের দখল স্বত্বের অধিকার পাওয়া উচিত। "সমস্ত উচ্ছেদের আশু নিবারণ এর ওপর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ভূমি ট্রাইবুনাল কর্তৃক অধিকারের

রেকর্ড তৈরী করার ওপর কমিটির গুরুত্ব আরোপ করা উচিত এবং ঐ ট্রাইবুনালে বেসরকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ভূমির জাতীয় করণের পরিবর্তে কমিটি ব্যক্তিগত কৃষি খামারকেই পছন্দ করেছিল যা "কৃষিগত ঐতিহ্য" এবং "কৃষক সম্প্রদায়ের মনোভাব"কে সন্তুষ্ট করতে পারবে।"[১০৫]